# উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলন

# ও

# বাংলা নাটকের আদিপর্ব

ডক্টর শম্ভুনাথ বিট এম. এ., বি. টি., পি এইচ. ডি.

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৯১

প্রকাশক : শ্রীভোলানাথ বিট
পোঃ—রামজীবনপুর, জেলা—মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান : (১) গ্রন্থনিলয়
৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

(২) চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীযুক্ত অসীম বসু

প্রচ্ছদ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মুদ্রণ : তারা প্রেস
হরিশোভা, পোঃ আমুড়, জেলা হুগলী

## উৎসর্গ

বাবা ও মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

# ভূমিকা

ডঃ শম্ভুনাথ বিটের 'উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলন ও বাংলা নাটকের আদিপর্ব' নামক গবেষণা গ্রন্থটি দীর্ঘকাল পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'ল। ডঃ বিট আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা ক'রে পি-এইচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি যখন গবেষণায় নিরত ছিলেন তখন তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও জ্ঞানস্পৃহা আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। তিনি দুষ্প্রাপ্য নাটকের সন্ধানে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্তী প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারে দিনের পর দিন গিয়ে জীর্ণ ও কীটদষ্ট নাটকগুলির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে থেকে অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি যে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা সর্বাংশে গবেষণা-নিবন্ধে ব্যবহার করতে পারেন নি এবং গবেষণা-নিবন্ধে যা লিখেছেন তার কিছু অংশ প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে বর্জন করেছেন। যে-সব দুষ্প্রাপ্য নাটক শম্ভুনাথ পড়েছিলেন সেগুলির বেশ কিছু অংশ এত জীর্ণ ও পাঠের অযোগ্য হ'য়ে পড়েছে যে ভবিষ্যৎ কোনো গবেষক তা আর ব্যবহার করতে পারবেন ব'লে মনে হয় না।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, মদ্যাসক্তি, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, লাম্পট্য ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের মন তীব্র ভাবে আন্দোলিত করেছিল এবং বাংলা নাটকের আদিপর্বে তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল। বস্তুত, নাটকের ক্ষেত্রে সমাজের যে খাঁটি ও অবিকল চিত্র পাওয়া যায়, সাহিত্যের অন্য কোনো ক্ষেত্রে অনুরূপ বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় না। সেজন্য তখনকার সমাজের যথার্থ দর্পণ বলতে শুধু নাটককেই বোঝায়। তবে এ কথা সত্য যে, সেই সময়ের নাট্যকারদের সমাজবোধ যতখানি ছিল, শিল্পচেতনা ততখানি ছিল না। নাটকের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য যতখানি সোচ্চার ছিল শিল্পকর্ম ততখানি নিখুঁত ও পরিপাটি ছিল না। সেই অস্থায়ী নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র স্থায়ী নাট্যকার ছিলেন রাম-নারায়ণ তর্করত্ন।

শম্ভুনাথ অচিরজীবী নাট্যকারদের শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আলোচনার আসরে। সমাজ-আন্দোলনের যে সুবিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর তথ্যনিষ্ঠা ও তত্ত্বচিন্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিষয় অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে তিনি নাটকগুলিকে বিভক্ত ক'রে তাদের সমালোচনা করেছেন। ওই নাটকগুলি নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর, তবে সমাজের দলিল হিসাবে মূল্যবান। নাটকগুলি নাট্যনিয়মে সুসংবদ্ধ নয়, শিথিল ও অসংলগ্ন কয়েকটি দৃশ্যসমষ্টি মাত্র। তবুও ডঃ বিট অশ্রদ্ধা বশত সমালোচনায় কোনো শিথিলতা দেখান নি।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'লে এটি বাংলা নাটকের আদি পর্বের একটি প্রামাণ্য সমালোচনা-গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের সহায়ক হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

**অজিতকুমার ঘোষ**
৮ই মার্চ. ১৯৮৭

# নিবেদন

প্রবল ঘটনা-সংঘাতে সমাজের বুকে প্রবল আলোড়ন জাগে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব সঞ্চারিত। সেরকম বাংলা-দেশের সমাজেও ঘটেছে। এদেশে ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পায়। সতীদাহ নিবর্তন, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ নিরোধ প্রভৃতি কত আন্দোলনই এখানে হয়েছে। কখনও সতীদাহ মুখ্য আবার কখনও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। আবার ধর্মসভার রক্ষণশীল আন্দোলনও সমসাময়িক ঘটনা। বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি উনিশ শতকের যে বহুমুখী সামাজিক তরঙ্গ উত্থিত হয় তাতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সচকিত।

বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে নাটকের শাখায় এগুলি উল্লেখ-যোগ্য। বিষয়বস্তুতে মার্জিত রুচির পরিচয় না থাকায় নাটকগুলি অবহেলিত এবং সমাজ আন্দোলনে অনাদৃত। নাট্যসাহিত্যের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ব'লে এই যুগের নাটকগুলি আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' গ্রন্থটি এই আলোচনার পথিকৃৎ। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্য-সমালোচকগণ যে সমস্ত নাটক আলোচনা করেছেন আমি তাদের অনেকগুলি পাই নাই; আবার অনেক অনালোচিত বা প্রায় অনালোচিত নাটকের সন্ধান পেয়ে সৌভাগ্য মনে করি।

গত শতকের গ্রন্থাদি এখন সুলভ নয়। স্বদেশে অনেক গ্রন্থ দুর্লভ হওয়ায় বিদেশের সাহায্যও গ্রহণ করেছি। আবার অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাদির অবস্থা এত শোচনীয় যে পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য। তবুও সাধ্যমত পরিশ্রমে, এই গ্রন্থ রচনায় সাহসী হয়েছি।

'উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলন ও বাংলা নাটকের আদিপর্ব' লিখতে বসে প্রথমেই বলি—এই আলোচনায় শুধু হিন্দু সমাজের কথা বলেছি। অন্যান্য সমাজের আন্দোলন বাংলা নাটকে তেমন প্রভাব বিস্তার করে নাই। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুসমাজের আলোচনায় বিশেষ-

ভাবে তৎকালীন বাংলা দেশের বিষয় স্থান পেয়েছে—সমস্ত ভারতবর্ষের সমাজ এর আলোচ্য নয়। তবে মূল বক্তব্যের প্রয়োজনে বাংলা দেশ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের এবং হিন্দু সমাজ ভিন্ন অন্য সমাজের বিষয়ে উল্লেখ করতে দ্বিধা করি নাই। মুসলমানদের দ্বারা লিখিত বাংলা সামাজিক নাটক তাঁদের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচায়ক। আবার খৃষ্টধর্মান্তরিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষায় হিন্দু সমাজ বিষয়ক নাটক 'The Persecuted' এর বিষয়বস্তু তাঁর উগ্র মনোভাবের পরিচায়ক হ'লেও এ সমস্ত বিষয় সশ্রদ্ধচিত্তে আলোচিত।

ঊনিশ শতকের নবজাগরণের পটভূমিতে বাংলার সমাজ আন্দোলনে নবীন ও প্রবীনের সংঘাত—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ও রাজনীতিতে বাঙালীর মানস জাগরণ। ফলে যুক্তিবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ, নারী ও পুরুষের সাম্যবোধ, বিচার ও বিতর্কের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। Renascence র অর্থ 'The Process or fact of being born anew, rebirth, renewal, revival' এবং Reformation এর অর্থ ' (1) Improvement in form or quality; alteration or removal of faults or errors; (2) Improvement of ( or in) an existing state of things, institution, practice, etc; a radical change for the better effected in political, religious, or social affairs······ (3) The action of reforming (one's own or another's) conduct or morals; improvement or amendment in this respect······' অনুসরণে সমাজ আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা—ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষতঃ সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আন্দোলন—কৌলীন্য, বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান ও ব্যভিচার প্রভৃতির আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের আলোয় নিজেদের দেশের কু-আচার ও কু-প্রথা প্রভৃতি চোখে পড়ায় সংস্কার বাসনায় হিন্দুকলেজ, বিভিন্ন সভাসমিতি স্থাপিত হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলন, হিন্দুমেলা প্রভৃতি এরই পরিপূরক। নারী মুক্তির জন্য সতীদাহ আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষা,

স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা সংস্কার সাধনের আর এক দিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যশিল্প সম্বন্ধে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সামাজিক নাটকগুলির আঙ্গিক দিক আলোচিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরীতি, এ দেশের লোক প্রচলিত যাত্রারীতি এবং পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির সংমিশ্রণ বাংলা নাটকে লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারগণের অনেকের শিল্পসচেতনতা অপেক্ষা যুগের হুজুগ বেশী ছিল ব'লে অনেক রচনাই শিল্পরসোত্তীর্ণ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রমণী ও প্রেম নাটক দুটির আলোচনা লক্ষণীয়। এরপর তৃতীয় অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত বাংলা সামাজিক নাটকের আদি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস হ'তে আরম্ভ ক'রে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত নাটকগুলির আলোচনা করেছি। বিষয় অনুসারে দৃষ্টি দেওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে পরের নাটক পূর্বে অথবা পূর্বের নাটক পরে আলোচিত। তবে যতদূর সম্ভব কালের দিক অবহেলিত নয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইন এক সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নাটকের অভিনয়ের জন্য জাতীয় বঙ্গমঞ্চ স্থাপন এবং তাতে অভিনয় আরম্ভ বাংলা নাটকের এক শুভ সূচনা। সৌখীন নাট্যসমাজ হ'তে পেশাদার নাট্যসমাজে বাংলা নাটকের মুক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গদর্শনে আবির্ভাব সাহিত্যে সুরুচি ও সুনীতি বোধে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ১৮৫২ হ'তে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ। উপসংহারে বিস্তৃতভাবে 'বাংলা নাটকের আদি পর্ব' এর গুরুত্ব আলোচনা করেছি।

পূর্বে অনালোচিত বা প্রায়-অনালোচিত নাটকগুলির আলোচনা দীর্ঘ হয়েছে। অনেকগুলি নাটকের ক্ষেত্রে এই গুণ বা দোষ দেখা যাবে। প্রসিদ্ধ বা পরিচিত নাটকের আলোচনায় নূতন তথ্য সংযোগ করতে পেরেছি। বিষয় বিন্যাসে কৌলীন্য, বহুবিবাহ, পণপ্রথা ও অসমবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, ব্যভিচার ও বেশ্যাগমন, স্ত্রীস্বভাব ও স্ত্রীআচার এবং বিবিধ এই আটভাগে নাটকগুলি আলোচিত। অনেকের আলোচনায় আঙ্গিক দিক মুখ্য হওয়ায় সামাজিক দিক গুরুত্ব পায় নাই। এই আলোচনায় সামাজিক দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, অভিনয়ের

কথা বেশী ব'লে আয়তন বৃদ্ধি করা হয় নাই। বলাই বাহুল্য নাট্যগুণ-সম্পন্ন না হওয়ায় অনেক নাটকই অভিনয়যোগ্য নয়। অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক কুৎসা, অশ্লীলতা প্রভৃতি অভিনয়ে বাধা স্বরূপ।

কৌলীন্য বিষয়ে কুলীনচরিত্র. বহুবিবাহ বিষয়ে হিন্দুমহিলা, মাগ-সর্ব্বস্ব এবং পণপ্রথা ও অসমবিবাহ বিষয়ে কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে, কন্যা বিক্রয়, অযোগ্য বিবাহ. কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে এই কয়েকটি নাটক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকের পূর্ণাঙ্গ এবং প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। এছাড়া বিধবা মনোরঞ্জন, কাদম্বিনী, দলভঞ্জন, অশুভ পরিতাপক, ম্যাও ধরবে কে ?, বিধবাবিলাস, এই কয়েকটি প্রায়-অনালোচিত নাটকের আলোচনা করেছি। মদ্যপান, ব্যভিচার ও বেশ্যাগমন বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক, রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা, চক্ষুঃস্থির, বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি. বুঝলে কিনা. কিছু কিছু বুঝি, বারুণীবিলাস, এঁরাই আবার বড়লোক !, বাহবা চৌদ্দ আইন, বেশ্যা বিবরণ. কি মজার শনিবার, একাদশীর পারণ, সাক্ষাৎ দর্পণ, কুলপ্রদীপ, গিরীবালা, মনোরমা, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, ভারতদর্পণ এই আঠার খানি নাটকের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষতঃ বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি, বাহবা চৌদ্দ আইন, বেশ্যা বিবরণ, গিরীবালা ও ভারতদর্পণ এই পাঁচ খানি নাটক প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র হীরালাল মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের নাট্যরূপ এবং বুঝলে কিনা নাটকের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে পাঠভেদ স্মরণীয়। স্ত্রীস্বভাব ও স্ত্রীআচার বিষয়েও দশখানি অনালোচিত বা অনালোচিত-প্রায় নাটকের আলোচনা করেছি। এদের মধ্যে কুলাব কামিনী. কলির বউ হাড় জ্বালানী, কলির বৌ ঘর ভাঙ্গনী এবং নাগাশ্রমের অভিনয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বিবিধ বিষয়ে দুর্ভিক্ষ দমন নাটক সম্বন্ধে নূতন ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়ে জাড়ার রায় বংশের শ্রীযুত মানস কুমার রায়ের সাহায্য স্মরণযোগ্য। বিষয় অনুসারে নাটকগুলির আলোচনার পূর্বে একটি ক'রে সংক্ষিপ্ত

বিবরণ সমাজ আন্দোলনের মর্ম উদ্ঘাটনে সাহায্য করতে ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত।

উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলনে সামাজিক ত্রুটি দূরীকরণে ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময়ে সতীদাহ নিরোধ আইন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তক আইন, বেশ্যাগমনহেতু সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের আইন, প্রভৃতি বিভিন্ন আইন পাস করেছেন। নাট্য সমালোচনা গ্রন্থে এগুলি স্থান না পেলে সামাজিক ত্রুটি দূরীকরণে সরকারের ভূমিকা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না মনে ক'রে পরিশিষ্ট অংশে প্রয়োজনীয় কয়েকটি আইনের অংশ দেওয়া হ'ল।

আমার গবেষণা কার্যের উপদেষ্টা এবং অন্যতম পরীক্ষক রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ তার অমূল্য সময় আমাকে উপদেশ নির্দেশাদি দিয়ে আমার পরিশ্রম সার্থক করেছেন। আবশ্যকমত পরিবর্তন ক'রে গ্রন্থ প্রকাশের সময় তিনি একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে আমাকে ধন্য করেছেন। তাঁর অকৃপণ স্নেহ আমাকে চিরঋণী করে রাখবে।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আমার 'উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলন ও বাংলা নাটকের আদিপর্ব' এই গবেষণা নিবন্ধের জন্য ডক্টর অফ্ ফিলজফি উপাধিতে ভূষিত করেন। এই গবেষণার অন্যতম পরীক্ষক—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীউজ্জ্বল কুমার মজুমদার তাঁদের সিদ্ধান্তের দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্র নাথ গুপ্ত আমাকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও গ্রন্থাদি দানে সাহায্য করায় তাঁকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার গুপ্ত আমাকে কয়েকটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখতে দিয়ে আমার শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। শ্রীযুক্ত অসীম বসু এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন ক'রে আমাকে অনুগৃহীত করায় আমি ধন্য।

লণ্ডনের—ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, কলকাতার—ব্রিটিশ হাই কমিশন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, হিরণ লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, উত্তরপাড়ার—জয়কৃষ্ণ মুখো-

পাধ্যায় সাধারণ পাঠাগার, কোন্নগরের—পাবলিক লাইব্রেরী, শ্রীরাম-পুরের—উইলয়ম কেরীর মিশন লাইব্রেরী, আরামবাগের—নেতাজী মহা-বিদ্যালয় লাইব্রেরী, কামারপুকুরের—শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠের পাঠাগার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আঞ্চলিক পাঠাগার, আঁটপুরের—শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা শিক্ষামন্দির পাঠাগার, কৃষ্ণদেব স্মৃতি প্রগতি সাধারণ পাঠাগার, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাঠাগার প্রভৃতির কর্তৃপক্ষগণ ও গ্রন্থাগারিকগণকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই। যাঁদের নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থাদি আমার আলোচনায় স্থান পেয়েছে তাঁদের এবং তাঁদের স্বত্বাধিকারিগণের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

আমার পিতৃতুল্য স্বর্গত নরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জননীসমা শ্রীমত্যা চারুবালা দেব্যার স্নেহাশ্রয় আমার শিক্ষাজীবনে অমূল্য ভূমিকা গ্রহণ করায় আমি কৃতজ্ঞ ও ধন্য। আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়, আমার অগ্রজগণ এবং আমার শ্যালক ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত দাস আমাকে নিয়মিত অনুপ্রেরণা দিয়ে গ্রন্থ রচনা ত্বরান্বিত করেছেন।

আঁটপুরের তারা প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কর্মিগণ এই গ্রন্থ মুদ্রণে এত অনুরাগী না হ'লে এটি আরও দীর্ঘকাল সুধীজনের দৃষ্টিতে আনতে পারতাম না। এর জন্য আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাই।

আঁটপুর, হুগলী
৩১।৩।৮৪

শম্ভুনাথ বিট

# সূচীপত্র

## ষষ্ঠ অধ্যায়



## সপ্তম অধ্যায়



## অষ্টম অধ্যায়

## নবম অধ্যায়



## দশম অধ্যায়

# প্রথম অধ্যায়

## উনিশ শতকীয় বাংলাদেশের বিভিন্নমুখী সামাজিক অবস্থা।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত ক'রে দীর্ঘদিনের নবাবী শাসনের শেষে দেশ জয়ের গৌরব লাভ ক'রে এদেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়। বণিক ইংরেজ বিজিত দেশের ধনরত্ন লুঠ ক'রে চলে গেল না—র'য়ে গেল এদেশ শাসন করতে।

পূর্বে মুসলমানেরা এসেছিল লুঠ করবার আশায়; কিন্তু তাদের কেউ কেউ এখানে থেকে যায়। তাদের সাথে আমাদের রাজনৈতিক সংঘর্ষ হ'লেও সাংস্কৃতিক দিকে তেমন কোন সংঘাত নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর এক বাঁধা মতের।'[১] ঐশ্বর্যের বাহুল্যে বিলাসিতার রাজপ্রাসাদের উঁচুতলায় থাকতে অভ্যস্ত মুসলমান নবাবী-আমলের সুরাপান, বাইজীর নাচ, তোষামোদ-প্রিয়তা আর তার আনুষঙ্গিক পর্দাপ্রথা, ক্রীতদাসপ্রথা, বহুবিবাহপ্রথা সমস্তই এদেশে চলতে থাকে। সাময়িকভাবে কোন কোন নবাব যে এসব অনাচার-কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই তা নয়, তবে বিরাট সমুদ্রে তা জল-বুদ্বুদ মাত্র।

ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদেশে ধর্মের নামে অধর্মের রাজ্য চলছে, ধনীর অত্যাচার দরিদ্রকে বিনা বাধায় সহ্য করতে হচ্ছে, পুরুষ-শাসিত সমাজে স্ত্রীলোকে চোখের জল ফেলছে—দেশাচারপ্রথায় বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ অবাধে চলছে—বিধবার জ্বলন্ত চিতানলে এদেশ আলোকিত হচ্ছে। ইংলণ্ডে চ্যাথাম, বার্ক, ফক্সের ন্যায় ও স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা, আমেরিকায় ফ্রঙ্কলিন, ওয়াশিংটনের স্বাধীনতার জন্য জীবনদান, ফ্রান্সে ভলটেয়ার, রুশোর সাম্য ও স্বাধীনতার ঘোষণা, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ সৃষ্টি প্রভৃতির সমসাময়িক কালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম বিশেষ ইঙ্গিতবহ।'[২]

---

১। কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। —রবীন্দ্র রচনাবলী। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃ-২০৯

২। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃ-২

প্রথমদিকে ইংরেজরা এদেশের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নাই। তাদের সঙ্গে এদেশের লোকের পরিচয় নিতান্তই ব্যবসায়িক। তারা না জানত এখানের ভাষা, না বুঝত আচার আচরণ। এর জন্য তাদের এদেশের কতকগুলি লোকের উপর নির্ভর করতে হ'ত। এ সময়ে বিদ্যাশিক্ষারও তেমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বা ইংরেজী-বাংলায় মিশিয়ে যারা সাহেবদের বিষয়টি বুঝাতে পারত তারা বেশ উপায় করত। ইংরেজদের কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটিতে আধিপত্য বিস্তার নাগরিক সভ্যতার সূত্রপাত। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাংলা থেকে অর্থলোভী মানুষ এসে ভিড় করল কলকাতায়।

ধর্মের দিকে এদেশে যতই মতভেদ এবং অজ্ঞানতা থাকুক, বাইবেল থেকে যীশু পরিত্রাতা ব'লে যতই ঘোষিত হোক, এদেশের লোকে সহজে ধর্মত্যাগ করতে চায় না। সেজন্য পাদ্রীরা সুবিধা করতে পারলেন না। গ্র্যাণ্ট, কিয়ারনাণ্ডার প্রভৃতি হতাশ হলেন। ব্যবসায়ী ইংরেজ বুঝে যে এ দেশের ধর্মে হস্তক্ষেপ করলে এখানে বেশীদিন টিকতে পারবেনা। মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরীকে কলকাতা ছেড়ে পর্তুগীজদের শ্রীরামপুরে চলে যেতে হয়। তাঁরা শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ওয়েলেসলী ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ করার জন্য কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন।

অল্পবয়স্ক ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অনেকেই অবিবাহিত। বিবাহিতদের অনেককে স্ত্রী সাগরপারেই রেখে আসতে হয়। যারা শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসে তারাও স্ত্রীভূমিকাবর্জিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের সংস্পর্শে এদেশের মুৎসুদ্দি ও চাটুকার যারা কলকাতা ও তার নিকটের অঞ্চলে বাস করত তারা সপরিবারে বাস করতে সাহস করত না। ফলে দিনের কর্মব্যস্ততার পর রাতের অন্ধকারে কলকাতায় এক ব্যভিচারের স্রোত বইতে লাগল। 'To stock a zenana চলিত কথার মধ্যে ছিল। অনেকে নবাব আমীরদের অনুকরণে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক লইয়া হারামে বাসা করিত।'[৩] এ ব্যভিচার যে কত ভয়াবহ হয়েছিল তার প্রমাণ—'প্রায় সকলেই এ দেশীয়

৩। হিন্দু জাতি ও শিক্ষা। প্রথম ভাগ। শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। পৃ-২৫-২৬

স্ত্রীলোকদের গর্ভজাত জারজ পুত্র কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিত। ১৮০২ সালে যখন Civil Fund খোলা হয় তখন ইহার পেন্‌সন লইয়া কথা উঠে। অধিকাংশ ইংরেজ কর্ম্মচারী বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কন্যাদিগের সহিত এই সকল জারজ পুত্র কন্যার সমান পেন্সন ( Pension ) দাবী করে। ইংলণ্ডের Court of Directors সে আবেদন অগ্রাহ্য করে।'[৪] নষ্টচরিত্র পুরুষের দৈহিক ক্ষুধা মিটাতে যে সব নারী দেহদান করল তারা সমাজের আপাঙ্‌ক্তেয় বারাঙ্গনাবৃত্তি নিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হ'ল। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত হওয়ায় হিন্দু ভদ্রকন্যা বা কুলবধূগণই এ বিষয়ে অগ্রণী। ধনী গৃহস্থরা বেশ্যাগমনের সমর্থনে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হ'তে বাইজী এনে তাদের নাচ দিয়ে গৌরব লাভ করতেন।[৫]

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও রামমোহন রায় পৌত্তলিকতা ও দেশাচারের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হিন্দুধর্মের ধারক, বাহক ও পোষক ব্রাহ্মণবংশে এই বিধর্মী সুলভ আচরণে তাঁর আত্মীয় স্বজন বিমূঢ়। ব্রাহ্মণদের নির্যাতন যে অর্থনীতিতে এবং সমাজে ঘটবে তা অনেকে ভাবতে পারেন নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশনে লাখরাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে এ দান বাতিল করা হয়। 'This dealt a severe blow to the poor Brahmans who, thus shorn of their land and glory, became more and more dependent than ever for their living on the gifts of the lower classes to whose tastes and superstitions they were now compelled to pander.'[৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিত্তশালী জমিদার নগরকেন্দ্রিক জীবনে আকৃষ্ট হ'য়ে গ্রামের বাস তুলে কলকাতায় বাস করতে আসেন। ব্রাহ্মণেরাও তাঁদের

৪। হিন্দুজাতি ও শিক্ষা। প্রথম ভাগ। শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। পৃ-২৬

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ ৫৫

৬। Bengali Literature in the Nineteenth Century, Sushil Kumar De P. 27

পূর্বগৌরব হারিয়ে তোষামোদ ও চাটুকারিতা ক'রে কাল কাটাতে থাকেন। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে।' [৭] নবজাগরণের লক্ষণ হিসাবে এটি স্মরণীয়।

নবজাগরণের অর্থ নূতন দৃষ্টিতে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতিকে চিন্তা করা। কোন্ সময় হ'তে এদেশে এটি আরম্ভ তা ঠিকভাবে বলা যায় না। তবে রামমোহন রায়ের পৌত্তলিকতা বিরোধী প্রথম রচনায় এর সূত্রপাত।

রামরামবসুর 'জ্ঞানোদয়' নামে এক পৌত্তলিকতাবিরোধী গ্রন্থ নূতন ভাবধারার উর্বরক্ষেত্রে জলসেচন করে। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ এই ক্ষেত্রে যীশুর বীজ বপন করার চেষ্টা করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তাঁদের প্রচার কাজের প্রথম ফল হিসাবে বাঙ্গালী সূত্রধর কৃষ্ণ পাল স্বধর্মত্যাগ ক'রে শ্রীরামপুরের ঘাটে যীশুধর্মে দীক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মের বা সমাজের গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতাই অনেককে পরধর্মে আকৃষ্ট করে। হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্ম বিষয়ে নূতন জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা উক্ত দু ধর্মের নিন্দা ক'রে পুস্তিকা প্রচার করতেন। ভেলোর বিদ্রোহের ফলে লর্ড মিণ্টো খৃষ্টধর্মপ্রচারে পুস্তিকা রচনায় বাধা দিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণে হিন্দু মুসলমান আশ্বস্ত হয়। এ দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিয়ে খৃষ্টীয় সমাজে বিরাট আন্দোলন চলতে থাকে। সেই আন্দোলনের উদ্বেল স্রোত এ দেশে না এলেও তার দু একটি তরঙ্গ শ্রীরামপুর ও কলকাতার ঘাটে লেগেছিল।

ইংরেজরা এখানে শাসনের নামে শোষণ করেছে ব'লে শুধু দোষ না দিয়ে তারা আমাদের ধর্মের, সমাজের, গোঁড়ামি, আচার সর্বস্বতা ও পুরাতনরীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে উপকার করেছে তা স্মরণ করা দরকার। সরকার ১৮০২ খৃষ্টাব্দের আইনে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন রদ ক'রে দেশীয় কুপ্রথায় প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। ইংরেজ সরকারের ভয় ছিল দেশীয় আচার আচরণে হস্তক্ষেপ করলে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হবে; কিন্তু এই ধারণা যে ভুল তা বুঝা গেল— উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন সতীদাহ বিষয়ে।

৭। অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার (পিতাপুত্র) সম্পাদক ডঃ কালিদাস নাগ। পৃ-৫৫

'বহুকালের অপকৃষ্টতা ( degeneration ) দূর করে কোন জাতি যখন জেগে ওঠে তখন সে জাগরণই তার উজ্জীবন। উনিশ শতকের বাংলা ও এই পুনর্জন্ম লাভ করেছিল।' [৮]

১৮০৭ খৃষ্টাব্দ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী প্রোভোষ্ট ডাঃ ক্লডিয়াস বুকানন ঐ কলেজের দশজন পণ্ডিতকে নিয়ে ছ মাস শ্মশানে ঘুরে শাস্ত্রবচন সাহায্যে সতী হ'তে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। বুকাননের 'Memoirs of Expediency of an Eclesiastical Establishment' গ্রন্থে লিখিত আছে 'TheHindoo directly violate the laws of their religion All vows are optional, the committing of murder in consequence of a vow does not lesson the guilt.' [৯] পুরুষ শাসিত সমাজে ধর্মের নামে স্ত্রীহত্যা চলত। অথচ তার পক্ষে স্বর্গবাসের শাস্ত্রবচন দেখান হ'ত স্বেচ্ছাধীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সহমরণ বাধ্যতামূলক নিষ্ঠুরতায় পরিণত হ'লে অনেকের চিন্তা হয়। ফলে মাদক দ্রব্য দিয়ে অজ্ঞান ক'রে এবং গর্ভবতী বা ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে বালবিধবার সহমরণ রহিত করার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হ'ল। [১০]

'ভাগীরথীর পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল' ব'লে এ অঞ্চল পুণ্যকর্মের পক্ষে প্রশস্ত এবং কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের অধীনে নয় ব'লে হুগলী জেলায় এ কাজ মহাসমারোহে সম্পন্ন হ'ত।

১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার জাগরণের সূচনা পর্বের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বসাধক রামমোহন রায় কলকাতায় উপস্থিত হন। 'নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' [১১]

---

৮। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য—সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পৃ ১

৯। হুগলী জেলার ইতিহাস ( ১ম খণ্ড)—সুধীর কুমার মিত্র। পৃ ২০৯

১০। বিদ্যাসাগর—রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ ১২৬

১১। রবীন্দ্র রচনাবলী—একাদশ খণ্ড। পৃ ৪১৬

'তখন সমুদায় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল।'[১২] রংপুরে থাকাকালে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায় ছোট ছোট সভা আহ্বান করেছিলেন। সেখানে 'He met, however, with much opposition from a counter party headed by Gauri Kanta Bhattacharya, a learned persian and Sanskrit scholar, who challenged him in a Bengali book.'[১৩] রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের ফলে হিন্দু-ধর্মের পৌত্তলিকতা ও দীর্ঘদিনের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের জয়ঘোষণা সুরু হ'ল।

রামমোহন রায় কলকাতায় বাস করলে সেখানের গণ্যমান্য লোকের সাহায্যে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। হিন্দু পর্বদিনে এর অধিবেশন হ'ত এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা হ'ত। 'তখনকার বহু সামাজিক সমস্যাও কুসংস্কার কিভাবে দূর করা যায় তার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করা হ'ত। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বাল্যবৈধব্য জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথার বিষে জর্জরিত সমাজের নিরাময় ও কল্যাণ কামনায় রামমোহন ও তাঁর অনুগামী সঙ্গীরা তখন উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।'[১৪] বিরোধীদল এ-বিষয়ে কুৎসা রটাত যে এতে মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংসাহার ও বাইজির নৃত্য হয়।

নারীর ও যে ব্যক্তি-সত্তা আছে তারই স্বীকৃতি সহমরণ নিবারণ প্রচেষ্টায়। রামমোহন রায় ইংরেজদের আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে ঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য সতী-দাহ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক রামমোহনের সঙ্গে সহমরণবিষয়ে আলোচনা করেন। ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনার জন্য টাউনহলে অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচজন পণ্ডিতই সতীদাহের বিরুদ্ধে মত দেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ৪ঠা ডিসেম্বর আইন ক'রে সতীদাহ রহিত করেন। Government Gazette এ

---

১২। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত (১)—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ ১০

১৩। The Life and letters of Raja Rammohan Roy. S, D, Collet, P 27

১৪। বিদ্রোহী ডিরোজিও—বিনয় ঘোষ। পৃ ৩৩

ইংরেজীতে আইনটি প্রকাশিত হয়। *এর বাংলা অনুবাদ করেন ডব্লিউ কেরী। **

সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় রক্ষণশীলদলও চুপ রইলেন না। ধর্ম সভার পক্ষ থেকে আটশ অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত সতীদাহের পক্ষে এক আবেদন পত্র দাখিল করা হয়। পরে ধর্মসভার পক্ষে কলকাতার ডেপুটী শেরিফ ব্যথী সাহেব সতীদাহ পক্ষে তদ্বির করতে বিলাত যাত্রা করেন। রামমোহন রায় ও বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন ক'রে বিলাত যাত্রা করেন। শেষ পর্যন্ত ধর্মসভার আপীল নৃশংস নরহত্যার জন্য প্রিভি কাউন্সিলে ৬—৪ ভোটে বাতিল হয়। এভাবে উনিশ শতকের প্রথমদিকের ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের প্রথমযুগ শেষ হয়।

এ দেশের ধর্ম, সমাজের গোঁড়ামি এবং প্রথাগত আচার আচরণকে দূর করতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। 'এই শিক্ষায়তনের মূল উদ্দেশ্য হ'ল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইওরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্ক শিক্ষা দেওয়া।'

১৮১০ খৃষ্টাব্দে মিঃ লেনার্ডের উৎসাহে দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য 'বেনেভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউশন' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মিশনারীদের বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর বা দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষাদানের সঙ্গে বাইবেলপাঠ বাধ্যতামূলক ছিল ব'লে খৃষ্টধর্ম প্রচারে সুবিধা হয়।

১৮১৯ এর মাঝামাঝি মিসেস পীয়ার্স ও মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ স্ত্রীশিক্ষাপ্রচলনের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপন করেন। কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি এই সোসাইটিকে বালিকা-বিদ্যালয়ের ভার দেয়। 'এই সভার অধীনে শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটেলীতে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়' [১৫]

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর মিস কুকের এই দেশে উপস্থিতি স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করে। রামমোহন রায় এবং রাধাকান্ত দেব ধর্মমতে পৃথক

---

* পরিশিষ্ট ১ ক

** ঐ ১ খ

১৫। ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত—শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র। পৃ ৮

হ'লেও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। রামমোহন রায়ের ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to Hindoo Law of Inheritance' পুস্তক রচনা এবং রাধাকান্তদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের ঐ বছরেই প্রকাশ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বাইনাচ অথবা রোশনাই ক'রে অর্থব্যয় না ক'রে রাজা বৈদ্যনাথ রায় বালিকাদের শিক্ষার জন্য কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছেন ব'লে পত্রিকায় আশা করা হয় 'এই দৃষ্টান্তে কলকাতাস্থ অন্য ২ ভাগ্যবান মহাশয়েরা ঐরূপ কর্ম্মের কারণ অবশ্য অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।' [১৬]

বালিকাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলে। কিন্তু এ যেন 'চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরের্মাতুর্গলে ব্যথা।' [১৭] পুরুষে লেখাপড়া শিখে যদি চরিত্র ঠিক রাখে এবং বিপত্নীক না হয় তবে স্ত্রীলোকে কেন নষ্টচরিত্র ও বিধবা হবে? হিন্দুকলেজের প্রতিভাবান, স্নেহপরায়ণ অল্পবয়স্ক শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের স্বাধীনচিন্তা ও মতামত প্রকাশ করবার জন্য মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণসিংহের বাগানবাড়ীতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা এই সভায় হ'ত। 'এই যুগটাই ছিল সংস্কারের যুগ—যেমন বাইরের জগতে তেমনি ভিতরের জগতে, অর্থাৎ যেমন ইয়োরোপে তেমনি বাংলায় বা কলকাতায়।' [১৮]

রামমোহন রায়ের উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সুনজরে পড়ে নাই। রামমোহন সতীদ্বেষী হওয়ায় তাঁর এককালের সহযোগী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার সম্পাদক হন। 'রামমোহন রায়কে হত্যা করিবারও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয় এবং একাধিকবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আক্রমণকারীদল কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হন।' [১৯] সাধারণ লোক ব্রহ্ম সমাজের ধীর স্থির ও শান্তভাবে যুক্তিবোধের জন্য ব্রহ্মসভাকে 'শীতলসভা' এবং

১৬. সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ( ১ম খণ্ড )—ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ ১৭

১৭. স্ত্রীশিক্ষা বিধা —দ্বারকানাথ রায়। পৃ ৮

১৮ বাংলার জাগরণ—কাজী আব্দুল ওদুদ পৃ ৪৫

১৯. বাংলার নারী জাগরণ—প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ৯

ধর্ম শাস্ত্র, সমাজ প্রভৃতি নিয়ে ধর্মসভা বাদপ্রতিবাদ ও কটুকাটব্য করত ব'লে একে 'গুড়ুম সভা' বলত।[২০] ধর্মসভা জাতি নিয়ে অত্যন্ত মাথা ঘামাত। ১২৩৬ সালের ২৬শে মাঘ কাশীপুরে ধর্মসভার অধিবেশনে স্থির হয় যে হিন্দু হয়ে সতীদ্বেষী হ'লে জাতিচ্যুত হ'তে হবে।

জাতিভেদ নিয়ে দলাদলি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের দ্বারা চরমে পৌঁছে। সেকালের পত্রিকা সম্বাদকৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা যখন জাতিভেদ নিয়ে তৎপর 'তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য্য।'[২১]

রামমোহন রায় যাবনিক খাদ্যে দোষ দেখতেন না; এমন কি যাবনীগমনেও তাঁর সমর্থন ছিল। হাটখোলার প্রসিদ্ধ কালীপ্রসাদ দত্ত এবং বিবি আনরকে নিয়ে 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম' ঘটে। এই সামাজিক আন্দোলনে শোভাবাজারের রাজারা এবং রামদুলাল সরকার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই সময়ে একটি গান শোনা যায়—"গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী।"

রামমোহন রায়ের অনুরোধে Church of Scotland Assembly দ্বারা প্রেরিত আলেকজাণ্ডার ডাফ্ দ্বারা জোড়াসাঁকোর কমল বসুর বাড়ীতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এক স্কুল খোলা হয়। ক্রমবর্ধমান সংশয় ও নাস্তিকতার সুযোগে হিন্দুকলেজের বিপরীত দিকে কলেজস্কোয়ারে ডাফ তাঁর নিজের বাড়ীতে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যদের স্ত্রী-শিক্ষা ও হিন্দুধর্মের কুসংস্কার এই দুটি সামাজিক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে পাদরি হিল সবার উপরে খ্রীষ্টধর্ম সত্য এই বিষয়বস্তুর উপরে বক্তৃতা দেন।

স্বাধীনচিন্তা, যুক্তিবোধ ও বিতর্কশক্তি ছাত্রদের মনে জাগিয়ে ডিরোজিও নাস্তিকতা ও বিধর্মী আচরণের অভিযোগে কলেজ ম্যানেজিং কমিটিতে অভিযুক্ত হন। পদত্যাগ বা পদচ্যুতি যাই হোক এ দেশ তাঁর কাছে ঋণ স্বীকারে লজ্জিত এটাই আক্ষেপ। স্বাধীনচিন্তা ও মতামত প্রকাশের রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে

২০। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (২য় খণ্ড)—বিনয় ঘোষ। পৃ ১৭৪

২১। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু। পৃ ৩২

ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীরা বীজ বপন করেছিলেন। হিন্দুকলেজের নব্য শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের তৎকালের দুর্বল অবস্থায় ব্রাহ্ম দল যদি যুবসম্প্রদায়কে সাহায্য করতেন তাহ'লে ডিরোজিওর অকালমৃত্যু হ'ত না। তাঁর অকালমৃত্যু আত্মহত্যারই নামান্তর।

হিন্দুকলেজ, ইংরাজী শিক্ষা, নাস্তিকতা, বিদেশী রীতিনীতি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে তখন সামাজিক আন্দোলন কম নয়। [২২, ক, খ], ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ আগষ্ট গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর উত্তরে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা গোমাংস খেয়ে হাড় ছুঁড়ে দেয়। এই অপরাধে কৃষ্ণমোহন গৃহচ্যুত হন। হিন্দুকলেজের শিক্ষানীতিতে 'হিন্দুয়ানি' অমান্য করার বিষয়ে উইলসন সাহেবের বক্তব্য স্মরনীয়। [২৩] এই হিন্দুয়ানি বলতে উইলসন সাহেব যা বুঝাতে চান তা যদি গোঁড়ামি ও আচারসর্বস্বতা হয় তাহ'লে প্রতিবাদযোগ্য নয়। আর যদি সব বিষয়ই ঘৃণ্য হয় তাহ'লে যে শিক্ষা নিজের ধর্ম ও সমাজকে ঘৃণা করতে প্ররোচিত করে তা ত্যাগ করে মূর্খ হয়ে থাকাও ভাল। ফলে 'More than a hundred students were removed from the college.' [২৪]

রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রায় ব্রাহ্মসমাজ দুর্বল হয়। তখন আন্দোলন চলতে থাকে রক্ষণশীল ও হিন্দুকলেজের ছাত্রদের তথা ইয়ং বেঙ্গল বা ইয়ং ক্যালকাটার মধ্যে। 'The strength of the sensation led them into attacks on traditional Hinduism. Rasik Krishna Mullick's open denial of sanctity of the Ganges, Radhanath Sikdar's insistence on beef eating ('Beef eaters are never bullied'), Ramgopal Ghose's refusal to undergo prayaschitta or penance, the saucy school boy's cavalier treatment of a Hindu Goddess ( Good Morning, Madam )

২২। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল। পৃ ৫৫

ক) সমাচার চন্দ্রিকা ৫৮৪ সংখ্যা পৃ ৩৩—৩৪

খ) ঐ ৫৮৬ ,, পৃ ৪৬

২৩। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ( ২য় খণ্ড )—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ ১৬

২৪। *Calcutta Review* 1852 P 358

become comprehensible in the context of the period.' [২৫]

উনিশ শতকের তিরিশের কোঠায় এ দেশে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুসমাজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন নন্দী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হ'লেন। এতদিনে পাদ্রীদের আশা পূর্ণ হ'ল। পক্ষান্তরে অন্য একদল নব্য যুবক স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি প্রচেষ্টায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর 'সর্ব্বতত্ত্ব দীপিকা সভা' স্থাপন করেন। [২৬] এই সভায় ধর্মালোচনাও নিষিদ্ধ ছিল না। সভার সভাপতি ছিলেন রমাপ্রসাদ রায় এবং সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যদিকে রটনা এই যে দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। তাঁর পিতার দ্বারা নিগৃহীত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়ী ত্যাগ করায় বন্ধুবৎসল দক্ষিণারঞ্জন বাড়ীতে ফিরে এসে এ সংবাদ শুনে তিনিও গৃহত্যাগ করেন। [২৭] কিন্তু ডফের মত পাদ্রীর স্নেহভাজন হ'য়েও এবং কৃষ্ণমোহনের মত অভিন্নহৃদয় বন্ধুর অনুপ্রেরণাতেও তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ডফ, ডিয়ালট্রি, হিল প্রভৃতি শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করায় তার প্রভাব যুবসম্প্রদায়ের উপর পড়েছিল। আবার ব্রজনাথ ঘোষ নামে এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রকে কৃষ্ণমোহন খৃষ্টান করার জন্য তার পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু 'হেবিয়াস কর্পাস বিধি অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সম্মুখে কৃষ্ণমোহনকে হাজির করান হইয়াছিল।' [২৮] সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তিনি তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

লর্ড মেকলের বিখ্যাত মিনিটে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সমর্থিত। তাঁর প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজ বন্ধ না হ'লেও এতে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত হয়। পূর্বে ইংরেজী পড়ন না হওয়ায় সরকারী চাকুরির অসুবিধা হ'ত, এখন ইংরেজী শিক্ষিত হ'লে হিন্দুনীতি মানবে না ব'লে তুলে দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করা ব'লে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। [২৯] অবশ্য হিন্দুমুসল-

২৫। The History of Bengal -Ed. N. K. Sinha. P 401—402
২৬। জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল। পৃ ৪৭-৪৮
২৭। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ। পৃ ৫৪
২৮। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা পৃ ২৩
২৯। বাংলার উচ্চ শিক্ষা—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল। পৃ ২৪—২৫

মানের মনোভাব বুঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ঘোষণা সরকারকে করতে হয়েছিল। '১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইলে এবং উচ্চতর শিক্ষায় এই ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হইলে সমগ্র জাতির প্রাণ-চেতনায় ভাববিপ্লবের বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল।' ৩০

ইংরেজী শিক্ষার ফলে হিন্দু সমাজের ত্রুটি ধরা পড়ে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে হিন্দুসমাজে কুলীনকন্যাদের করুণ কাহিনী জোরভাবে প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে সমাচার দর্পণে ( ১৭ মার্চ ১৮৩৫ ) শান্তিপুর নিবাসী স্ত্রীগণের পত্র উল্লেখযোগ্য। ১২৪৪, ৫ই আষাঢ় সমাচার দর্পণে হিন্দুসমাজের বহু-বিবাহের কথা উল্লিখিত, এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় কোন্ কুলীনের বিবাহ সংখ্যা কত তাদের নাম নিবাস ইত্যাদি প্রকাশিত।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ল কমিশনের সেক্রেটারী গ্র্যান্ট সাহেব হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে আইন পাস করার বিষয়ে বিশিষ্ট ইংরেজ আইনজ্ঞদের অভিমত জানতে চান। সতীদাহ বন্ধ হ'লে হিন্দু সমাজে বিধবা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সে বিষয়ে চিন্তাই এ রকম [illegible]র কারণ। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ( Society for the Acquisition of General Knowledge ) প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রকার জ্ঞান-অর্জন, দেশের অবস্থা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং দেশের লোকের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতির ভাব সঞ্চার করা এর উদ্দেশ্য। উক্ত সভায় মহেশ চন্দ্র দেব A sketch of the condition of the Hindoo Women পাঠ করতে গিয়ে বলেন— 'Gentlemen, there remains but one topic connected with the sufferings of the Hindoo women I mean the marriage system which prevails amongst the Kulin brahmins.' ৩১

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতৃগণ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। 'গৌড়ীয় সমাজ হইতে এ পর্যন্ত

৩০। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—
শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ ১৫২

৩১। Awakening in Bengal.-Vol one Ed.—
Goutam Chattopadhyaya. P 104

বহু সভা সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয়তার ব্যাপক ও উদার আদর্শ লইয়া এই সভাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইল।'[৩২] এতে জাতীয়তা বৃদ্ধি ও খৃষ্টানী হ্রাস হয়। স্বদেশের সামাজিক চিন্তায় মতিলাল শীল ভ্রূণহত্যা নিবারণের জন্য গর্ভবতী বিধবাদের প্রসূতিভবন ও নবজাত শিশুদের আবাসের জন্য সরকারকে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যপক্ষে ইংরেজ ভক্তি ও স্তুতি এ দেশে চলে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে ফেব্রুয়ারী দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার বাগানে গভর্নর জেনারেলের ভগ্নী মিস ইডেন ও অন্যান্য বিবি ও সাহেব নিয়ে এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। 'রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে, বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।'[৩৩] আবার এদেশীয় বাঙ্গালীর কথায় বাঙ্গালীদের নিয়ে তিনি ঐ বাগানেই 'বাইনাচ ও গান বাজনা দিয়া একটা জমকাল মজলিস্ করিলেন।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সব পছন্দ না হওয়ায় তাঁর পিতৃদেব অসন্তুষ্ট হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভোগ বিলাসিতা ছেড়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় স্ত্রীজাতির উন্নতিতে মন দিয়েছিলেন। রামগোপাল ঘোষের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ইয়ং বেঙ্গলদলের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটরে বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে আলোচনা হয়। অন্যদিকে জুন মাসে অক্ষয় কুমার দত্ত ও প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহযোগিতায় বিদ্যাদর্শন নামে একখানি মাসিক পত্রিকায় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা চলে। প্রথম প্রথম বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার এবং রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টি দেয় কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা সমাজ-বিষয়ে দৃষ্টি দিলে উক্ত সোসাইটি এক রাজনৈতিক সভাতে পরিণত হয়। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে এক নিভৃতগৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদপাঠ হ'ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্য বেদপাঠ হবে ব'লে ঘোষণা করলে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত হয় এবং হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার মূলে ব্রাহ্মসমাজ কুঠারাঘাত করে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তত্ত্ববোধিনী

---

৩২। বাংলার নব্য সংস্কৃতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ ২৭—২৮

৩৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। পৃ ৩৯

সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয় কুমার দত্ত এর সম্পাদক। 'শিক্ষায় স্বাবলম্বন, খৃষ্টানদের আক্রমণ হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মীয়দের রক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজা—প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, জমিদারি ব্যবস্থার কুফল, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহুবিষয়ের আলোচনা দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের প্রেরণা দেয়।' [৩৪]

এত কথায় কেউ যেন মনে না করেন যে তখন খৃষ্টানী স্রোত বন্ধ ছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীর শীত প্রভাতে কলিকাতার মিশন রো'র গগনচুম্বী-চূড়াশোভিত "ওল্ড মিশন চর্চ্চ" ধর্ম্মমন্দিরে মধুসূদন নবধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন।' [৩৫] বিশৃঙ্খলার ভয়ে সৈনিক প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী নির্বাচিত সাক্ষী ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে মধুসূদনকে এনে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে হিন্দুধর্মে ফিরতে তিনি আপত্তি জানান। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খৃষ্টধর্ম গ্রহণে অসন্তুষ্ট হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয় কুমার দত্তকে দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি 'তেজস্বী প্রবন্ধ' লেখালেন। খৃষ্টানী প্রভাব নষ্ট করার জন্য সব হিন্দু এক সঙ্গে অগ্রসর হন। প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, ব্রাহ্মপন্থী সংস্কারবাদী দেবেন্দ্রনাথ এবং নব্যপন্থী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অগ্রণী হ'য়ে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে মে শিমলায় মতিলাল শীলের বাড়ীতে এক সভা করেন। 'বাড়ী বাড়ী যাইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহারা সন্তান সন্ততিদিগকে পাদ্রীদের স্কুলে প্রেরণ না করেন।' [৩৬] ফলে সভাতে প্রায় এক হাজার ব্যক্তি উপস্থিত হন। খৃষ্টানী প্রতিরোধকল্পে এই সভাতে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে এক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতও হয়। দেবেন্দ্রনাথ 'মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল'

৩৪। বাংলার নব্য সংস্কৃতি—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল। পৃ ৩৪

৩৫। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃ ৪২

৩৬। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ—ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত। পৃ ৬৮

ব'লে বর্ণনা করলেও এতে ধর্মান্তরিত হওয়া বন্ধ হ'ল না। কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ় হওয়ায় খৃষ্টান সমাজ ক্রমশঃ কর্মশক্তি হারাল এবং হিন্দু-সমাজ তার প্রভাব বৃদ্ধি করতে লাগল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের একুশ আইন দ্বারা (Lex Loci) ধর্মান্তরিত ব্যক্তির পূর্বের অধিকার বহাল থাকবার ঘোষণা খৃষ্টান হওয়ার অসুবিধা দূর করে। অন্য দিকে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ধর্মান্তরিতকে পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনবার জন্য এক সভা হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে 'পতিতোদ্ধার সভা'র প্রথম অধিবেশন হয়। পরে এই সভার সভ্যগণের অনুমতিক্রমে 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্র' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

হিন্দুসমাজের সংস্কারের প্রয়োজনে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ঠনঠনিয়ায় রামচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে 'সর্ব্বশুভকরী' নামে এক সভায় হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সব বিষয় আলোচিত হয়। এই সভার সর্ব্বশুভকরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে যে কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়। বেথুন সাহেব সতীদাহের পক্ষে থাকার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্ত্রী জাতির উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে ভদ্র পরিবারের বালিকাদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ এক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে হীরা বুলবুল নামে এক বাঈজির পুত্রের হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ নিয়ে হিন্দুকলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলে। হিন্দু প্রধানগণ এক হ'য়ে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী হইয়াছিলেন এবারে সেইরূপ উদ্যোগী হইলেন ওয়েলিংটনস্থ দত্ত পরিবারের বিখ্যাত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়।'[৩৭] হিন্দুদের প্রতিবাদে শিক্ষা কমিটি শেষ পর্যন্ত বাঈজীপুত্রের নাম কলেজের খাতা থেকে কেটে দেন।

---

৩৭। বাংলার উচ্চশিক্ষা—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল। পৃঃ ৪৪

এ দেশের সামাজিক আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সভার মুখপত্র বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকায় বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রভৃতি রচনায় এ দেশের কুসংস্কার দূরীকরণে চিন্তার পরিচয় আছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর কাশীপুরের বাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' স্থাপন করেন। এই সমিতির প্রথম দিনের অধিবেশনে—স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ রীতি বন্ধ করা— এই সব উদ্দেশ্য প্রকাশিত। হিন্দুবিধবার বিবাহ আইন ছাড়া অসম্ভব ব'লে আইনগত বাধা দূর করার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করার প্রস্তাবও এতে গৃহীত হয়।

রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনে আগ্রহী হয়ে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' (প্রথম পুস্তক) প্রকাশ করেন। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিদ্যাসাগরের এই রচনার প্রতিবাদে তৎপর হ'লে বিদ্যাসাগর তাদের সব যুক্তি খণ্ডন ক'রে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা (২য় পুস্তক) রচনা করেন। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র বিদ্যাসাগর ভারতসরকারের নিকট পাঠিয়ে বিধবাবিবাহ আইন পাস করাতে সচেষ্ট হলেন। ব্যবস্থাপক সভায় দাখিল করার জন্য গ্র্যাণ্ট সাহেব উক্ত বিষয়ে আইনের পাণ্ডুলিপির খসড়া করেন। হিন্দুসমাজের কাছে আবেদন (পুরস্কার ঘোষণা) করেও মতিলাল শীল বিধবাবিবাহ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্মুখে রামমোহনের সতীদাহ আন্দোলন আদর্শ হিসাবে থাকায় তিনি তাঁর বিধবাবিবাহ পুস্তক দুটির ইংরেজী অনুবাদ 'Marriage of Hindu Widows' নামে প্রকাশ করেন। কারণ-স্বরূপ তিনি লিখেন—'I found that since the publication of my pamhlets, several parties attempted to misrepresent things to the English Public in Reviews

and Journals '[৩৮] যাই হোক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ায় উক্ত বিষয়ে বাধা দূর হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে প্রথম বিধবাবিবাহকারীকে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় রামধন তর্ক-বাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীমণি দেবীর কন্যা কালীমতীর যে বিবাহ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় তা বাংলাদেশের প্রথম বৈধ বিধবাবিবাহ। এ বিবাহে কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের অনেক সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতে পারি 'বিবাহ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল।'[৩৯] এর পর আরও কয়েকটি বিধবাবিবাহ হয়েছিল কিন্তু বিধাবিবাহকে কেন্দ্র ক'রে সমাজসমুদ্র মন্থনের ফলে যে হলাহল উঠেছিল তা বিদ্যাসাগরকে আকণ্ঠ পান করতে হয়।

হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ ও এক কুপ্রথা ছিল। কৌলীন্যের ফলে এর সৃষ্টি। পণপ্রথা এর আনুষঙ্গিক। হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ বন্ধ হ'লে বিধবার সমস্যা অনেক লাঘব হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর্গসমবায় নামে এক সমিতি স্থাপন ক'রে তা থেকে বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় ব'লে এটা রহিত করতে বর্ধমানের মহারাজের নেতৃত্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক আবেদনপত্র পাঠান। কৌলীন্য তথা বহুবিবাহ-পক্ষীয়গণ ও হিন্দুধর্মে হস্ত-ক্ষেপ হবে এই মর্মে প্রতিবাদ জানিয়ে আবেদন করেন। ফলে কোন আইনই পাস হ'ল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আবেদন করেন। রমাপ্রসাদ রায়ও এই বিষয়ে যত্নশীল হন। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের কারণ হিসাবে জনরব এই যে সিপাহীদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করায় তাঁরা বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে বিধবাবিবাহ আইন ইন্ধন জোগায়। সুতরাং বহুবিবাহ বন্ধ ক'রে আর এ দেশবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে সরকার সাহসী হলেন না। সিপাহীবিদ্রোহ শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। বরং অনেকেই শাসকপক্ষকে সমর্থন ক'রে

৩৮। Maraiage of Hindu Widows—Eswar Chandra Vidyasagar. Preface P 1

৩৯। বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রম নিরাশ—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পৃ ১১৯

এ বিদ্রোহকে সফল হতে দেন নাই। তবুও এর কারণ ও প্রকৃতি বিচারে এটা এ দেশের প্রথম ধর্মযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলন। এর পরই দেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত রোষাগ্নি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠায় সরকার নীল কমিশন গঠন করতে বাধ্য হন; ফলে এই দেশ থেকে নীলচাষ উঠে যায়। স্বদেশচেতনা ও স্বাধিকার রক্ষায় এটা দ্বিতীয় জয়।

কেশবচন্দ্র সেন বন্ধুদের সঙ্গে মিলে নিজের বাড়ীতে Good Will Fraternity নামে এক সভা স্থাপন করেন। আর ১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঞ্জাবীদের সুহৃদগোষ্ঠীর সঙ্গত সভার প্রভাবে ঐ সভায় ধর্মালোচনার জন্য 'সঙ্গত সভা নাম রাখেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সভায় অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২রা আগষ্ট নব্যদলের উদ্যোগে এক অসবর্ণ বিবাহ হয়। পাত্র বৈদ্য শ্রীপার্বতীচরণ গুপ্ত, পাত্রী বিধবা বৈষ্ণবকন্যা কামিনী। এর পূর্বে অজ্ঞাতকুলশীল দুই সমাজচ্যুত যুবকযুবতী ব্রাহ্মধর্মের বিধানমতে বিবাহ করে। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ যখন অসবর্ণ বিবাহে সহযোগিতা করে তখন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে কুড়ি হাজারেরও বেশী লোক বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আবার সরকারের নিকট আইন পাসের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর মেইন সাহেব 'The Native Marriage Bill' নামে একটি বিল আইন সভায় উপস্থিত ক'রে অসবর্ণ বিবাহকে (ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে বিবাহ) আইনসিদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনও এই বিবাহ আইন সিদ্ধ না হওয়ায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার সেন রাজলক্ষ্মী মৈত্র নামে এক ব্রাহ্মণকন্যাকে ব্রাহ্মপদ্ধতিতে বিবাহ করলে ভারতের এ্যাডভোকেট তা অবৈধ বলেন।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মবিবাহকে নামহীন রেখে বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দুইটি প্রশ্ন তখন প্রবল হয়—এই আইন কাদের জন্য এবং এই আইনে কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স কত? ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ হ'লে তাতে কন্যার সর্বনিম্ন বয়স ১৪ বৎসর ধরা হয়। এর দ্বারা প্রকারান্তরে বাল্যবিবাহ রহিত হওয়ার চেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারী বহুবিবাহ নিরোধের জন্য সরকারের নিকট দ্বিতীয়বার আবেদন পত্র পাঠান। শেষ পর্যন্ত বহুবিবাহ

রহিত করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তাতে ঈশ্বরচন্দ্র ছাড়া আর সকলে আইন পাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। শিক্ষা ও শুভবুদ্ধির ফলে এই প্রথা ধীরে ধীরে দূর হবে—অন্য সদস্যদের এই অভিমত। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশ ক'রে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমান দেন এবং এই পুস্তকের বিরুদ্ধে যে সব প্রতিবাদ উঠেছিল সেগুলি খণ্ডন ক'রে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক' ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সমগ্র হিন্দুসমাজের সমস্যা নয়; বিশেষ শ্রেণীর হিন্দুর সামাজিক সমস্যা। শাস্ত্রে কি আছে আর কি নাই তা বুঝা যায় না। তবুও সতীদাহ নিরোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ রহিত হওয়া মানবিকতার দিকে প্রয়োজন ছিল। এখন আর সমাজ এই সব বিষয়ে মাথা ঘামায় না।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেন The Indian Reform Association বা ভারত সংস্কার সভা স্থাপন করেন। সভার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার সাধন ('to promote the social and moral reformation of India.') এর পাঁচটি শাখা—স্ত্রীজাতির উন্নতি, শ্রমজীবীদের শিক্ষা এবং কারিগরি বিদ্যালয়, সুলভ সাহিত্য, মাদক দ্রব্য নিবারণ ও দাতব্য। 'সুরাপান নিবারিণী বিভাগ হইতে "মদ না গরল ?" নামে একখানি পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হইত।' [৪০] এর পূর্বে কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই নিজের বন্ধুবান্ধবগণের পত্নীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে এক সভা স্থাপন ক'রে মহিলাদের মধ্যে আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ, তর্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। কেশবচন্দ্র স্থাপিত ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী—বিদ্যালয়ের বয়স্কা ছাত্রীগণ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৪ ই এপ্রিল 'বামাহিতৈষিণী সভা' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য বামা রচনাবলী প্রকাশিত হয়।

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিষয়ে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে আন্দোলন হয়। স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথার মূলে কলকাতার ঠাকুর পরিবার প্রথম কুঠারাঘাত করে। পরবর্তীকালে অতিঅগ্রসর ব্রাহ্মদলের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের মতভেদে

৪০। কেশব চন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীজগবন্ধু মৈত্র। পৃ ৪২

এর অগ্রগতি এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যস্থানে পুরুষের সঙ্গে একাসনে স্ত্রীলোকের উপবেশনে এর পরিণতি। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের চন্দ্রমুখী বসু সম্বন্ধে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে চন্দ্রমুখীকে ধরা হবে না এবং পাসের উপযুক্ত নম্বর পেলেও উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায় তার নাম থাকবে না—এই সিদ্ধান্ত দুঃখজনক। যে যুগে নারীপ্রগতির অনেক চেষ্টা চলছিল সেই যুগে নারীশিক্ষায় এই বাধা শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিল প্রস্তাবাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দূর ক'রে নারীর অধিকার স্বীকার করে।

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সমাজে মদ্যপান ও বেশ্যাগমন প্রচলিত হয়। মদ্যপান বন্ধ করার জন্য সরকার চেষ্টা করেন নাই কারণ এতে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে স্বাস্থ্যনাশ, সংসারে বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে মদ্যপান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এক সভা করেছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর প্যারীচরণ সরকার কলকাতায় বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ ( The Bengal Temperance Society) প্রতিষ্ঠা ক'রে সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। Well Wisher ও হিতসাধক এই দুটি পত্রিকা মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ তাঁকে সাহায্য করেন। মদ্যপান ও মদ্যবিক্রয়ের জন্য অনিষ্টের পরিমাণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণের প্রস্তাব হয়। আবেদনপত্র প্রেরিত হ'লেও এতে কোন ফল হয় নাই।'[৪১] শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ম আইন পাস হওয়ায় এই কুরীতির প্রভাব কিছু কমে যায়।

বেশ্যাগমনও সামাজিক কুরীতি। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের অভাব এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের প্রভাব বেশ্যাসৃষ্টিতে সাহায্য করে। যে কোন কারণে নারীর একবার পদস্খলন হ'লে হিন্দুসমাজে আর স্থান নাই। বেশ্যাগমন নিয়েও আন্দোলন হয়। তবে তা তত জোর হয় নাই। কি শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়, কি প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল দল কেউই এ বিষয় নিয়ে জোরে ঢাক বাজাতে সম্মত ছিলেন না। তবুও সেই যুগে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে Indian Contagious

৪১। প্যারীচরণ সরকার—শ্রীনব কৃষ্ণ ঘোষ। পৃ ১০৯—১১০

Diseases Act পাস হওয়ার মূলে এই সামাজিক তৎপরতা ছিল বলা যায়।

পণপ্রথাও বেশ্যাসৃষ্টির সহায়ক। অনেক পুরুষ উপযুক্ত কন্যাপণ দিতে না পারায় অবিবাহিত থাকে। আবার যে বেশী পণ দেয় তার গুণাগুণ, বয়স প্রভৃতি বিচার করা হ'ত না। ফলে অসমবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ চলতে থাকে। পুরুষের বিবাহ নিয়ে সমাজের সমস্যা কম কিন্তু কন্যার বিবাহ না হ'লে চিন্তার বিষয়। পণপ্রথা নিয়ে আন্দোলনও হয়েছিল। ফলে কন্যাপণ এখন প্রায় উঠে গেছে। তার পরিবর্তে বরপণের মাত্রা এত বেশী হয়েছে যে তা বলার নয়। এখনও শিক্ষিত যুবকের পক্ষে 'আমি বিয়ে করবই না—যদি না দাও কুড়ি ভরি সোনা' —এই মনোভাব দূর হয় নাই।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে আর একটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আমাদের ধর্ম ও সমাজে নানা পরিবর্তন এসেছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দুধর্ম ও সমাজে 'সব গেল, সব গেল,' ব'লে যে গোলমাল উঠেছিল তা ঐ শতকের শেষদিকে কমে যায়। এ যেন প্রবল বন্যার পর নদীর পূর্বরূপ ধারণ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা' স্থাপনে অগ্রসর হন। এ থেকে নবগোপাল মিত্র ও তাঁর সহকর্মিগণ হিন্দু মেলা স্থাপন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের 'সমুন্নত আকার মাত্র' মনে করতেন। তাঁর বক্তৃতায় সেদিন রক্ষণশীল দল, কেশবপন্থী ব্রাহ্মদল এবং হিন্দু খৃষ্টান দল উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এই বক্তৃতায় নিন্দা এবং প্রশংসা উভয়ই বক্তার উপর বর্ষিত হ'ল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন 'বক্তাকে আগে গোবর খাওয়াও', সাকারবাদী বাঙ্গালীসভা তাঁকে 'হিন্দুকুলচূড়ামণি' সম্বোধনে পত্র লিখেছিলেন। 'বিখ্যাত বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তদানীন্তন নিজ সম্পাদিত সংবাদপত্রে ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে বলেন যে শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর হইতে আনীত চুন দ্বারা হিন্দুধর্মের কলি ফেরান হইতেছে।'[৪২] এই বক্তৃতায় বক্তার সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর উপবীত নিয়ে রাজনারায়ণ বসুর গলায় দিয়েছিলেন। এরপর রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (Old Hindu's Hope) সত্যই হিন্দুর আশা আকাংক্ষার রূপ। আবার এর থেকে 'মহাহিন্দু সমিতি' স্থাপনে অভিলাষ সত্যই অভিনন্দনযোগ্য।

---

৪২। আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু। পৃ ৫৬

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক নাটকগুলির আঙ্গিক ও শিল্প সচেতনতা।

ইংরেজদের এদেশে রাজনৈতিক অধিকারের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নগরকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী বেনিয়ান মুৎসুদ্দি-নিয়ন্ত্রিত সমাজে পরিণত হয়। জমিদার শ্রেণীর স্থানে এল বাবু সম্প্রদায়। গ্রামীণ সভ্যতায় জমিদারদের যে লোকহিতকর কাজকর্ম ছিল শহরে তার সুযোগ কম। পল্লীঅঞ্চলে জমিদার ও প্রজার হৃদ্যতা শহরে অভাব। ফলে এক বাবু পায়রা উড়িয়ে বুলবুলির নাচ দেখে, বাইজী অথবা বেশ্যা নিয়ে, মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে সর্বস্বান্ত হ'লে পারিষদবর্গ তাকে ছেড়ে অন্য বাবুর সন্ধানে তৎপর হ'ত। গ্রামে টাকা উড়াবার উপায় কম। শহরের চোখ-ঝলসানো আধুনিক চালচলনের জৌলুসে তখন অনেকেই মুগ্ধ। শহর কলকাতায় এই ভাবেই জনসমাগম।

বহু মানুষের বহু ঝামেলা। তাদের নানা চাহিদা। কেউ বা প্রাচীন রীতির অনুবর্তী, কেউ বা নূতনের ধ্বজাবাহী, আবার কেউ বা দুয়ের মাঝামাঝি। কোথাও প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালী, কোথাও ইংরেজী থিয়েটার আবার কোথাও বা বাংলা নাটকের অভিনয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকে কলকাতার সামাজিক বৈচিত্র্যই এর পরিপোষক। বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজ তখন উত্তাল। সেই অবস্থায় বাংলা নাটকের জন্ম। কারণ 'অচল বাধা এবং তার সঙ্গে অনিবার সংগ্রাম, এইখানেই তো নাটকের লীলা' [১]

বিধবার হিন্দুসমাজে হীনাবস্থা—তার বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রের তথা সমাজের বাধা—সেই বাধা অতিক্রমের চেষ্টা—এই উপলক্ষে দ্বন্দ্ব। বাল্যবিবাহ ও তার ফলে অল্পায়ু ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রীপুত্রকন্যা। কিন্তু এ যে শাস্ত্রের বিধান! গৌরীদান যে পরম পুণ্যের! বেশী বয়সে বিবাহে চরিত্র স্খলনের আশঙ্কা। সুতরাং বিরোধ অনিবার্য। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ যে বল্লালের সৃষ্টি—ঐতিহাসিক

---

১। নাটকের কথা—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। পৃ ১

বন্দোবস্ত! অসম বিবাহে কি আসে যায়? মূর্খে কি দোষ? কুলীন তো বটে! কৌলীন্যের টিকিট নিয়ে শ্মশানযাত্রা পর্যন্ত বিবাহ না করলে কুলীনের কৌলীন্য কোথায়? এক স্বামীর মৃত্যুতে বহুবিধবার সৃষ্টি—তাতেই বা কি আসে যায়? বিধবার ভরণপোষণের খরচ কম। যদি কোন বিধবার চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে তার উপায় অনেক। গোপনে ব্যভিচার চালালে সমাজের কিছু যায় আসে না। আর লোক জানাজানি হ'লে শহরে দোকান খুলবে—কত বাবু সন্ধ্যার পর আমোদ করতে আসবে। সেখানে মদ্যপানের জন্য সরকার বাহাদুর দোকান খুলেছেন। এ দেশের লোক মদ্যপায়ী হোক—বেশ্যাসক্ত হোক—তার স্ত্রী নিদ্রাহীন চোখে ধরিত্রীকে সিক্ত করুক—অথবা গোপনে পর-পুরুষাসক্ত হয়ে কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করুক—এতে চিন্তা কি? কেউ অধ্যাত্মচিন্তার পরামর্শ দিবে—কেউ পূর্বজন্মের পাপের কথা বলবে, কেউ বা তার বিদ্যাভ্যাসের উপদেশ দিবে। আবার কেউ বা বলবে—স্ত্রীশিক্ষা, রাম, রাম, স্ত্রীলোক শিক্ষিত হ'লে আর রক্ষা আছে? কেউ বা বলবে—তারা কি ভগবানের সৃষ্টি নয়? তারা কি চিরকাল দুঃখভোগ করতে এ জগতে এসেছে?

সমাজের প্রতিফলন সাহিত্যে। নাটক বাংলা সাহিত্যে নবজাত হ'লেও এতে সামাজিক আন্দোলন যেভাবে চিত্রিত বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় সেরূপ নয়। কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতিতে লেখক কোন মতকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু নাট্যকারকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে নাটক রচনা করতে হয়। বলাই বাহুল্য যে উনিশ শতকের সামাজিক নাটকগুলিতে সে নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল না। প্রচারধর্মিতার দোষে অনেক নাটকই নাটক হয় নাই। এটা স্পষ্ট যে অনেক নাট্যকারই যুগের হুজুগে মেতে নাটক রচনা করেছেন। যাঁদের প্রতিভা আছে—নাট্যশিল্পসচেতনতা আছে—তাঁরা কালজয়ী হ'য়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছেন। আর যাঁদের ঐ গুণ ছিল না তাঁরা সেই যুগের হুজুগের স্রোতে ঝাঁকের কৈ এর মত কোথায় চলে গেছেন।

আঙ্গিক বিচারে নাটকের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক এই দুটি দিক। শিল্পরসোত্তীর্ণ হ'তে হ'লে এই দুটি লক্ষণই নাটকে থাকতে হয়। আভ্যন্তরীণ বিচারে কাহিনী, চরিত্র, ভাবনা, সংলাপ, গান ও দৃশ্য এগুলির কথা বলতে হয়।

আর বাহ্যিক দিকে আসে অভিনেতা ও অভিনেত্রী, দর্শক এবং মঞ্চসজ্জা। "We are, in fact, faced with the usual difficulty that, if there were borrowing, the Indian genius has known how to recast so cleverly and to adopt what it borrowed so effectively that the traces which would definitely establish indebtedness can not be found' [২]

অ্যারিস্টটল নাটকের অভিনয়ের দিকে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু ভরত শ্রব্যত্ব ও দৃশ্যত্ব এই দুই লক্ষণকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। '.প্রেক্ষাগৃহ, অভিনয়, নেপথ্য বিধান, মঞ্চরূপ, প্রযোগ পদ্ধতি, সংগীত ( নৃত্য, গীত, বাদিত্র ) প্রভৃতি নিয়ে পাশাপাশি বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন।' [৩] নাটক লোকবৃত্তের অভিনয়যোগ্য রূপ। 'নাট্যকারের মনে কোন নৈর্ব্যক্তিক ভাবই ( আইডিয়া ) ধীরে ধীরে রূপের মধ্যে অঙ্গ লাভ করুক অথবা কোন ঘটনা বা চরিত্র ধীরে ধীরে ভাবের বা রসের পূর্ণবৃত্তে পরিণত হয়ে উঠুক— প্রত্যেক খানি রচিত নাটক শেষ পর্যন্ত এক একটি ইতিবৃত্ত, যার আত্মা—ভাব বা রস এবং দেহ ঘটনা-পরম্পরা।' [৪]

অ্যারিস্টটলের a single circuit of the sun এবং সংস্কৃত ব্যায়োগের একাহকৃতন্তথা একই। 'Hindu dramatists have little regard for the unities of time and place, and if by unity of action be meant singleness of incident, they exhibit an equal disdain for such a restriction.' [৫] কিন্তু গাতঐক্য নষ্ট হ'লে ঘটনা রিপোর্টের মত হয়। প্রাচ্যের প্রারম্ভ, প্রযত্ন. প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়ৎফল প্রাপ্তি, ফলযোগ—এই পঞ্চসন্ধি পঞ্চপর্বে কল্পিত এবং পঞ্চ অঙ্কে চিত্রিত। পাশ্চাত্তোর Exposition, Growth or Rising Action, Climax or Crisis, Falling Action, Catastrophe—এই পাঁচটিতে ঐ একই চিন্তা। কিন্তু

২। The Sanskrit Drama—A. B. Keith. p 356

৩। অ্যারিস্টটল ও ভরতের নাট্যবিচার—অজিত কুমার ঘোষ।

৪। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য। পৃ ১৮১

৫। Works by the Late Horace Hayman Wilson—Vol. XI Preface

নাটক পঞ্চাঙ্কের পরিবর্তে ষড়ঙ্ক বা অষ্টমাঙ্ক হ'লেও ঐ লক্ষণগুলি থাকতে হয়। আবার নাটক তিন অঙ্কের হ'লে অ্যারিস্টটলের মতে beginning, middle and an end এই তিনটি পর্বে যুক্ত হয়। আবার দু অঙ্কের নাটকে Complication ও Falling Action বা আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক থাকে।

নাটকের কাহিনী পাত্রপাত্রীর ক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হয়। যাঁরা পাশ্চাত্ত্যকে নারীপ্রগতির অগ্রদূত বলেন তাঁরা ▬▬ স্ত্রীচরিত্রকে inferior শ্রেণীতে চিহ্নিত করার বিষয়টি চিন্তা করুন। নায়ক নায়িকার প্রতি সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন- ট্র্যাজেডি, কমেডি অথবা যাই হোক। নাটকে বিদূষক হাস্যরস পরিবেষণ করে। ফার্সে ঐ জন্য বিশেষ বিশেষ চরিত্র সৃষ্টি। কিন্তু প্রহসনের শুদ্ধ রূপে তাপস ও বিপ্র ঐ রস পরিবেষণ করত। পরবর্তীকালে বেশ্যা, ভৃত্য, বিট, ধূর্ত প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর চরিত্র এই উদ্দেশ্যে চিত্রিত। প্রাচীন বাংলা নাটকে মূর্খ ব্রাহ্মণ, ঘটক প্রভৃতির দ্বারা ঐ কার্য সম্পন্ন হয়।

সংস্কৃত এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা দোষের নাম অনুসারে চরিত্রের নাম হ'ত। বাংলা সামাজিক নাটকে বিদ্যাহীন দাম্ভিক, বলহীন ধনাঢ্য, বিশ্বঠক, ধনহীন মহদাশয়, মহালোভ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। পৌরাণিক নাটকের ধর্ম, নিয়তি, বিবেক, পাপ প্রভৃতির প্রভাব সামাজিক নাটকে লক্ষ্য করা যায়। ট্র্যাজেডির চরিত্রগুলি সাধারণতঃ উন্নত এবং বিখ্যাত পরিবারের।

চরিত্রের মাধ্যমে নাটকের সংঘাত এবং গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত। চরিত্রের সংঘাত দৈবশক্তির সহিত, অন্য চরিত্রের সহিত, সমাজের সহিত এবং নিজেরই সহিত। পৌরাণিক নাটকে প্রথম শ্রেণীর এবং অপর তিনটি দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে বেশী লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক নাটকে তৃতীয়টি এবং চতুর্থটি স্মরণীয়। এদের মধ্যে চতুর্থটি যে কোন চরিত্রের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য ও পণপ্রথা, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রে ভাল ট্র্যাজেডি রচনা করা যায়। সামাজিক নাটককে সমস্যামূলক ও চরিত্রমূলক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সামাজিক নাটকগুলির জন্ম তাদের অধিকাংশই প্রথম শ্রেণীর। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা চরিত্রের সাহায্যে ব্যক্ত। সমস্যার

সাহায্যে 'ব্যক্তির সংজ্ঞান—অসংজ্ঞান—নির্জ্ঞানের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার রূপ দেখানো হয়' নাই। চরিত্রগুলি যেন বিশেষ বিশেষ সমাজের বিশেষ লক্ষণের ধারক, বাহক ও পোষক। একে What was ও What to be এই দু ভাগে ভাগ করা যায়।

সামাজিক নাটক domestic এবং social এই দুরকম। গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডিতে 'সুখী পরিবারের পারিবারিক জীবনের শোচনীয় পরিণতি বা বিপর্যয় দেখান মুখ্য উদ্দেশ্য।' শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের লক্ষণ বাংলা নাটকে না পাওয়া গেলেও গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি হিসাবে কীর্তিবিলাস, বিধবাবিবাহ, নীলদর্পণ প্রভৃতি নাটক এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। Social drama গুলি মিলনান্তক ও হ'তে পারে। এমনকি ব্যঙ্গাত্মক এবং কৌতুকাত্মক নাটকে চরিত্র-কল্পনায় মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। আবার ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্যে চরিত্র ও ঘটনার প্রাধান্য থাকে। জামাই বারিক, লীলাবতী, কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রভৃতিতে ঘটনাপ্রধান হওয়ায় মিলনান্তক পরিণতি ঘটেছে। আর বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, কামিনী, কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে প্রভৃতি চরিত্রপ্রধান নাটকগুলিতে হাস্যরসের অন্তরালে যে 'বেদনাকরুণ ভাব' আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

চরিত্রের কথায় সংলাপের কথা বলতে হয়। চরিত্রের বিকাশ, পরিণতি সমস্তই সংলাপ দ্বারা ঘটে। ভাষা ভাবের বাহন। ভাবনা রসনিষ্পত্তির অত্যাবশ্যক উপাদান। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রী চরিত্রে এবং নিম্নশ্রেণীর চরিত্রে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত। নীলদর্পণের ঐতিহাসিকতা ও সামাজিকতা যা থাকুক না কেন—তোরাব, ক্ষেত্রমণি, সাধু, পদীময়রাণী প্রভৃতির সংলাপ বাংলা নাট্য-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাস্তব এবং শিল্পরসোত্তীর্ণ এক কথা নয়। নাট্যকার বাস্তবকে রূপ দিতে গিয়ে অনেক সময় শিল্পের দিকটি অবহেলা করেন। আবার বিপরীত ঘটনা ঘটলে তা নিতান্ত দোষের। নীলদর্পণ নাটকেই সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, নবীনমাধব প্রভৃতির সংলাপে ঘটেছে।

ঘটনার অগ্রগতি, পাত্রপাত্রীর পরিচয়, নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং উৎকণ্ঠা সমস্তই সংলাপের দ্বারা ঘটে। এক কথায় 'the dramatist must do everything in dialogue.' এই সংলাপ পদ্যে না গদ্যে হওয়া উচিত? প্রাচীন কালে বাংলায় সবই পদ্য ছিল ব'লে তাকেই সংলাপে ব্যবহার করা হ'ত। কারও

কারও মতে বিয়োগাত্মক নাটকে সূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশে পদ্য উপযুক্ত। ছন্দ ও অলঙ্কারের যান্ত্রিক নিয়মে নাট্যকার পরিচালিত নন। তবুও বলা যায় আধুনিক কালে সকল দেশেই গদ্য সংলাপের প্রাধান্য। অনেক বাংলা নাটকে যাত্রারীতির মত গদ্যসংলাপের পরই পদ্য সংলাপ। অথবা পদ্য সংলাপের পর গদ্য সংলাপে একই ভাব। এ রকম সংলাপে ঘটনার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

যাত্রা অপেক্ষা প্রাচীন নাটকে গানের প্রাধান্য কম। আধুনিক কালে নাট্যকার নাটকে সঙ্গীত সংযোগ করলেও প্রযোজক বা পরিচালক সযত্নে তা পরিহার করেন। সঙ্গীত ভাবের সুষ্ঠু বাহন হ'লেও এর একঘেয়েমি রসনিষ্পত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে।

দৃশ্যপট, পোষাক পরিচ্ছদ, আলোকসজ্জা নাটক—অভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রায় এর বৈচিত্র্য নাই। কলকাতায় জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের পূর্বে মঞ্চসজ্জা এ:দশে কোন সমস্যাই ছিল না। সামগ্রিকভাবে অভিনয় ভাল না হ'লেও দর্শকদের কোন টাকা ফী হিসাবে নেওয়া হোত না ব'লে তাদের কিছু করার নাই।

নাটকের সার্থকতা তার অভিনয়ে—একথা স্বীকার করলে এতে অভিনেতা অভিনেত্রীর দায়িত্ব কম নয়। তারা উপযুক্ত হ'লে রসনিষ্পত্তি ঘটে। হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসের পরিবেষণে কমেডি ও ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য। ট্র্যাজেডির ভয় ও করুণার কথা অ্যারিস্টটল বলেছেন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায়—'Now the force of our natural feelings can be switched to intensify the force of our artistic feelings; as the electric current from one power—station can be switched to reinforce the current from another.' [৬] এখানেও 'সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য' এই প্রাচ্য মতের সাদৃশ্য। কিন্তু অ্যারিস্টটল অপেক্ষা শেক্সপীয়র বাংলাদেশের নাট্যকারগণকে বেশী প্রভাবিত করেছিলেন। 'Moreover it is only in the love—tragedies, Romeo and Juliet and Antony and Cleopatra, that the heroine is as

৬। Tragedy—F. L. Lucus P 63.

much the centre of the action as the hero.' [৭] শেক্ষপীয়রের অনুসরণে বাংলা নাটক রচনা করা যায় না। তবে দেশভেদে অদৃষ্টবাদ এবং বাস্তববাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের কামনা বাসনায় পার্থক্য নাই ব'লে এ সব বিষয়ে নাটক দু'দেশেই হ'তে পারে। নীলদর্পণে কৃষক সমাজের ভালভাবে বাঁচবার আকাংক্ষা গভীর হতাশায় পর্যবসিত। বিধবাবিবাহ ও সধবার একাদশী নাটকের সামাজিকতা বিধবা সুলোচনার জৈব কামনার ব্যাঘাতে আত্মহত্যায় ও সধবা কামিনীর বিধবার মত স্বামী—বঞ্চিত জীবনের হাহাকারে প্রতিধ্বনিত। শেক্ষপীয়রের ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য বাংলা নাটকে পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। আবার তাঁর কমেডির বিপুল সম্ভারও বাঙ্গালী তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারল না। ভাঁড়ামি এবং ইতরামির স্রোতে তা কোথায় ভেসে গেল। তবে সমাজধর্মী বা ব্যক্তিগত ফার্স বা প্রহসনে হাস্যরস কম নাই। একথাও স্বীকার্য যে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা আক্রোশ প্রশমনের জন্য অনেক নাটক আজ কালগর্ভে। সমাজ চিরপরিবর্তনশীল ব'লে উনিশ শতকের সমাজে যে বিষয়ে নাটক রচনায় সুখ্যাতি বা অখ্যাতি পাওয়া যেত এখন তার কোনটাই পাওয়া যায় না। অভিনয় তো দূরের কথা—পাঠ্য হিসাবেও কেহ পড়েন না। কারণ যুগের প্রয়োজনে সাহিত্যের সৃষ্টি, স্থিতি, বিকাশ এবং পরিণতি।

রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব এবং নব নাটক রচনায় রংপুরের জমিদার এবং জোড়াসাঁকোর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষিত পুরস্কার প্রাচীন গ্রীসে নাটক রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'Already the system of appointing judges by lot had been established' [৮] হিন্দুমহিলা নাটক রচনা ক'রে বিপিনমোহন সেনগুপ্ত পুরস্কার লাভ করেন। ধনীর পৃষ্ঠপোষকতায় শুধু নাটক রচনা নয় এর অভিনয় ও হ'ত। যাদের ভাগ্যে এ সব ঘটত না তাদের নাটক পাঠ্য হিসাবেই রয়ে যেত। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। নাটক অভিনয়ে তখন প্রতিযোগিতা ছিল না। এখন কিছু কিছু

---

৭। Shakespearean Tragedy—A. C Bradley. P 63

৮। World Drama from Æschylus to Anouith—Nicoll. P 32

নাট্যপ্রতিযোগিতা হয়।

বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটক, যাত্রা এবং পাশ্চাত্ত্য নাটকের মিশ্রণে এক নূতন শিল্প ব'লে একে কোন একটির মানদণ্ডে বিচার করলে চলবে না। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে সামাজিক কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন নান্দী ও সূত্রধার অবতারণা করেছেন। আবার সামগ্রিক বিচারে একে নাটক না ব'লে প্রহসন বলা চলে। কিন্তু প্রহসনে দুটির বেশী অঙ্ক থাকে না। রামনারায়ণ পণ্ডিত হ'য়েও রীতি মেনে চলেন নাই। বাঙালী সাহেব মাইকেল মধুসূদন রীতি অনুযায়ী প্রহসন রচনা করেছেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে গ্রীক ট্র্যাজেডির উপসংহারের মত কবিতা থাকলেও মৃত্যুর বাড়াবাড়িতে নাটকটি সার্থক ট্র্যাজেডি হয় নাই।

আলোচ্য সময়ে সামাজিক বিষয়ে সংলাপের আকারে নাটকের ঢঙে গ্রন্থগুলি রচিত হ'লেও সবগুলি ঠিক নাটকও নয় প্রহসনও নয়। এগুলিতে নক্শা, ব্যঙ্গচিত্র, কুৎসারটনা সমস্তই আছে। স্থূলবিচারে এদের নাটক বলা হয়। সবগুলি শিল্পরসোত্তীর্ণ হয় নাই—শ্রব্য কি দৃশ্য কোন দিকেই নয়। কোন কোন নাটকের একবার ও অভিনয় হয় নাই। কিন্তু সে যুগের সামাজিক চিত্র উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট সহায়তা করায় তৎকালীন সমাজ-আন্দোলনে এদের গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়।

কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতার কৌলীন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে চিন্তা আরম্ভ। ভবানীচরণের কলিকাতা কমলালয়, নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস প্রভৃতিতে নাটকীয় উপাদান থাকলেও এগুলি নাটক নয়। আত্মতত্ত্ব কৌমুদী, জগদীশের হাস্যার্ণব প্রহসনের অনুবাদ, কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক, বিশ্বনাথ ন্যায়রত্নের অনুবাদ প্রবোধ চন্দ্রোদয়, দ্বারিকানাথ রায়ের বিশ্বমঙ্গল নাটক, রামতারক ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞান শকুন্তলার এবং নীলমণি পালের রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ এবং পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রমণী নাটক হয় সংস্কৃতের অনুবাদ না হয় উৎকট আদি রসাত্মক বর্ণনা।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ থেকে ধর্মীয় প্রেরণা এবং প্রহসন ও আদি রসাত্মক বর্ণনা থেকে সমাজ সংস্কার এই দুটি ধারা ইংরেজী নাটকের রীতিতে

মিশে বাংলা নাটকের ধারাকে পুষ্ট করে। আবার এই আদিরস বা অশ্লীলতা, যাত্রা, পাঁচালী, খেউড় প্রভৃতি থেকেও আমদানি হয়েছিল। 'ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা বাস্তবভাবোধ ও ব্যঙ্গ-প্রবৃত্তির উদ্‌বোধন। এই ব্যঙ্গ-প্রেরণা ও সমাজ-জীবনের দুর্বলতা-উদ্‌ঘাটনই প্রথম নাট্যরচনার প্রেরোচক শক্তি। পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাবে বিষাদান্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক-রচনা নাট্য প্রচেষ্টার দ্বিতীয় প্রধান ধারা।' [৯] আবার 'সমাজ বলিতে তখন সমাজের ত্রুটিগুলিই সর্বপ্রথম চোখেরউপর ভাসিয়া উঠিত।'[১০] এই ত্রুটিগুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—দেশজ এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসূত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে--লাম্পট্য ও ব্যভিচার, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, ব্রহ্ম আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ইংরেজীশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি আন্দোলন প্রভৃতি। এ দুটি ধারা কখনও একসঙ্গে কখনও বা পৃথকভাবে বয়ে চলেছে। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রমণী নাটক এই দেশীয় এক সামাজিক আলেখ্য। এর বিষয়বস্তু—

রাজকুমারী রমণী বিবাহযোগ্যা হওয়ায় তার সঙ্গে ভুবনমোহনের বিবাহ হয়। বিবাহের পর কিছুদিন থেকে ভুবনমোহন বাড়ী চলে যায়। ফলে রমণীর বিরহে দিন কাটতে থাকে। এই সময় এক ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে গোপনে তার প্রেম ও মিলন হয়। একদিন দিবানিদ্রাকালে ঐ ব্রাহ্মণপুত্র কাশীনাথের দর্শন পেয়ে বাস ত্যাগ ক'রে কাশীধাম যাত্রা করে। রমণী তাকে পত্র দিয়ে নিয়ে আসে এবং তাদের গোপনমিলন চলতে থাকে। রমণীর অঙ্গে মিলনের চিহ্ন দেখে রাণী তাকে তিরস্কার করেন। রমণীও তখন তার মাকে, বিধাতাকে তিরস্কার ক'রে, নিজের দেহকে, অঙ্গাভরণকে, ঋতুরাজকে ভর্ৎসনা ক'রে কুলকামিনীদের সতর্ক করে।

নাটকটিতে অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্কের নির্দেশ নাই। নির্ঘণ্ট তালিকায় বিষয়-বস্তু নির্দেশিত। গণেশ বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ। নাটকের কেন্দ্রস্থল সম্ভোগ

৯। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—শ্রীবৈদ্যনাথ শীল—গ্রন্থ পরিচয়—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ ২১

১০। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ ৮৫

নগর। রাজার দুই পুত্র ও রমণী নামে এক কন্যা। পুত্র দুটির কোন ভূমিকা নাই। এমন কি রাজা সুরেন্দ্রেরও দর্শন আমরা পাই নাই।

ভুবনমোহনের পিতা ভূধর মিত্র, মিত্রজার ভগ্নী সুবর্ণাসুন্দরী, ঘটক রামমাণিক্য প্রভৃতির সংলাপে বৈচিত্র্য আছে।

শুনহ কামিনী কহে দ্বিজবরে।
বিবাহ হইবে কিন্তু ভোগ হবে না পরে ॥

—বিবাহের পূর্বেই নাট্যকারের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুচিত। ড্রামাটিক আয়রনি হিসাবে এর ব্যবহার আমাদের কাছে পৌরাণিক নাটকের দৈববাণীর মত শোনায়।

বিবাহের পর রমণীর সঙ্গে ভুবনমোহনের বিচ্ছেদের কারণ অনুমান করতে হয়। অথচ নাটকে এ রকম অনুমানের স্থান অনুচিত। ভুবনবিজয়ের সঙ্গে রমণীর রতিক্রিয়ার যে বিস্তৃত বিবরণ পদ্যে পয়ার ছন্দে আছে তা নাটকে না থাকলে ভাল হ'ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা ও সুন্দরের, নবদূতী বিলাসে শ্রীদেব ও অনঙ্গমঞ্জরীর, কামিনীকুমারে নাগর ও নাগরীর রতিক্রিয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য তুলনীয়। কৌলীন্য বিষয়ে ভুবনবিজয় ও রমণীর রসালাপে তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। রতিক্রিয়ায় অঙ্গের দাগ নিয়ে রমণী ভুবনবিজয়, মাতুলানী প্রভৃতির সঙ্গে ছলনা করেছে। কামকলা পারদর্শিনীর ক্ষেত্রে আত্মছলনাও স্বাভাবিক।

বিপ্রনন্দনের দিবানিদ্রায় কাশীনাথের দর্শন—লৌকিক বিষয়ে ধর্মীয় প্রলেপ। বিদ্যাসুন্দর, নবদূতীবিলাস, কামিনীকুমার প্রভৃতিতেও এ রকম ধর্মীয় আবরণে লৌকিক বিষয় বর্ণিত। নাট্যকারের

'দ্বিজ হেরে রমণীর রূপের চটক।
রাখিল গ্রন্থের নাম রমণী নাটক ॥'

এই উক্তি পরিবর্তন ক'রে আমরা বলি—এই গ্রন্থটিতে রমণীর বিষয় প্রধান হওয়ায় এর নাম রমণী নাটক।

নাটকটি 'গৌড়ীয় সাধু সরল বঙ্গভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার অভিনব ছন্দে দিব্য নব্য কাব্য সহিত বিরচিত।' 'শ্রীমহেশচন্দ্র শীল ও বিশ্বম্ভর লাহার অনুমত্যানুসারে।' —লিখিত। লঘুত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার প্রভৃতি ছাড়া

গদ্যও এতে আছে। মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ী ভণিতাও পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব এতে স্পষ্ট। একে নাটক না ব'লে গদ্যে পদ্যে রচিত এক গ্রন্থ বলা যায়।

এই গ্রন্থের 'প্রেম নাটকে আমার সপ্রমাণ আছে তার,
সুধু কিছু তোমা বলে নয়।।'

বর্ণনায় জানা যায় প্রেম নাটক রমণী নাটকের পূর্বে লিখিত। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন রমণী নাটক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং প্রেম নাটক ১২৬০এ (১৮৫৩—৫৪ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত লিখেছেন। [১১]

প্রেম নাটকের বিষয় বস্তু—এক পতিহীনা যুবতী নারীর সঙ্গে এক যুবকের গোপন মিলন ঘটে। ঐ যুবক কিছুদিন আমোদ ক'রে চলে যায়। যুবতী দুঃখে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। তখন এক বিপ্রনন্দনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ফলে তাদের গোপন মিলন এবং রতিক্রিয়া চলে। এরপর নায়িকার সুন্দরী মাসতুতো ভগ্নীকে নায়ক দেখাতে বলে। এতে নায়িকা অসন্তুষ্ট হ'য়ে চ'লে যায়—আর আসেনা। তখন নায়ক নানা ছন্দে খেদ প্রকাশ করে।

নাটকের সংলাপ এতে নাই। পাত্রপাত্রীর পরিচয়ও অলিখিত। 'অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যেরও কোন উল্লেখ নাই। নাটকটির প্রথমে 'অথ গণেশ বন্দনা'য় তুনকছন্দে ধূয়া এবং তারপর সরস্বতী বন্দনায় নাট্যকার

'কহে পঞ্চানন করি যোড়পানি।
মম জিহ্বা যন্ত্রে হও মা যন্ত্রিণী।।'

লিখে ভণিতা শেষ করেছেন। এর পর গদ্যে কাহিনীর প্রকাশে যতিচিহ্ন প্রায় লুপ্ত এবং অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা গেল।

নায়িকার পলায়নের পর নায়কের খেদ প্রকাশে পয়ার, ত্রিপদী চতুষ্পদী, মালিনী, একাবলী, তোটক প্রভৃতি ছন্দের বৈচিত্র্যে কাব্য রচনার ঝোঁক বেশী। রমণীর প্রেমে পড়লে কি দুর্গতি হয় তা চতুর্বিংশতি দিবসের খেদে প্রকাশিত। রচয়িতার মতে গ্রন্থটি নাটক হ'লেও আমরা একে নাটক বলতে পারি না। পতিহীনা ব্রাহ্মণ যুবতীকে নিয়ে প্রকৃত নাটক রচনার উপাদান থাকলেও লেখক তা ব্যবহার করতে পারেন নাই। বিধবাকে অবলম্বন ক'রে

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন। পৃ ২৭

অনেক নাটক রচিত হয়েছে। সেই হিসাবে একে তাদের পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যায়।

এই শ্রেণীর আদিরসাত্মক সমাজ বিষয়ক রচনাকে বাংলা যাত্রার পরিণতি এবং আধুনিক নাটকের পথ প্রদর্শক রূপে গণ্য করা যায়। ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীরা যেমন রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের দিক্‌নির্ণয়ে ধ্রুবতারা সেরকম নাটকে সামাজিকতা ও সুরুচির পরিচয়েও তাঁরা প্রশংসার যোগ্য। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে The persecuted নাটক রচনা করায় উগ্র পাশ্চাত্ত্যমদে মত্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী নাটকে ইংরেজী ভাষায় বাংলার সমাজচিত্রচিত্রণে পথ-প্রদর্শক। আবার সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্য রাজনারায়ণ দত্ত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে "The Chukerbutty Faction or Calcutta Preserved" নামক তিন অঙ্কে সমাপ্ত একটি ইংরাজী প্রহসন প্রকাশিত করেন।' [১২] বলা বাহুল্য যে কৃষ্ণমোহন ও রাজনারায়ণ বাংলা ভাষায় না লিখে যে আক্ষেপের কারণ হয়েছেন ইংরেজীশিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষায় বুড় সালিকের ঘাড়ে রেঁা এবং একেই কি বলে সভ্যতা? রচনা ক'রে তা নিরসন করেছেন।

ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তির মনে পাশ্চাত্ত্য নাটক বিশেষভাবে শেক্ষপীয়রের নাটকের প্রভাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটাল। ফলে বাংলা নাটক মিশ্র বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোনটিতে সংস্কৃত নাটকের, কোনটিতে যাত্রার, কোনটিতে ইংরেজী নাটকের প্রাধান্য দেখা যায়। আবার একই নাটকে তৎকালীন সামাজিক বিষয় কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি অথবা ইংরেজী নাটকের অনুবাদে পাত্র-পাত্রীর বাংলা নাম এবং সংস্কৃত আঙ্গিক দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কারণ 'কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই।' [১৩]

---

১২। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ। পৃ ৬৩

১৩। রবীন্দ্র রচনাবলী—চতুর্দ্দশ খণ্ড। পৃ ১৬৬

# তৃতীয় অধ্যায়

## কৌলীন্য বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

বল্লালসেন কুলীনের নটি লক্ষণ বিচার ক'রে কৌলীন্য মর্যাদা দান করেন। এই নটি হল— 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং ॥'

এভাবে ব্রাহ্মণ কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন এই তিন ভাগ পরবর্তীকালে কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ, গৌণ এবং সপ্তশতী এই পাঁচ ভাগে ভাগ হয়। আরও পরে কুলীনেরা তাঁদের গুণগুলি বজায় রাখতে না পারায় দেবীবর ঘটক তাঁদের দোষ ধ'রে মেলবন্ধন করেন। এই অধঃপতন হ'তেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিপত্তি। মেলবন্ধনের পূর্বে সর্বদ্বারী বিবাহ-প্রথা ছিল। মেলবন্ধনের ফলে বিবাহ সীমিত পরিবারে হওয়ায় অধিক বয়স পর্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিত থাকতে হয়। আবার কুলরক্ষার জন্য কুলীনকে বহুবিবাহও করতে হ'ত। বলা বাহুল্য কুলীন জামাই কিন্তু বহু স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন না। এমন কি শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হ'লে উপযুক্ত কৌলীন্য মর্যাদা না পেলে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস তো দূরের কথা অনেক সময় এমন ব্যবহার করতেন যে তা অবর্ণনীয়।

বিবাহেরবিলম্বে অনেক কুলীন-কন্যা কুমারী অবস্থায় গোপনে ব্যভিচারের ফলে গর্ভপাত, আত্মহত্যা, কুলত্যাগ প্রভৃতি করত। আবার কুলীনের বহুবিবাহের ফলে এক পুরুষ বহু স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করতে পারত না। সেজন্যও কুলীনের অনেক স্ত্রী ব্যভিচারিনী হ'ত। কুলীনদের মধ্যে অসমবিবাহও প্রায় রীতিতে পরিণত হয়। গোপনে ব্যভিচারের ফলে উৎপন্ন সন্তানও কৌলীন্য মর্যাদা পেত। অন্যদিকে সতীদাহ বন্ধ হওয়ার এক কুলীনের মৃত্যুতে বহুবিধবার সৃষ্টিতে সমাজ বিপর্যস্ত।

কায়স্থ সমাজেও কুলীন ও মৌলিক ভেদ আছে। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমে কুলীন কন্যা বিবাহ ক'রে পরে মৌলিক কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলিত থাকলেও মৌলিক কন্যার বিবাহ কুলীন পাত্রের সঙ্গে হ'লে মৌলিককুল উন্নত হ'ত। ব্রাহ্মণ কুলেও স্বকৃতভঙ্গ কুলীন অর্থলোভে বংশজের কন্যা বিবাহ করে। সে রকম কুলীনকায়স্থের জ্যেষ্ঠ পুত্র

কুলীনের কন্যা প্রথম বিবাহ ক'রে আঙ্গুরস করতে মৌলিকের ঘরে অর্থ লোভে বিবাহ করতে পারে।

অনেকে বলবেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদেরই এই সব সমস্যা। হিন্দুর অন্য শ্রেণীর মধ্যে এবং মুসলমান সমাজে এ সমস্যা নাই। সুতরাং এত গৌণ সমস্যা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? আসলে সমস্যাটি গৌণ নয়। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ-শাসিত। তার উপর কায়স্থ রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের মত। কৌলীন্য নিয়ে হিন্দুসমাজের আন্দোলন এখনকার সমাজে বাস ক'রে বুঝা যায় না।

বল্লাল সেন 'আচার বিনয়াদি সদ্‌গুণ বিশিষ্ট মহাত্মাদিগকে কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়া দেশের হিত সাধন করিয়াছিলেন।' [১] পরে বংশানুক্রমিক হওয়ায় কৌলীন্য মর্যাদা স্বরূপ বরপণ প্রথাও প্রচলিত হয়। পুরুষ-শাসিত সমাজে এটাই স্বাভাবিক। 'শাস্ত্রে বরকে অর্থদানে কোন নিষেধ নাই বরং বিধি আছে ......কিন্তু "এত টাকা না হইলে বিবাহ দিব না" এরূপ করিয়া বলপূর্বক অর্থ-গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নাই। বরের নিকট অর্থ লইয়া কন্যা বিক্রয়ও যা, কন্যার পিতামাতার নিকট অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়াও তা।' [২]

এখন কুলকৌলীন্য না থাকলেও বিদ্যা এবং অর্থকৌলীন্য এসেছে। বি. এ. অথবা এম. এ. পাস এবং অন্নসংস্থান আছে এরূপ পাত্রের এখন বিবাহের বাজারে উচ্চমূল্য। কামার, গোয়ালা, তাঁতি, তিলি প্রভৃতি জাতিও এখন নবকৌলীন্য লাভ করেছে। তবে প্রভেদ এই যে 'কুলীন সন্তানদিগের ন্যায় তাঁহারা বহুবিবাহ করেন না; প্রত্যুত পত্নীর ভরণ পোষণ করেন, সুতরাং তাঁহাদের আদর বেশী—আবার তাঁহাদের সংখ্যা কুলীন সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প সুতরাং তাঁহাদের দরও খুব বেশী।' [৩] কিন্তু কৌলীন্যের কুফল দূর করতে 'যদি অক্ষরগুলিকে অস্ত্র করিতে পারিতাম তবে মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া তোমাদের চিরনিদ্রা ভঙ্গ করিতাম কিন্তু কিছুই আমাদের সাধ্য নহে, পদ ধরিয়া ক্রন্দন করি জাগ্রত হও, জগৎ তোমাদিগকে কি বলিতেছে অবহিত হও,......!!!' [৪]

---

১। সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী—সন ১২৭৯, মাঘ—চৈত্র। পৃ ৭৪
২। বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহের দোষগুণ বিচার—অজ্ঞাত। পৃ ৪৬—৪৭
৩। পারিবারিক প্রবন্ধ—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পৃ ১১৩
৪। কুলকালিমা—শ্রীষষ্ঠীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত। পৃ ১১৫

এ দেশের কিছু লোক জেগে থেকেও ঘুমান। অপরদিকে স্বল্পসংখ্যক সমাজ-সচেতন ব্যক্তি সমাজের কুরীতিগুলি দূর করতে প্রহরীর ন্যায় সদাজাগ্রত থাকেন। 'তাঁদের এই সকল প্রচেষ্টা সমাজে যে আন্দোলন ও আলোড়ন সৃষ্টি ক'রলো নাট্যকার তার ভেতরেই খুঁজে পেলেন তাঁর নাটকীয় উপাদান।'[৫] রংপুর, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের চৌধুরী, সিংহ, ঠাকুর প্রভৃতি পরিবার নাট্য রচনায় এবং অভিনয়ে উৎসাহ দান ক'রে সংস্কার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করায় কম শ্রদ্ধাভাজন নন।

১। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব। ১৮৫৪। রামনারায়ণ তর্করত্ন।

'দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ,' সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তৎকালীন কলকাতার হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন 'বঙ্গালীর সমাজ-জীবনের একজন সুনিপুণ পর্যবেক্ষক ছিলেন।'[৬] নিজে ব্রাহ্মণ হ'য়ে ব্রাহ্মণ সমাজের দোষ ত্রুটির দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করায়।

বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রথার ফলে কুলীন কামিনীগণের দুর্দশা সম্বলিত নবীন নাটক কুলীন কুলসর্ব্বস্ব রচনা ক'রে রঙ্গপুরের জমিদারের পুরস্কার লাভ করেন—রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই নাটক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। নাটকটির কাহিনী—কুলীন কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কুলরক্ষার জন্য চার কন্যার বিবাহ যথাসময়ে দিতে পারেন নাই। তিনি অনৃতাচার্য্য ও শুভাচার্য নামে দু ঘটককে পাত্রের সন্ধানে পাঠান। কপট ঘটক অনৃতাচার্য্য এক শ টাকার লোভে এক বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গে কুলপালকের সব কন্যার একদিনে বিবাহ দেয়।

নাট্যকার বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন 'কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গ দেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।' দীর্ঘকৌমার্য, বহুদারান্তর, ব্যভিচার প্রভৃতি কৌলীন্যের কুফল বিবাহবর্ণিক ও অধর্ম্মরুচির সংলাপে বেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। সুলোচনার কথায় কুলীনের বিবাহের

---

৫। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক—নীলিমা ইব্রাহিম। পৃ ১৯
৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ ১২১

অন্যদিক উদ্ঘাটিত। যুবতী কুলীনকন্যার সঙ্গে কুলীন বালকের বিবাহও প্রচলিত ছিল। চন্দ্রমুখী তার স্বামীকে টাকা দিতে না পারায় তার স্বামী খোঁজ খবর রাখে না। যমুনা কুলে কালি দিতে চায়, হেমলতা বিষ খেতে চায়, যশোদা বিবাহের রাতেই পাঁচ ভগিনী-সহ বিধবা হয়। ফুলকুমারীর বিবরণ মর্ম্মস্পর্শী। নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনে কামিনী নামে কুলীন কন্যার দুঃখ দুর্দশা অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কামিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। 'এই বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা তর্করত্ন মহাশয়ের হৃদয়ে এমন গভীর রেখাপাত করে যে, কুলীন-কুল সর্ব্বস্ব নাটক এই অনুভূতিরই ফল। নাটকের ফুলকুমারীতে এই কামিনীর অনেকটা ছায়াপাত হইয়াছে।' [৭] কৌলীন্য প্রথার ফলে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে বিধবা বিবাহ প্রচলন করা উচিত ব'লে ফুলকুমারী মত দেয়।

কৌলীন্যপ্রথার কুলপরিচয়ের জন্য ঘটকের প্রয়োজন। ঘটকেরা পাত্র-পাত্রীর সুখ অপেক্ষা নিজেদের অর্থলাভ বেশী দেখত। কুলীন স্ত্রী অবৈধভাবে গর্ভবতী হ'লে কুলীন স্বামীর অতিরিক্ত অর্থলাভ ঘটত। বল্লাল সেনের নবগুণের আধুনিকীকরণে দ্বিতীয় অঙ্কে শুভাচার্য্য বলেছে—

বলদং লাঙ্গলং যৌলং কর্দমং মইকর্ষণম্
ছ্যাচাং ক্ষেত্রং কোদালঞ্চ নবধা কান্তে লক্ষণম্ ॥

আবার সে 'দাঁড়িয়া প্রস্রাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে,
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।'

প্রভৃতি ব'লে নয়গুণের উল্লেখ করে। দেবীবর যেখানে দোষ সেখানে কৌলীন্য খুঁজে পেয়েছেন। ধর্ম্মশীলও 'কু কার্য্যে যে লীন তাহাকে কুলীন কহে' বলেছে।

অকুলীন সমাজে কন্যাবিক্রয় প্রথা থাকায় কন্যা প্রসবিনী স্ত্রীর আদর এবং পুত্র প্রসবিনীর শাস্তির সীমা থাকত না। গর্ভবতী সেজন্য ধর্ম্মশীলের নিকট আশীর্বাদ চায় যাতে তার কন্যা হয়। কন্যাক্রয় ও কন্যাবিক্রয়ের শাস্ত্রোক্ত কুফল এবং সামাজিক কুফল ধর্ম্মশীল বর্ণনা করেছে। অভব্যচন্দ্রের স্থূল রসিকতায় আমরা হাসির অন্তরালে অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। কুলপালকের অনুরোধে এবং অনৃতাচার্য্যের দ্বিগুণ দক্ষিণার লোভে কুলপালকের

৭। বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃ ১৫

'বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ' সমাধা হয়। 'বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে'—তার এক মনোজ্ঞ চিত্র এই নাটকে আমরা পাই।

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে নান্দ্যন্তে সূত্রধার, নটী প্রভৃতি এই নাটকে পাওয়া যায়। সাধুভাষা ব্যবহারের ফলে ভাষা কৃত্রিম হয়েছে। আলঙ্কারিক ভাষা, সংস্কৃত শ্লোক, পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সংলাপের দোষ ঘটিয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে ভোলার সংলাপ স্বাভাবিক। তৃতীয় অঙ্কে কিশোরী ও ব্রাহ্মণীর, পঞ্চম অঙ্কে শিশু ও সুমতির, ষষ্ঠ অঙ্কে ধর্ম্মশীল ও অভব্যচন্দ্রের সংলাপ হাস্যরসের মাধ্যমে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। তবে হিন্দুসমাজে যেখানে বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ সব কিছুই প্রচলিত সেখানে তৃতীয় অঙ্কে কিশোরীর বে খেতে চাওয়া এবং কার সঙ্গে ব্রাহ্মণীর বিবাহ হয়েছে জানতে চাওয়া অসঙ্গত। স্ত্রীচরিত্রের সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম্মশীল ও অনৃতাচার্য্যের বর প্রসঙ্গের সংলাপে প্রাচীন যাত্রারীতি বা কবি তরজার প্রভাব আছে। ঘটকের অর্থলোভ ও শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা দেখাতে গিয়ে অনৃতাচার্য্যের স্বাভাবিকতা নষ্ট করা হয়েছে। ব্রাহ্মণী ও চার কন্যা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। 'নাট্যকার একথা বিস্মৃত হন নাই যে, বয়সের দিক দিয়া চারি ভগিনীর মধ্যে ব্যবধান আছে এবং বয়স অনুযায়ী মানুষের সুখদুঃখবোধ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।' [৮] বিবাহ উপলক্ষে পুরনারীদের মধ্যে যমুনার চরিত্রে বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। কুলীন কন্যার বেশী বয়সে বিবাহ হয় এবং অন্য মেয়েদের মত তারও দুঃখের বিষয় বুঝাতে নাট্যকার তার ষাট বৎসর বয়সে কুলত্যাগের ইচ্ছা জানিয়েছেন। ভৃত্য ভোলা, লোভী উদর-পরায়ণ, স্বার্থপর শাস্ত্রব্যবসায়ী ধর্ম্মশীল প্রভৃতি সুন্দরভাবে চিত্রিত।
কুলীনদের কুলরক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট হয় অথবা কুলীনদের কুলই সর্ব্বস্ব এই বুঝাতে নাটকটির নামকরণ সার্থক। বহুচরিত্রের ভিন্নমুখী মনোভাবের প্রকাশ এতে ঘটলেও মূল বিষয় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট। কৌলীন্যপ্রথার ত্রুটি সংশোধনের জন্য গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। বিধবাবিবাহ আইন নিয়ে আলোচনা চলছে ব'লেও জানা যায়।

---

৮। বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন—ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। পৃ ৪৮

পুরুষ চরিত্রের নামকরণের প্রভাব শ্যামাচরণ শ্রীমানির বাল্যোদ্বাহ এবং রাধামাধব মিত্রের বিধবামনোরঞ্জন নাটকে পড়েছে। স্ত্রীচরিত্রের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য বেশী লক্ষ্য করা যায় না। তবে রামনারায়ণের রসিকা শ্যামাচরণের চতুরার সঙ্গে তুলনীয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং জগদীশের হাস্যার্ণব প্রহসনের প্রভাবও এতে লক্ষ্য করা যায়। আর স্বয়ং নাট্যকারের পতিব্রতোপাখ্যানের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না।

নাটকটিতে ছটি অঙ্ক আছে। 'কিন্তু একভাগের সহিত অন্যভাগের সংযোজনা নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই।' [৯] সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি থাকলেও এতে 'প্লট বলিতে কিছুই নাই, আছে নিতান্ত ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে কয়েকটি কৌতুকাবহ ব্যঙ্গচিত্র। নায়কনায়িকা বলিয়াও কিছু নাই।' [১০] আঙ্গিক বিচারে একে নাটক না ব'লে প্রহসন বলাই উচিত। 'বিজ্ঞবর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে ষড়ঙ্ক সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য অনুভূত হইতেছে না; বোধ হয় বঙ্গভাষায় রূপকের প্রভেদ রক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তদ্রূপ করিয়া থাকিবেন;...।' [১১] প্রথম অঙ্কে বিষয়ের উপস্থাপনা, দ্বিতীয় অঙ্কে অগ্রগতি, তৃতীয় অঙ্কে চরম অবস্থা, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে অধোগতি এবং ষষ্ঠ অঙ্কে পরিণতি লাভ করেছে। সময় ঐক্য ঠিকমত রক্ষিত না হ'লেও স্থান ও গতিঐক্য অক্ষুণ্ণ। উদ্দেশ্যমূলক রচনা হ'লেও এতে প্রচারধর্মিতা বড় হয় নাই। বিবাহে মিলনান্তিক পরিণতি করতে নাট্যকার চাইলেও এই মিলনের অন্তরালে অশ্রুর সন্ধান করা কষ্টসাধ্য নয়।

১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের দুইজন অভিনেতার উদ্‌যোগে চড়ক ডাঙ্গাস্থ (বর্ত্তমান টেগর ক্যাসল রোড্) রামজয় বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।' মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা হ'তে জানতে পারি "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক এই

---

৯। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ। পৃ ৫৫

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—(২য় খণ্ড) শ্রীসুকুমার সেন। পৃ ৩৭—৩৮

১১। বিবিধার্থ সংগ্রহ—(৩য় পর্ব) পৃ ২৫৭।

বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল।" [১২] প্রথমবার অভিনয় সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্মৃতি কথায় বলেছেন—'The Play came out as a surprise upon the Bengali reading Public.' [১৩] অক্ষয়চন্দ্র সরকার কুলীনকুলসর্বস্বের অভিনয় সম্বন্ধে বলেছেন 'মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল।' [১৪] চুঁচুড়ায় ৺নরোত্তম পালের বাড়ীতে ১৮৫৮ সালের ৩রা জুলাই এই অভিনয় হয়।

পরিশেষে বলা যায় নাটকের শ্লেষোক্তি অনেকক্ষেত্রে বিরক্তি উৎপাদন করেছে এবং সংস্কৃত শ্লোক এবং তার বাংলা অর্থ না দিয়ে শুধু বাংলা দিলে ভাল হ'ত ব'লে রামগতি ন্যায়রত্ন মত প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন, 'যাহা হউক, যখন কুলীনকুলসর্ব্বস্ব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নাটক, তখন্ উহার সহস্র গুরুতর দোষ থাকিলেও মার্জ্জনীয়……।' [১৫]

## ২। কুলীন চরিত্র নাটক। সন ১২৬৭ সাল ২০ শে শ্রাবণ ইং ১৮৬০। শ্রীলোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৌলীন্যপ্রথার এক বীভৎস রূপ শ্রীলোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুলীন চরিত্র নাটক' এ প্রকাশ করেন। এর বিষয়বস্তু এই—মনমোহিনী নামে এক সুন্দরী যুবতীর ফুলের মুখটী কাশীনাথের চব্বিশ বৎসরের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। দরিদ্র জামাতা কিছুদিন পরে বধূর নিকটে এসে টাকা চায়। টাকা দিতে না পারায় তাকে সে উপপতি ক'রে টাকা আনতে বলে। পরে স্বামীর কথামত সে কুলত্যাগ ক'রে কালীঘাটে এক কায়স্থের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বিষয় আশয় পায়। একদিন সে গঙ্গাস্নানে গিয়ে ঘাটের পাশে তার স্বামীকে দেখে ডেকে আনে। পরে জানা যায় ঐ কায়স্থ তার স্বামীরই পুত্র। ঐ কায়স্থ নিজের পাপের বিষয় চিন্তা ক'রে তীর্থ ভ্রমণে যায় এবং বারাণসীতে তার মৃত্যু হয়। আর মনমোহিনী সব বিক্রী ক'রে শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে এসে দুর্গোৎসব ক'রে

১২। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিন বিহারী গুপ্ত—প্রথম পর্যায়। পৃ ৮৫

১৩। ঐ পৃ ৫৪

১৪। অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার—সম্পাদক ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ। পৃ ৩৮

১৫। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃ ২৪৬

ভোজ এবং দক্ষিণা দিয়ে জাত পেয়ে সুখে দিন কাটায়।

কুলীনদের চরিত্র উদ্ঘাটিত ব'লে নাটকটির নাম কুলীন চরিত্র যথার্থ। মধ্যযুগীয় রীতিতে ভণিতা পাওয়া যায়। ভূমিকায় ত্রিপদী ছন্দে গ্রন্থকার তাঁর বাসস্থান উত্তরপাড়ার পশ্চিমে গরলগাছা গ্রাম এবং তিনি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুর বাড়ীতে থেকে তাঁর অনুমতিতে গ্রন্থ রচনা ক'রে প্রকাশ করেন ব'লে জানিয়েছেন। এই অংশে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থকার নাটক লিখতে ব'সে যে কাব্য রচনা করেছেন ভূমিকায় তা প্রকাশিত। ব্রাহ্মণদের দোষ দেখিয়ে নাটক রচনায় রামনারায়ণ তর্করত্নের পথ ইনি অনুসরণ করেছেন।

গদ্যে, পদ্যে এর কাহিনী—সংলাপ ও কিছু কিছু আছে—তাও বেশীর ভাগ ত্রিপদীতে। মনমোহিনীর বিবাহের আয়োজন হতেই

হায়রে বল্লাল সেন কত নিবি মজা।
পরে ঐতনয়া পাইবেন কত সাজা ॥

—এই কথা ড্রামাটিক আয়রণি হ'লেও এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। মনমোহিনীর স্বামী কুলীন ব'লেই তার উক্তি রুচি বিগর্হিত। মনমোহিনী কলকাতায় সদ্‌গোপ ব'লে পরিচয় দিল কেন বুঝা গেল না। আর ব্রাহ্মণ কুলীননন্দন কায়স্থ হ'ল কি করে? যাদের বিবাহ ব্যবসা তারা ব্যভিচার করবে কেন? মনমোহিনীকে পরপুরুষে উপগতা জেনেও তার স্বামী যখন তাকে পুনরায় গ্রহণ করল তখন আর কিছু বলার নাই।

নাটকটিতে পাঁচটি গানের প্রত্যেকটিতেই রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। ভূমিকার শেষে রাগিণী ঝিঝিট তাল তেলেনায় গানটিকে নান্দী বলা যায়। দ্বিতীয় গানটিকে ড্রামাটিক আয়রণি ধরলেও এর পূর্বে পদ্যে যা বলা হয়েছে পরে গানে আরও বলা ঔৎসুক্য নষ্ট করে। তৃতীয় ও চতুর্থগানে কুলীন কন্যাদের দুঃখ প্রকাশে নাটকীয় মূল বিষয়ে আলোক পাত করা হয়েছে। শেষে লেখক ইঙ্গ বঙ্গ ভাষায় রাগিণী ঝিঝিট তাল পোস্তায় গান রচনা ক'রে কুলীন চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন—

'ওয়াটফর ওয়াণ্টরূপী ওরে কুলীন বোমবেটে।
দেয়ার ফোর ইউয়ার ওয়াইফ গোইংআউট কালীঘাটে।'

এইগান শুনতে শুনতে হাসিতে দম ফাটলেও শেষ পর্যন্ত কুলীন কন্যার দুঃখে চোখে জল আসে।

কুলীন কন্যার চরিত্রদোষ বিষয়ে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে পুত্রের (গর্ভজাত নয়) সহিত কোন কুলীনকন্যা উপগতা হয়েছে—এমন কাহিনী পাওয়া যায় না। এদিকে এই নাটকটি অভিনব হ'লেও আমাদের নিকট বীভৎস।

৩। নবরমণী নাটক— (১২৬৮) শ্রী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৌলীন্য ও ব্যভিচার নিয়ে শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নবরমণী নাটক প্রকাশ করেন। এর কাহিনী এরূপ:— উপেন্দ্রনগরের রাজা মহেন্দ্র ও তাঁর পাটরাণী মুঞ্জরিণীর সর্বসুলক্ষণা গুণবতী কন্যা রমণীর সঙ্গে ভূপাল নগরের ভূধর মিত্রের পুত্র ভুবনমোহনের বিবাহ হয়। কিছু দিন পরে ভুবনমোহন স্বদেশে যাওয়ায় রমণী বিজয়ভুবন নামে এক ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত গোপনে মিলিত হয়। তাদের মিলনেও বাধা পড়ে। এক মনোমোহিনী কামিনী আকর্ষণী বিদ্যার প্রভাবে বিজয় ভুবনকে নিয়ে যায়। স্বপ্নদৃষ্ট পদ্ধতিতে রমণী তাকে মেঘ-মালার সাহায্যে উদ্ধার করলে তাদের পুনর্মিলন ঘটে। পরে বিজয়ভুবন নিজ ভবনে গিয়ে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সুখে কালযাপন করে। আর রমণীর বিরহ জ্বালা জুড়াতে ভুবনমোহনকে আনা হয়। রমণী ও ভুবনমোহন পরস্পর বিরহের দিনগুলি স্মরণ করতে করতে মিলনানন্দে আনন্দিত হ'তে থাকে।

নাটকটিতে অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্কের উল্লেখ নাই। নির্ঘণ্ট তালিকায় বিষয়বস্তু নির্দেশিত। গণেশবন্দনা, শিববন্দনা ও গৌরীবন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ। এতে নাগর নাগরীর 'প্রণয়প্রসঙ্গ', 'নানাবিধ ছন্দ', 'প্রসিদ্ধ রাগরাগিণী' প্রভৃতি সংযুক্ত হওয়ায় কাব্য লক্ষাণাক্রান্ত হ'লেও নাটকের লক্ষণ আছে। নাটকটির ঘটনাস্থল উপেন্দ্রনগর ও ভূপাল নগর। রাজা ও রাণী গৌণ চরিত্র। কুলাচার্যগণের পাত্রসন্ধান এবং ভুবনমোহনকে কুলবান, রূপবান, বিদ্বান ব'লে পাত্র স্থির করা সামাজিক রীতির পরিচায়ক। তবে আপাতবিরোধী সংলাপে আমরা বুঝতে পারলাম না— ভূধর মিত্রের অবস্থা কেমন। সুবর্ণা ও ভূধর মিত্রের সংলাপ পূর্ববঙ্গীয় কিন্তু রঙ্গিণী, কামিনী প্রভৃতির সংলাপ পশ্চিমবঙ্গীয়। ভুবনমোহনের বিদ্যার বিচার হ'ল তারপরে বিবাহের দিন ধার্য হ'ল। এ রীতি কুলীনদের

মধ্যে ছিল না। ভুবনমোহন ও রমণীর বিবাহের পর—

চিন্তান্বিত কবিবর ব্যাকুল হৃদয়।
পরপ্রেম স্রোতজলে পাছে কুল যায়॥

—এই সন্দেহ করেছেন। কুলীনদের কুল নষ্ট হয় ব'লেই এই সন্দেহ। ভুবনবিজয়ের সহিত রাজকুমারীর রতিক্রিয়ার বর্ণনার যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তা রতিশাস্ত্রে স্থান পাওয়ার যোগ্য। স্বর্গস্থিতা এক রূপসী কন্যার আকর্ষণী বিদ্যাপ্রভাবে বিজয়ভুবনকে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে আত্মবিস্মৃত করা প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা। সামাজিক নাটকে এই অলৌকিক ঘটনা বিস্তার না করলে ভাল হ'ত। বিজয়ভুবন মাহমুক্ত হ'লেও ঐ মায়াবিনী তাকে হারিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে? বিজয়ভুবনের মেয়েলি ঢঙ কথা বলার জন্য রমণী পূর্বে রসিকতা ক'রে বলেছিল সে 'বোয়ের কাছে' শিখেছে। শেষে সেই রসিকতা বাস্তবে পরিণত। রমণী বিপ্রনন্দনকে মেঘমালার সাহায্যে যে পত্র লিখে তা পয়ারে রচিত এবং তার আদ্যক্ষরগুলি মিলালে 'রমণীর নিবেদন নাথ ইতি' হয়। আবার ভৃত্য মারফত বিজয়ভুবনও যে পয়ারে উত্তর দেয় তার আদ্যক্ষরগুলি নিলে 'প্রিয়জনে বিজয় ভুবনের সমাবেদনমিতি' হয় নাট্যকারের রচনাশৈলী প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থটির নায়িকা রমণী এবং তার নব নব ভাব এতে পরিস্ফুট; সেজন্য এর নাম নবরমণী নাটক। উৎকৃষ্ট গীতাবলি ব'লেও গ্রন্থাকার জানিয়েছেন। এতে লঘুত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার, লঘুচৌপদী ছন্দ ছাড়া গদ্যও আছে। তবে ভালবাসা, কুলমজান প্রভৃতি ছন্দের নাম পূর্বে জানা নাই। আবার বিভিন্ন স্থানে রাগিণী ও তালের উল্লেখ প্রাচীন যাত্রা রীতির। ভণিতাও এতে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটির অনেক স্থানে ড্রামাটিক আয়রণি ব্যবহার করা হয়েছে। রমণী ও ব্রাহ্মণ পুত্রের গোপন মিলনে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব আছে। গ্রন্থকর্তা অংশু হীরা মালিনী অপেক্ষা মেঘমালার প্রশংসা করেছেন। রমণী যখন আপন কলেবর ও অঙ্গাভরণকে ভর্ৎসনা ক'রে রূপের পরিচয় দেয় তখন লেখা আছে—

দ্বিজ কহে রাজবালা, পিরীতে কত জ্বালা,
যার জ্বালা সেই সে জানায়।
প্রেম নাটকেতে তার, আছে অতি সুবিস্তার,
সুধু কিছু তোমা বলে নয়॥

কিন্তু প্রেম নাটক আত্যন্তিক দোষ-দুষ্ট। প্রেম নাটক অপেক্ষা কাহিনীর দিকে, চরিত্রচিত্রণে, রমণী নাটকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশী। এমনকি ভাষা পর্যন্ত অনেক স্থলে একই। * রমণী নাটকে—

সন্তোষ নগরে ধাম, সুরেন্দ্র রাজার নাম,
গুণধাম রাজা রাম প্রায়।

নবরমণী নাটকে—উপেন্দ্র নগরে ধাম, মহেন্দ্র বিখ্যাত নাম
গুণধাম রাজা রাম প্রায়।

রমণীতে রঙ্গিণীর উক্তি—'এমন বিয়ায় কায নাই, রাজার ঝি হলো তো কি বয়ে গেলো শুনেছি সে দেশে যেতে ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর, নয় এক গরিবের মেয়ে নিকটে দেখে বিয়া দিব;—' আর নবরমণীর উক্তি 'এমন বে কায নাই। রাজার ঝী হল তো কি বয়ে গেল, শুনেছি সে দেশে যেতে জলে কুমীর ডেঙ্গায় বাঘ, নয় একটী গরিবের মেয়ে নিকটে দেখে বিয়া দিব।' ভূধর মিত্র ও সুবর্ণার কথোপকথন দুই গ্রন্থে একই।

নবরমণী নাটকের নির্ঘণ্টে 'অথ' এই শব্দ যুক্ত। রমণী নাটকে এই শব্দ নাই। রমণী ও ভুবনমোহনের বিবাহে বরপণ ধার্য রমণী নাটকে আছে কিন্তু নবরমণী নাটকে ঐরূপ কোন ইঙ্গিত নাই। রমণীতে বিপ্রনন্দন কুলের সম্মান নিয়ে রসিকতা করে কিন্তু নবরমণীতে ঐরকম কোন রসিকতা নাই। অলৌকিক ব্যাপার রমণী নাটকে নাই। নবরমণী নাটকে রমণী ও বিপ্রনন্দনের শেষ বিচ্ছেদ অবিশ্বাস্য। তাদের পরকীয়া প্রেম হ'তে স্বকীয়ায় রূপান্তর একদিকে সুরুচি ও সুনীতির পরিচায়ক ও মিলনান্তক হ'লেও সমালোচনার মুখ বন্ধ করা যাবে না। লেখক বিপ্রনন্দন ও রমণীকে কিছু প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিতে পারতেন; তারা শুদ্ধ হয়ে যেত।

৪। জামাই বারিক। ১৮৭২। দীনবন্ধু মিত্র।

রামনারায়ণ তর্করত্ন হ'তে সমাজ সচেতনতা নাট্যসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে। দীনবন্ধু মিত্রের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির সংমিশ্রণে তাঁর নাটক ও প্রহসন উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। 'নাট্যকারের পক্ষে যে বস্তুনিষ্ঠ

---

* দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

অপক্ষপাতী, সমাজ সচেতন ও মানবচরিত্র-অভিজ্ঞ-দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়' [১৬] —দীনবন্ধু মিত্রের তা ছিল ব'লে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার।

বিত্তকৌলীন্য হ'তে যে বহুবিবাহ তাতে সপত্নীসমস্যা আছে। কুলকৌলীন্যে এটা অনুপস্থিত। কৌলীন্য, ঘরজামাই এবং একাধিক বিবাহের বিষয়ে সরস ব্যঙ্গচিত্র দীনবন্ধু মিত্রের জামাই বারিক। জমিদার বিজয়বল্লভের কন্যা কামিনীকে অভয়কুমার বিবাহ ক'রে জামাই বারিকে থাকে। কামিনীর সঙ্গে তার মিল হয় না। একবার সে কামিনীর ব্যবহারে মর্মাহত হ'য়ে নিজের বাড়ী চ'লে যায়—লোক পাঠিয়ে তাকে আনতে হয়। কিন্তু কামিনী তাকে লাথি মারতে চায় ব'লে সে শ্বশুর বাড়ী হ'তে চ'লে গিয়ে মনের দুঃখে প্রতিবেশী পদ্মলোচনের সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়ে হাজির হয়। পদ্মলোচন তার দুই স্ত্রীর ঝগড়াঝাটিতে অতিষ্ঠ হ'য়ে মার খেয়ে মনের দুঃখে অভয়ের সঙ্গী হয়। কামিনী নিজের ভুল বুঝে ভবি ময়রাণী ও তার স্বামীর সাহায্যে বৃন্দাবনে এসে বৈষ্ণবী সাজে। সেখানে বৈষ্ণবীর সঙ্গে অভয়কুমারের কণ্ঠিবদল হয় এবং পরে সমস্ত প্রকাশ পায়। পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী এখন সদ্ভাবে বাস করছে জানা যায়। বিজয়বল্লভ আশ্রমে এলে সকলের দেশে যাওয়ার আয়োজন চলতে থাকে। 'কথিত আছে যে 'জামাই বারিক' কলিকাতার কোনও এক প্রসিদ্ধ পরিবারের ঘর জামাই করার পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত হইয়াছিল।' জামাইদের জন্য ব্যারেক ( বারিক ) অর্থাৎ 'একটা বড় ঘর।' 'সব জামাইরা সেইখানে থাকে: জামাই, ভাইঝি জামাই, ভাগ্নি জামাই, নাত্ জামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।' 'জামাই বারিকে রাতদিন প্রেতকীর্তন' হয়—'কেউ সখী সম্বাদ' গায়, 'কেউ পাঁচালির ছড়া' বলে, 'কেউ গাঁজা' টিপে, 'কেউ গুলি' খায়। 'তিনদিন, চারদিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর' পরে বাড়ীর ভিতর যেতে পায়। দাসীদের মারফত অন্দর হ'তে পাস আসে। অধিকাংশেরই নিজের বাড়ীঘর নাই—অন্ন সংস্থান নাই—পেটে বিদ্যাও নাই। মদ খাওয়া জামাই বারিকে নিষিদ্ধ। মেজ জামাই এই নিষেধ না মানায় তাকে দারোয়ান দিয়ে বের ক'রে দেওয়া হয়েছিল এবং

১৬। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। পৃ ৯১

সেই অপমানে মেজ মেয়ে আত্মহত্যা করে। জামাই বারিকের সমস্ত চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নাট্যকার দেখিয়েছেন। সেজন্য নামকরণ সার্থক। 'জামাইগণের তালিকায় তাঁহার খ্যাতনামা বন্ধু সকলের নাম সন্নিবিষ্ট আছে।[১৭]

অভয়কুমার নায়ক এবং কামিনী নায়িকা। অভয়কুমারের পত্নীপ্রেমের সঙ্গে আত্মাভিমান বেশ সুন্দর। কামিনীর স্বামীপ্রেমে কিছু খাদ মিশ্রিত। তার— নবীন যৌবনধন, কারে করি বিতরণ;

পরিণেতা পোড়া বাঞ্ছারাম।—

খেদোক্তি এর প্রমাণ। নাট্যকার অবশ্য সুকৌশলে পরিণতি দেখিয়েছেন।

উপকাহিনীতে একাধিক বিবাহ বিষয়ে পদ্মলোচন ও তার দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দুবাসিনীর পরিকল্পনা বেশ সরস এবং মনোজ্ঞ। দ্বিতীয়া স্ত্রী বিন্দুবাসিনী প্রথমা বগলাকে 'ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,

আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।' বলে রাগায়। বগলাও কম যায় না। সে

'আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী ফুলের কুঁড়ি মডিপোডানীর ঝি,

বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি।'

ব'লে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বহুবিবাহের দোষ বিষয়ে সমাজচিত্র এত বাস্তব যে দর্শককে আর কিছু দেখাবার প্রয়োজন নাই। কামিনী, ভবি ময়রাণী, পাঁচী প্রভৃতি, গদ্যে ও ছড়ায় রসিকতা করে। মাঝে মাঝে এই রসিকতা নিম্নস্তরের। সংলাপে অনেক সময় চন্দ্রবিন্দু যোগ দেখা যায়।

৩য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে পঞ্চম জামায়ের রামায়ণ বলার সময় একদিকে অলঙ্কার প্রয়োগ অন্যদিকে হাস্যরস পরিবেষিত হয়েছে। নাটকটির তিনটি গানেই রাগ এবং তালের উল্লেখ আছে। তবে দ্বিতীয় জামায়ের গাঁজা টেনে বাউল সুরে তাল একতালায়—

মার দম কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে

না খেয়ে রয়েছে আমার পেট্‌টা ফুলে;

—এই গানটিতে বাউলের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি না থাকলেও প্রথম জামায়ের গানটির মত এটিও জামাই বারিকের জামাইদের অবস্থার পরিচয় দেয়। এই

১৭। দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী। পরিশিষ্ট। পৃ ১৬

প্রসঙ্গে রাগ সিন্ধু কাপি তাল খেমটায় হাবার মায়ের গীত উল্লেখযোগ্য। তার নৃত্যগীত বিরহদগ্ধ জামাইদের বেশ ভাল লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের ও হাসির খোরাক জোগাবে। নাটকটিতে ৪টি অঙ্ক এবং ১০টি গর্ভাঙ্ক আছে। ১ম অঙ্কে ২টি, ২য় অঙ্কে ৩টি, ৩য় অঙ্কে ২টি এবং ৪র্থ অঙ্কে ৩টি গর্ভাঙ্ক আছে। কেশবপুর, বেলডাঙ্গা এবং বৃন্দাবন এই তিনটি ঘটনাস্থল হওয়ায় স্থানঐক্য রক্ষিত হয় নাই।

জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর জামাই বারিকের প্রথম অভিনয় হয়। নাটকটির অভিনয়-উপযোগিতা এর একাধিকবার অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য কারণ। পদ্ম-লোচন ও তার দুই স্ত্রীর কাহিনী এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে এই অংশ নিয়ে 'দুই সতীনের ঝগড়া বা জেনানা যুদ্ধ' নামে গ্রামোফোন রেকর্ড বের হয়েছিল। উক্ত রেকর্ড এম. এল. সাহা প্রসিদ্ধ গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম ও সাইকেল বিক্রেতা ৫/১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হ'তে বের হয়।

# চতুর্থ অধ্যায়

## বহুবিবাহ বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ প্রথা কোন্ সময় হ'তে প্রচলিত তা বলা যায় না। তবে মুসলমান সমাজে নবাবী আমলের হারেমে বহুবেগমের আবির্ভাব হিন্দুসমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বল্লালসেনীয় কৌলীন্যের ফলে মনিকাঞ্চন যোগ দেখা যায়। উনিশ শতকে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে কিশোরীচাঁদ মিত্র, বর্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজপুর, নাটোর, দিঘা প্রভৃতি অঞ্চলের ভূস্বামিগণ বহুবিবাহ নিবারণে আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু কোন শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এই বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয় নাই। দেশ-প্রচলিত হওয়ায় সরকারী হস্তক্ষেপ করা উচিত ব'লে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর উক্ত বিষয়ে প্রথম প্রস্তাবে অভিমত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ এ রকম মনে করেছিলেন— এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় অন্য স্ত্রী গহণ করলে বিবাহকারীকে কর দিতে হবে। এজন্য অনেকে একাধিক বিবাহ করতে সম্মত হবে না। কিন্তু এতে সরকারের আয় বাড়লেও সামাজিক উপকার হবেনা—কারণ ঐ করও পাত্রীপক্ষ থেকে আদায় করা হবে।

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ে হিন্দুসমাজের আন্দোলন এখন অনুমান নির্ভর মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীজাতির প্রতি যে মমত্ব নিয়ে বিধবা-বিবাহ প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই দরদী মনোভাবই তাঁকে বহুবিবাহ বন্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ফল মর্মে মর্মে বুঝেও এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন। হিন্দুসমাজে নারীর অবহেলা, নির্যাতন এবং চারিত্রিক স্খলন তাঁর হৃদয়কে আন্দোলিত করেছিল—তারই ফলে তিনি এই আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি ও অন্যান্যের যে বাদ প্রতিবাদ চলে তাতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে কটূক্তি করেছেন। এই কটূক্তি তাঁর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মনে না ক'রে স্বসমাজের প্রতি বর্ষিত মনে করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও সংস্কারবাদী হিন্দুসমাজের দ্বন্দ্বে রাজশক্তি

চিন্তিত। তাঁদের ধারণা যে বিধবাবিবাহ আইন পাসের ফলে সিপাহীবিদ্রোহ হয়েছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার ফলে যে শান্তি এসেছে তা বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আইন তৈরী করলে আবার কি হবে বলা যায় না। একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরপন্থী এবং অন্যদিকে রক্ষণশীলপন্থীর আবেদন। সরকার ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলে বিদ্যাসাগরপন্থীর প্রকারান্তরে পরাজয় ঘটল। বিদ্যাসাগরপন্থীর অপর এক শাখার ধারণা শিক্ষার ফলে উদার মানসিকতা সৃষ্টি হ'লে বহুবিবাহ স্বাভাবিকভাবেই লোপ পাবে। প্রত্যক্ষভাবে বহুবিবাহ রহিত করণে কোন আইন পাস না হওয়ায় এই সুচিন্তিত মতেরই জয় হ'ল।

এখানে একটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। বহুবিবাহ বলতে আমরা সাধারণতঃ পুরুষের বহুবিবাহই বুঝি। কারণ যে দেশে স্ত্রীজাতির বিধবাবিবাহ প্রচলিত নয় সেই দেশে স্বামী বর্তমানে স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী-গ্রহণ কল্পনাতীত। আদিম যুগে যখন পরিবারভিত্তিক সমাজ গঠন হয় নাই—তখন কেউ কারও স্বামীও ছিলনা কেউ কারও স্ত্রীও ছিল না। এই সামাজিক যথেচ্ছাচারের পরের স্তর বহুবিবাহ। 'তখন একজনের সঙ্গে কেবল একজনের বিবাহ না হইয়া বহুজনের সঙ্গে বিবাহ প্রচলিত হয়। প্রত্যেক স্ত্রীর বহু স্বামী, প্রত্যেক স্বামীর বহু স্ত্রী। যথেচ্ছাচারিতার পরই একাচারী হওয়া অতি কঠিন, তখন বহুবিবাহই সম্ভব ও সঙ্গত;......।' [১] এই বহুবিবাহও পুরুষের। স্ত্রীজাতি তার স্বাভাবিক কারণেই একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে চায় না।

মহাভারতের দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণের সমর্থনে ধর্মীয় আবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগে বিধবাবিবাহ থাকলেও তাকে বহু-বিবাহ বলা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে এক স্ত্রী বর্তমানে আবার বিবাহ করার সমর্থন আছে। 'যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয় তৎসত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন।' [২] স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা, কন্যাপ্রসবিনী ও অপ্রিয়বাদিনী হ'লেও অধিবেদনের ব্যবস্থা

১। বঙ্গদর্শন—ভাদ্র, ১২৮৮। পৃ ১৯৯—২০০

২। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ—পৃ ১৭৩

আছে। তবে যদৃচ্ছাক্রমে সবর্ণে বহুবিবাহ করা অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। যথা— 'দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারা অনুলোমক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।' [৩] বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মোপদেশিনী সভাও প্রতিপন্ন করে। 'দুই দিবস বিবিধ শাস্ত্রীয় ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং বিচার হইয়া একবাক্যতায় অবধারিত হইয়াছে যে শাস্ত্রের স্পৃষ্টাক্ষরে বিহিত কারণ ব্যতীত একাধিক অর্থাৎ বহুবিবাহ ও শুক্রবিক্রয় প্রথা এককালে রহিত হউক।' [৪]

আমরা শাস্ত্র জানি না—বুঝি না—মেনে চলতে পারি না। এক শাস্ত্রে যা বৈধ বলে অন্য শাস্ত্রে তা নিন্দিত। বিশেষতঃ এই বহুবিবাহ যখন দেশাচার তখন শাস্ত্রালোচনায় না গিয়ে যুক্তির দিকে এর বিচার করা দরকার। যদি এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী হয় তবে এক স্ত্রীরও একাধিক স্বামী হ'তে পারে। এক স্ত্রী থাকলেও যদি আবার স্ত্রী গ্রহণ করা যায় তবে স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী একাধিক পতি গ্রহণ করলেও কোন স্বামীর অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ এক পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তবে অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকতে হয়। কুলীনদের বহুবিবাহের ফলে অকুলীনদের অবিবাহিত থাকতে হ'ত। তৃতীয়তঃ স্বামীস্ত্রীর প্রেম অবিচ্ছেদ্য। এতে ভাগাভাগি হ'লে কোন স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। স্বামীর যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি বেশী আকর্ষণে সপত্নীরা ঈর্ষাপরায়ণা হয় এবং সংসারে বিপর্যয় ঘটায়। চতুর্থতঃ বহুবিবাহ হ'তেই গর্ভপাত, কুলত্যাগ, আত্মহত্যা, বেশ্যাসৃষ্টি, বরপণ, কন্যাপণ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক দোষের উৎপত্তি। সুতরাং এই কুরীতি দূর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে 'বহুবিবাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে, অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।' [৫] আশা করা হয়—'That day is not nigh when polygamy shall receive a death blow spontaneously administered by our community.' [৬]

---

৩। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ—পৃ ১৭৪

৪। সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা—১২৭৮ আষাঢ়

৫। বঙ্গদর্শন—১২৮০, আষাঢ়।

৬। Calcutta Review—1873

১। কীর্ত্তিবিলাস। ১৮৫২। যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত রচিত কীর্ত্তিবিলাস নাটকে বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা এবং সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার দুর্ব্যবহারে সাংসারিক বিপর্যয় লিখিত। এর কাহিনীতে আমরা জানি—হেমপুরাধিপতি মহারাজ চন্দ্রকান্ত বৃদ্ধ বয়সে দুই পুত্র কীর্ত্তিবিলাস ও মুরারি বর্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রে বিলাস ব্যসনে দিন কাটান। বিমাতা নলিনীর জন্মদিনে উৎসবের আনন্দে কীর্ত্তিবিলাস দুঃখিত। মুরারি ঐ জন্মদিনের জিনিসে হাত দেওয়ায় বিমাতার প্রহারে দুঃখে কাঁদতে থাকে। নলিনী বৃদ্ধ স্বামীতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে প্রাণনাথের সুমধুর সঙ্গীত শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু ছলনাময়ী মহারাজকে কীর্ত্তিবিলাসের তাঁর প্রতি দুরভিপ্রায়ের কথা ব'লে তাঁকে দিয়ে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। মৃত্যুর পূর্বে মহারাজ কীর্ত্তিবিলাসকে ডেকে নিজের দোষ স্বীকার করেন। কীর্ত্তিবিলাস লম্পট প্রাণনাথকে বধ ক'রে স্ত্রী সৌদামিনীর সঙ্গে মিলিত হ'তে আসে কিন্তু সৌদামিনী তার স্বামীর প্রাণদণ্ড হয়েছে ভেবে আত্মহত্যা করে। কীর্ত্তিবিলাসও তাকে মৃত বুঝে আত্মহত্যা করে।

বাংলা সামাজিক নাটকের শ্রেণীতে আমরা কীর্ত্তিবিলাস নাটককে প্রথম স্থান দিতে পারি। বিত্তকৌলীন্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে বহুবিবাহ বিষয়ে এ নাটক রচিত না হ'লেও অসমবিবাহ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার আচরণ এর বিষয়। নাটকের কাহিনীতে বিজয়বসন্ত উপকথার প্রভাব স্পষ্ট। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে নান্দী, নান্দ্যন্তে সূত্রধার প্রভৃতি ও আছে এবং তার পরে নাটকীয় বিষয় উপস্থাপিত। এতে দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের উল্লেখ না থাকলেও অনুরূপ স্থলে 'অভিনয়' শব্দ ব্যবহৃত। প্রথমাঙ্কে দুটি, দ্বিতীয়াঙ্কে চারটি, তৃতীয়াঙ্কে দুটি, চতুর্থাঙ্কে চারটি এবং পঞ্চমাঙ্কে পাঁচটি অভিনয় আছে। দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয় কারাগারে প্রাণনাথের বিলাপেই শেষ। ঐ অঙ্কের চতুর্থাভিনয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, চতুর্থাঙ্ক তৃতীয়াভিনয় ও তদ্রূপ। পঞ্চমাঙ্কের চতুর্থাভিনয়ে চরিত্রগুলি এসে তাদের সংলাপ ব'লে গেছে। এগুলি অঙ্ক এবং অভিনয় না ক'রে কম করলে ভাল হ'ত। তবে ঘটনার স্থান ঐক্য

এবং কালঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গতিঐক্য হেমলতা, স্বর্ণলেখা, সুলোচনা মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করলেও কান্ত বিরহে তাদের প্রাণনাথের প্রতি আসক্তিতে নাটকীয় মূলভাব সুপরিস্ফুট। স্ত্রৈণ রাজা চন্দ্রকান্তের চরিত্র স্বাভাবিক। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ কীর্ত্তিবিলাস এই নাটকের নায়ক। তারই নামানুসারে নাটকের নাম। কিন্তু তার চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব তেমন দেখা যায় না। প্রথম অঙ্কের প্রথম অভিনয়ে সে মুরারিকে আশ্বাস দিয়েও শেষ পর্যন্ত বিমাতাকে শাস্তি না দিয়েই আত্মহত্যা করেছে। মুরারিকে কেবল প্রথমাভিনয়ে বিমাতার মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে কীর্ত্তিবিলাসের কাছে নালিশ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পর তার কোন কাজ নাই। মেঘনাথ চরিত্রটি বেশ। সে একদিকে মহারাজের মনোরঞ্জনের জন্য ভাঁড়ামি করে; অন্যদিকে পিতা ও বিমাতার দুর্ব্যবহারে ক্ষতবিক্ষত কীর্ত্তিবিলাসকে সান্ত্বনা দেয়। প্রাণনাথ মহারাজের পারিষদ, চর। সে সৌদামিনী, হেমলতা প্রভৃতি আঢ্যলোকের বনিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাকে হত্যা ক'রে কীর্ত্তিবিলাস পোয়েটিক জাস্টিস রক্ষা করেছে। রাজচন্দ্রের চরিত্রটিও মুরারির মত প্রথম অঙ্কের প্রথম অভিনয়ে শেষ। এই চরিত্রটির অনেক সম্ভাবনা নাট্যকার নষ্ট করেছেন। নলিনী ও সৌদামিনী চরিত্র স্বাভাবিক। আর হেমলতা, স্বর্ণলেখা প্রভৃতির মাধ্যমে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কান্ত না পেলে বনিতারা কি করতে পারে নাট্যকার তা দেখিয়েছেন। তবে হেমলতা, স্বর্ণলেখা ও প্রাণনাথের অভিনয়ে যাত্রার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়াঙ্কের প্রথমাভিনয়ে প্রাণনাথের প্রস্থানের পর শুধাংশুবদনীর (সুধাংশু-বদনীর হবে) প্রবেশ এবং তার কাছে হেমলতার ত্রিপদীতে আক্ষেপ প্রকাশ না ক'রে প্রাণনাথের প্রস্থানের পর তার এ আক্ষেপ প্রকাশ করলেও চলত। শুধু শুধু শুধাংশুবদনীর উপস্থিতি না ঘটালেও চলে। এর পর ভাষার কথা। মেঘনাথের ভাঁড়ামির ভাষা এবং বিস্ময় প্রকাশের ভাষা স্বতন্ত্র। নাট্যকারের এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি নাট্যকৌশল। হেমলতা, স্বর্ণলেখা ও সুলোচনা আলঙ্কারিক প্রাচীন যাত্রার ভাষা ব্যবহার করেছে। হেমলতার সঙ্গে প্রাণনাথের মানের পালায় প্রাণনাথের আলঙ্কারিক ভাষা মন্দ লাগে না। তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়াভিনয়ে রাজমহিষী তাঁর দেখা দৃশ্যের বর্ণনায় যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা অস্বাভাবিক। ভাষা সাধু এবং আড়ষ্ট হ'লেও এর দ্বারা নাট্যকার সুকৌশলে

নাটকের মূলভাব ব্যক্ত করেছেন। চতুর্থাঙ্কের প্রথমাভিনয়ে রাজমহিষীর উপস্থিতিতে যে সংলাপ চলে তা রুচিবিগর্হিত। চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়াভিনয়ে (ভুলক্রমে দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয় লেখা আছে) রাজমহিষীর ভাষা কৃত্রিম। গদ্য সংলাপের পরই পয়ারে একই ভাব ব্যক্ত হওয়ায় যাত্রালক্ষণাক্রান্ত। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম অভিনয়ে দাসীর ভয়ঙ্কর সংবাদ জ্ঞাপনের ভাষা পীড়াদায়ক এবং রাজমহিষীর ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশী কৃত্রিম। 'এই ঘোরতর অন্ধকারময় নিশীথে নগরের দক্ষিণ দিক্ হইতে, বিভীষণ প্রচণ্ড প্রকাণ্ডকায় এক বিকৃতাকৃতি পুরুষ, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘোরতর হুহুঙ্কার ধ্বনি করিয়া আসিতেছে।' —এই সংলাপ দাসীর? দাসীরূপী অভিনেতা বা অভিনেত্রী এই সংলাপে হিমসিম খাবে। পঞ্চমাঙ্কের পঞ্চম অভিনয়ে কীর্ত্তিবিলাসের মৃত্যুর পর মেঘনাথের গদ্যে আক্ষেপের পর এই ছিল, এই গেল, এই রূপে সকলে।

সব ভুলে কুতূহলে, ভাষে সুখ কমলে॥

—এই কথায় কার সুখ হ'ল বুঝা গেল না। 'নটের স্ত্রীর লজ্জা এবং বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী সজ্জা উভয়ই উপহাস্য।' এই কথার পর 'নাথ আমার প্রমুখাৎ নাটকানুষ্ঠান শ্রবণে যদি সকলের মনোরঞ্জন হয় তবে আদি নাট্যরস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।' —একথা নটীর হবে। কিন্তু নটীর উল্লেখ না থাকায় এ সংলাপ সূত্রধারের ব'লে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা। চতুর্থাঙ্কের চতুর্থাভিনয়স্থলে দ্বিতীয়াঙ্ক চতুর্থাভিনয় লেখা আছে। কীর্ত্তিবিলাসকে অনেক স্থলে 'মহারাজ' বলা হয়েছে। আবার 'বন্ধু' শব্দকে 'বন্ধো' পাঠ করার অনুরোধ রক্ষা করলে সংলাপ আরও কৃত্রিম হয়।

নাটকটিতে হাস্য, শৃঙ্গার ও করুণরসের অভিব্যক্তি ঘটেছে। কিন্তু প্রাণনাথ ও কীর্ত্তিবিলাসের মৃত্যু আকস্মিক। কীর্ত্তিবিলাসের অপকারে এবং রাজমহিষীর জয়ে নাট্যকার শোকভাব উদ্রেক করতে চান ব'লে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন। জলবায়ু অনুসারে হাস্য ও করুণরসের সমাদর হয় জেনেও তিনি উষ্ণদেশের জন্য করুণ রস পরিবেষণ করেছেন। 'যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃত নাটকের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রথম

বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।' ৭ কীর্তিবিলাস নাটকে সপত্নীর অনুপস্থিতি-তেই নাট্যকাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। সপত্নীর চিত্র আমাদের দেশে খুবই দুঃখদায়ক। শিশুকাল হ'তেই সপত্নীর উপর বিষদৃষ্টি দিতে সপত্নীপুত্রদের নির্যাতন করতে এই দেশে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। 'বঁটি বঁটি বঁটি, সতীনের মাথা কাটি', 'আয়না আয়না আয়না সতীন যেন হয় না' প্রভৃতি ছড়াতে এই সপত্নীবিদ্বেষ প্রকাশিত।

২। সপত্নী নাটক ( ১ম ভাগ ) তারকচন্দ্র চূড়ামণি।

এর বিষয়বস্তু—জয়শঙ্কর পুত্র ভূধরের প্রথমা স্ত্রী সৌদামিনী থাকা সত্ত্বেও তার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে চায়। সূর্য্যকান্ত নামে গণকের সাহায্যে সৌদামিনীর সন্তান হবে না—এ রকম ষড়যন্ত্র চলে। সপত্নীর জ্বালায় মোহিনী নামে এক বধূ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়। কিন্তু তার শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, স্বামী, দেওর প্রভৃতি এসে তাকে রক্ষা করে। ভূধর দ্বিতীয়বার বিবাহ করবে না ব'লে সৌদামিনীকে পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত সে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নাই। শাশুড়ীর কথায় সৌদামিনী গুরুর কাছে মন্ত্র নেয়। গুরুর মন্দ অভিপ্রায় কেউ বিশ্বাস না ক'রে সৌদামিনীরই দোষ দেয়। ফলে সৌদামিনী জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যায় এবং জয়শঙ্কর তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে জল হ'তে তুলে ভবদেবের সাহায্যে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

নাটকটিতে তিনটি অঙ্ক আছে। কোন দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের নির্দেশ নাই। শেষে তৃতীয় অঙ্ক ও প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ লেখা আছে। মনে হয় এ বিষয়ে দ্বিতীয় ভাগ রচনা করার ইচ্ছা লেখকের ছিল। কিন্তু অন্য কোন ভাগ না পাওয়ায় আর কোন ভাগ আদৌ রচিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না। নাটকটির প্রথমাঙ্কে নান্দী: তারপর সূত্রধার 'অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই, তাহাতে নাট্যরস বিরস হয়' এ কথা বলার পর সপত্নীর বিবরণ বিষয়ক পয়ার ব'লে নটীকে আসতে ডাক দেয়। সূত্রধার 'কবিপ্রবর প্রণীত সপত্নী নাটক যাত্রা দেখিতে উৎসুক' এই ব'লে কীর্তন

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। পৃ-৩৬

আরম্ভ করে। সুতরাং সপত্নী নাটক নাম হ'লেও একে যাত্রা বলা হয়েছে। সৌদামিনী, কাদম্বিনী, হরমোহিনীর পদ্যে 'অভিপ্রায়' শিরোনামে আক্ষেপ প্রকাশে, ভূধরের সৌদামিনীর থুতি ধরে হাসতে হাসতে পদ্যে সান্ত্বনা প্রকাশে যাত্রার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মোহিনী ও সৌদামিনীর আত্মহত্যা করতে যাওয়ার পূর্বে দীর্ঘ বক্তৃতা নাটকের গাম্ভীর্য নষ্ট করেছে। মোহিনীর উপকাহিনীতে বৈচিত্র্য পাওয়া গেল না। তবে মোহিনীর স্বামী মোহিনীকে তিরস্কার করলেও সে স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছে। আর সৌদামিনী স্বামীর প্রতি বীত-শ্রদ্ধ হ'য়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

কুলীন সমাজে সপত্নীর জ্বালা জুড়াতে কত নারী যে আত্মহত্যা করত তার হিসাব নাই। অবশ্য মোহিনী ও সৌদামিনীর মৃত্যু ঘটে নাই। আবার অনেক কুলীন কন্যাকে পিতৃকুলেই দিন কাটাতে হ'ত। স্বামীর সাক্ষাৎ তারা খুব কম পেত। সেজন্য তাদের স্বভাব চরিত্র ও ভাল থাকত না এই অধঃপতনে অনেক সময় পিতামাতাও সাহায্য করত। এই নাটকে কাদম্বিনীর মা কাদম্বিনীদের পড়োদাদা'র কাছে উপরে গিয়ে আমোদ করতে বলে। মা হয়ে এ কাজ করার জন্য মা বল্লালকে দোষ দেয়। রমাকান্ত গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা ক'রে যখন বাড়ী এসে উপরে উঠতে যায় তখন কাদম্বিনীর মা তাকে উপরে যেতে নিষেধ করে; কারণ সেখানে পড়োদাদার কাছে মেয়েরা আছে। একথা শুনে সেও বল্লালকে দোষ দেয়। বংশজদের একাধিক স্ত্রীগ্রহণ প্রথমদিকে ছিল না—এ নাটকে তাও ঘটতে দেখি। সৌদামিনীর বাবা এই ভয়ে তাকে বংশজের ঘরে বিবাহ দেয়। কিন্তু ভূধরও দ্বিতীয় বিবাহ করল। বিবাহ ব্যাপারে পাত্রর নিজের নির্বাচনের উপর ছেড়ে না দিলে যে কি কুফল ফলে তা মোহিনী ও সৌদামিনার আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে আমরা জানতে পারি। সামাজিক আচার আচরণের অন্তরালে ব্যভিচার লক্ষ্য করা যায়। রাত্রে জলসৈতে যাওয়ার সময় এবং বাসর ঘরে কুলকামিনীরা অনেক ব্যভিচার চালাত।

ভূধর এই নাটকের নায়ক। তার চরিত্রে নায়কোচিত গাম্ভীর্য নাই।

প্রথম অঙ্কে ভূধর ও সৌদামিনীর সংলাপে ভূধরের সংলাপ কৃত্রিম হ'য়ে পড়েছে। সৌদামিনী এই নাটকের নায়িকা। তার নামকরণে কীর্তি বিলাস নাটকের নায়িকার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সূর্য্যকান্ত গণকের সংলাপে মৃচ্ছকটিকের শকারের প্রভাব পড়েছে। তার শঠতার সীমা নাই। কলেজ হওয়ার চেয়ে 'গ্রামে মদের দোকান, গুলীর আড্ডা, কসবীর ঘর বরং ভাল ছিল' —এই তার অভিমত। ঋতুকে রিপু এবং পুষ্পোৎসবকে দুর্গ্যোচ্ছব ব'লে সে হাস্য রস পরিবেষণ করেছে। তৃতীয় অঙ্কে চঞ্চলা বলে—'ঈস ! কুলীনের ঘরে আবার ভাতারের নাম ধত্ত্যে নেই ? মরুক গো, কি আমার পরকালের ভাতার রে ! মল্যে সাক্ষী-দেবে; সে ব্যে ভুল্যো গেছি যা !' এই তো মানুষের উক্তি। যে স্বামীর সঙ্গে বিবাহের রাত্রের পর আর কোন দিন দেখা হয় নাই তার নাম বলায় পরকালের পাপ হয় এরকম সংস্কার চঞ্চলার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী স্বীকার করবে কেন ? রামী নাপিতানী কুটনী জাতীয়া। দোজ পক্ষের বর তাকে সামলাতে হবে। সে বলে 'আর এমন কিছু আন্তে হবে না; রামী মন্ত্রবে না কত্তে পারে এমন কম্মই নেই, তবুও অন্য অন্য সামিগ্রী গাছ গাছড়া কিছু চাই; আর যা যা চাই আমি আন্‌বো তখন।' স্বল্প পরিসরে কেবল একটি সংলাপই তার চরিত্র বুঝার পক্ষে যথেষ্ট। বিধবাবিবাহ ও চপলাচিত্ত চাপল্য নাটকের নাপিতানী চরিত্রের সঙ্গে এ চরিত্র তুলনীয়। সৌদামিনীর ননদ হরমণি ও শাশুড়ি হরিপ্রিয়ার মত কুমনোভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সমাজে দুর্লভ ছিল না। বিকৃত রুচির ও নিম্ন-লোকের ভাষা তাদের মুখে মুখে। এ বিষয়ে হরমণি হরিপ্রিয়াকে ছাড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষয়ে সৌদামিনীর মনে মনে হিংসা হওয়ার স্বাভাবিকত্বকে অস্বীকার ক'রে হরিপ্রিয়া তাকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় তিরস্কার করে। সৌদামিনীর আত্মহত্যায় সে শয়তানী বুদ্ধি দেখে এবং তার চরিত্র নষ্ট ব'লে ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু যে শাশুড়ি যুবতী বধূকে স্বামিসহবাসে বঞ্চিত করে তার শয়তানির তুলনা কোথায় ? দুঃখের উপর আবার ননদ হরমণির ভাষা শুনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তবুও বলা যায় 'তারকচন্দ্র রামনারায়ণের অনুকরণে নাটক রচনা করলেও তিনি

যে শিল্পসৃষ্টিতে অধিকতর সার্থকতা অর্জন করেছেন একথা অবশ্য স্বীকার্য।' ৮

৩। নবনাটক ( ১৮৬৬ ) রামনারায়ণ তর্করত্ন।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ' নবনাটক ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। উক্ত নাটক রচনা ক'রে গ্রন্থকার জোড়া সাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রথম নাটক কুলকৌলীন্য বিষয়ে হ'লেও নবনাটকে বিত্তকৌলীন্যের উপর দৃষ্টি পড়েছে। এর কাহিনীতে আমরা জানি—জমিদার গবেশবাবু প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী এবং তার দুই পুত্র সুবোধ ও সুশীল থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চান। চিত্ততোষ ও বিধর্মবাগীশ এর পোষকতা করেন এবং সুপণ্ডিত সুধীর বিরুদ্ধাচরণ করেন। গবেশবাবু বৃদ্ধ বয়সে যুবতী চন্দ্রলেখাকে বিবাহ করলে সে তাঁর সব কিছু অধিকার করে। সপত্নীব নির্যাতনে সাবিত্রী জর্জরিত—বিমাতার অত্যাচারে সুবোধ দেশান্তরিত। স্বামীবঞ্চিত জীবনে সুবোধের মৃত্যুসংবাদে সাবিত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। গবেশবাবুও কালকবলিত হন। সুবোধ ফিরে এসে মাতা ও পিতার মৃত্যু সংবাদে মূর্ছিত হয়—সেই মূর্ছাই তার শেষ।

নাটকটিতে ছটি অঙ্ক আছে। প্রথমাঙ্কের পূর্বে সংস্কৃত নাটকের মত নান্দী ও পরে নটী ও সূত্রধারের প্রবেশ। নটী ও সূত্রধারের মাধ্যমে নাট্যকার অভিনেয় নাটক ও তার বিষয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথমাঙ্কে জমিদার গবেশবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ, ( দ্বিতীয়াঙ্কে ঘটনার অগ্রগতির গুরুত্ব নাই ব'লে উল্লেখ নাই ? ) তৃতীয়াঙ্কে গবেশবাবু দ্বিতীয়ার বশীভূত, প্রথমা বহিষ্কৃতা, সন্তান দেশান্তরী, চতুর্থাঙ্কে প্রথমার প্রতি নির্যাতনের চরম অবস্থা, পঞ্চমাঙ্কে তাঁর আত্মহত্যা এবং ষষ্ঠাঙ্কে গবেশবাবু ও সুবোধের মৃত্যু—এইভাবে উপস্থাপনা, অগ্রগতি, চরমঅবস্থা ও পরিণতি দেখান হয়েছে। গর্ভাঙ্ক ও প্রস্তাব ইংরাজী সীন অর্থে আর অভিনেয় স্থান বুঝাতে সংযোগস্থল ব্যবহার করা হয়েছে। 'তাঁহার নাটকের প্রথম ভাগে গবেশ বাবুর দ্বিতীয় বিবাহোপলক্ষক প্রস্তাবটী

৮। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক—নীলিমা ইব্রাহিম। পৃ ৫৮

ব্যর্থ হইয়াছে; তাহার সহিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন সংশ্রব নাই; সুতরাং তাহা গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিলেও দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন হানি ঘটে না। অপর তৃতীয় অঙ্কের মধ্যভাগে প্রস্তাবের বিচ্ছেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাও আমাদিগের উপলব্ধি হয় না। পরন্তু প্রথম প্রস্তাবটী পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট প্রস্তাবে উদ্দেশ্য বিষয়ের অত্যুপযুক্ত বর্ণন হইয়াছে।'[১] নাটকটিকে গ্রন্থকার ট্র্যাজেডি করতে চাইলেও কেন্দ্রীয় প্রধান চরিত্র গবেশবাবুর দোষে এটি প্যাথেটিক। একের পর এক মৃত্যু এনেও করুণ রস পরিবেষণে নাট্যকার ব্যর্থ।

বহুবিবাহের দোষের সঙ্গে সঙ্গে এতে অসম বিবাহের কুফল, স্ত্রী-শিক্ষার সুফল, বিবাহপ্রথায় কন্যার অসুবিধা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, সমাজে পুরুষের অধিক সুযোগলাভ, বহুবিবাহ নিবারণী সভা প্রভৃতি অন্যান্য দিকও প্রকাশিত। এই নাটক রচনার পূর্বে অনেকে এই বিষয়ে নাটক রচনা করলেও সেগুলি নাট্য পদবাচ্য না হওয়ায় তাঁর নাটক সত্যই 'নবনাটক'।

গবেশবাবুর মত জ্ঞানহীন জমিদার, সুধীরের মত শাস্ত্র ও ব্যবহারিক জ্ঞানে জ্ঞানী যুবক, বিধর্মবাগীশের মত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি, চিত্ততোষের মত অবিবাহিত রসিক প্রতিবেশী, সুবোধের মত সুবোধ সন্তান, সাবিত্রীর মত সতীসাধ্বী স্ত্রী, চন্দ্রলেখার মত স্বার্থপরায়ণা দ্বিতীয়া স্ত্রী, রসময়ীর মত রসিকা গোয়ালিনী —এই নাটকে স্থান পেয়েছে। চরিত্রানুগ নাম-করণ রামনারায়ণ তর্করত্নের বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রকলা, চন্দ্রলেখা, চপলা প্রভৃতির মাধ্যমে বহুবিবাহজনিত ব্যভিচার দোষ দেখালে ষোলকলা পূর্ণ হ'ত। চন্দ্রকলার কলঙ্কে ভয় নাই—চন্দ্রলেখা কলঙ্কের কিছু করতে চায় না—স্বামী বশ করতে সে গোয়ালিনীর সাহায্য নিয়েছে। স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর প্রতি আসক্তি সন্দেহ ক'রে স্বামী মনে ক'রে সে চিত্ততোষকে ঝাঁটা-পেটা করেছে। বিষয়টি গোপন রাখবার জন্য গবেশবাবু চিত্ততোষকে দশ টাকা দেন। চিত্ততোষ কাছারিতে এক চোরের বিবরণ বলে। এই চোরের বিষয়ের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের জামাই বারিকের বিষয়ের সাদৃশ্য আছে। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনায় রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীনকুলসর্বস্ব

১। রহস্য সন্দর্ভ—৩য় পর্ব ৩৫ খণ্ড। পৃ-১৭৫

অপেক্ষা নবনাটকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে সাবিত্রী ও সুবোধের সংলাপ চতুর্থাঙ্কের গর্ভাঙ্কে ও ষষ্ঠাঙ্কের দ্বিতীয় প্রস্তাবে দীর্ঘ। সুবোধকে সুধীরের সান্ত্বনা 'বৎস ! কি করিবে বল ? দেখ বহুবিবাহের কুপ্রথার অনুমোদনই মূল, সুহৃদ্বাক্য না শোনাই বৃক্ষ, সতীস্ত্রীর অবমাননাই পুষ্প, সময়ে তারই এই সকল ফল ফললো !!!' এই বাক্যের সামাজিক মূল্য স্বীকার করলেও বৃদ্ধ নারদ—বাক্যের মত একথা শোনায়। নাটকটিতে তিনটি—চতুর্থাঙ্কে চপলার দুটি এবং পঞ্চমাঙ্কে সাবিত্রীর একটি—গান আছে। স্বামী বিরহে তাপিত হ'য়ে রাগিণী বারোয়া, তাল ঠুংরীতে চপলার "মন ধৈর্য্য না ধরে।' গানটি এবং স্বামীর অনেক স্ত্রী থাকায় অভিমানিনী মনের দুঃখে বেহাগ রাগিণীতে ও তাল আড়াতে 'মুখ হেরিব না আর ২।' গান উপযুক্তই হয়েছে। সুবোধের মৃত্যু সংবাদে সাবিত্রী রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল আড়াঠেকায় 'আমার কি দশা হলো।' — এই গান গেয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক'রে সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়ালেন। এই তিনটি গান ছাড়া চন্দ্রকলার, রসবতীর, দন্তাচার্যের ও সাবিত্রীর মাঝে মাঝে গানের আকারে সংলাপ আছে। বিদ্যাসুন্দর ও নিধুবাবুর টপ্পার প্রভাবও এতে লক্ষ্য করা যায়। করুণ রসের পরিবেষণে নাট্যকার ব্যর্থ হ'লেও হাস্যরসের ক্ষেত্রে তিনি সার্থক। প্রথমাঙ্কের গর্ভাঙ্কে বিধর্ম-বাগীশ, গবেশ, চিত্ততোষ প্রভৃতির সংলাপে উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরস এবং তৃতীয়াঙ্কের প্রথম প্রস্তাবে রসময়ী ও কৌতুকের সংলাপে নিম্ন শ্রেণীর হাস্যরস পাওয়া যায়।

'কুলীনকুল সর্বস্বকে একটি সমাজ-চিত্র বা সামাজিক নক্সা বলা হইলেও 'নবনাটক' নাটকের মর্যাদা লাভের অধিকারী।' [১০] জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় নবনাটক বহুবার অভিনীত হয়। 'ছয় মাস রিহার্সাল দেবার পর নাটকখানি মঞ্চস্থ হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি। নাট্যকার স্বয়ং প্রথম অভিনয় রজনীতে উপস্থিত ছিলেন।' [১১] অভিনয়ের বিবরণ এই 'In truth the acting was infinitely better

১০। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য পৃ-১৪৩

১১। শিশির কুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচি। পৃ ২৪

than the writing of the play.' [১২]

৪। বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো (১৮৬৬) দীনবন্ধু মিত্র।

দীনবন্ধু মিত্র গুরুগম্ভীর বিষয় অপেক্ষা লঘু বিষয় রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৃদ্ধের বিবাহ নিয়ে তাঁর 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসন রচনা এর প্রমাণ। কীর্তিবিলাস নাটকে সপত্নীপুত্রদের প্রতি বিমাতার বিরূপ মনোভাব আর এই প্রহসনে সপত্নী কন্যাদের বিমাতার প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তবে বাস্তবিক কোন দ্বিতীয় বিবাহ ঘটে নাই। 'এক সুকল্পিত রহস্য-মধুর ষড়যন্ত্রের উপর ইহা নিহিত।' [১৩] এর কাহিনী —রাজীব মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করতে চায়। তার দুই বিধবা কন্যা রামমণি ও গৌরমণি তারই বাড়ীতে থাকে। আবার বিবাহ করলে তারা তাকে মা বলে স্বীকার করবে না। পাড়ার ছেলেরা রাজীবের কাছে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে। রতা নাপিত কনে, কেশব বড় ঠাকুরঝি, ভুবন কনের বিয়ান, নসিরাম শালাজ সাজে। শেষ দিকে পেঁচোর মাকে কনে সাজানো হয়। রাজীব কনের আসল পরিচয় জানতে পেরে দুঃখিত।

প্রহসনটিতে দুটি অংক এবং প্রত্যেক অংকে তিনটি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী এবং বাগানের আটচালা এই দুটি স্থানে সমস্ত ঘটনা ঘটায় রস—উপলব্ধিতে কোন বাধা নাই। ১ম অংকের ২য় গর্ভাংকে রাজীবের কথা 'আপনি যদি রতা বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আমি তাও গ্রহণ করবো—এই উক্তি ড্রামাটিক আয়রনি রূপে প্রকাশিত। 'দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন, সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলী ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।' [১৪] প্রধান চরিত্র রাজীব দলাদলিতে ওস্তাদ। ভুবনের মামাদের এক বৎসর সে একঘরে করে রেখেছে। ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রী বিয়োগে সে পুনরায় বিবাহ করতে চায়। কিন্তু তার বাড়ীতে

১২। Calcutta Review. 1873.

১৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। পৃ ১০৩

১৪। দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী। (কবিত্ব অংশ) পৃ ১০

'পোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা' করতে সে অরাজী। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েদের সতীত্ব প্রায়ই থাকে না। সেজন্য রাজীব ঘটককে বলে, "ব্রাহ্মণের ঘরে, মহাশয় তো জ্ঞাত আছেন, মেয়ের বয়স দশ বৎসর তখনও গর্ভধারিণীর বিবাহ হয়নি।' সে গরীবদের দান করে না অথচ বিবাহের নামে জমি ছেড়ে দেয়; নগদ টাকাও দিতে সে সম্মত। তাকে বৃদ্ধ বললে সে রাগ করে। তার বিবাহের দিন পলাশীর যুদ্ধ হয়—এই কথা হাস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ। রামমণি ও গৌরমণি তাদের পিতার দ্বিতীয় বিবাহ বিষয়ে চিন্তিত। গৌরমণির দুঃখ এই যে, 'মা বাপ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝতেন তা হ'লে এতদিন বিধবা বিয়ে চলতো।' বিধবা হ'লেই মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নয়—গৌরমণি কত কি আশা করে। তার বিশ্বাস—'যিনি সমরণের পদ্যি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তা হ'লে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।' বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত গৌরমণি তা রামায়ণ হ'তে জানে। কেবল তার পিতা এবং কলকাতার পঞ্চানন পণ্ডিত তা স্বীকার করে না। রাজীব বিধবাবিবাহের বিরোধী ব'লে তার মতে 'বিধবারা বরঞ্চ উপপতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কত্তে পারে না।' গৌরমণির প্রতিবাদ এ বিষয়ে স্মরণীয়—'সতীত্বের মহিমা যে জানে সে সধবাই হক্ আর বিধবাই হক্ প্রাণপণে সতীত্ব রক্ষা করে, আর যে সতীত্বের মহিমা জানে না, সে পতি থাকলেও কুপথে যায়। বাবা ভাবেন কেবল উপপতি নিবারণের জন্যে বিধবা বিয়ের আন্দোলন হচ্যে।' এখানেও সেই স্ত্রী পুরুষের ভেদ। সংলাপে গদ্য ও ছড়া দুইই ব্যবহৃত। কনের বর্ণনায় ঘটক কবিতা ব্যবহার করেছে। রতার বিষঝাড়া মন্ত্র বেশ হাস্যকর। বরের কবিতা রচনা করা গুণ বা যোগ্যতা ব'লে বিবেচিত হ'ত। সেজন্য রাজীব নিজে কবিতা রচনা ক'রে ভাল বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চেষ্টা করে। 'কিন্তু কনকবাবু বিজ্ঞ লোক হইয়াও স্কুলের অল্প বয়স্ক ছেলেগুলিকে অমনতর বেলেল্লাগিরি কাজ করিতে শিক্ষা দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। আর তা ছাড়া, ঐ ছেলেগুলো বাসরঘরে শালীশালাজ প্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক

হইয়াছে।' ১৫

'কলিকাতার চোর বাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পূজার সময় সম্ভবত, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারি ইহার অভিনয় করেন। সুবিখ্যাত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী রাজীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া' রাজীবকে 'সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং মিত্রবাবু প্রহসন রচনে সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হইয়াছেন।' ১৬

৫। হিন্দুমহিলা নাটক—৩০ শে বৈশাখ শকাব্দ ১৭৮৮ (১৮৬৮) বিপিন মোহন সেনগুপ্ত।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পক্ষ হ'তে হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা বিষয়ক শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্য দুশ টাকা পুরস্কার ঘোষণার ফলে হুগলী জেলার সোমড়াবাটী নিবাসী বিপিন মোহন সেনগুপ্ত হিন্দুমহিলা নাটক অর্থাৎ হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা ব্যঞ্জক দৃশ্যকাব্য রচনা ক'রে উক্ত নাট্যশালা কমিটির পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক কৃষ্ণকমল বিদ্যানুধি ভট্টাচার্য এই পরীক্ষক দুজনের ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের অভিমতে এটি উৎকৃষ্ট বিবেচনায় বিপিন মোহন সেনগুপ্ত ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি মুদ্রিত। এর কাহিনী– কৃপারাম রায় নামে কোন প্রৌঢ় গৃহস্থের প্রসন্নকুমার ও বসন্তকুমার নামে দুই পুত্র। প্রসন্নকুমারের প্রথমা স্ত্রী মোহিনীর বর্তমানে শশিমুখীর সঙ্গে তার পুনরায় বিবাহ হয়। বসন্ত কলেজে পড়লেও তার স্ত্রী প্রমদা গৃহে থাকে। সুমতি ও গোলাপী নামে কৃপারামের দুই বিধবা কন্যা পিতৃগৃহে আশ্রিত। শশিমুখী ও গোলাপী পাঁচালী প'ড়ে রঙ্গ রসিকতায় দিন কাটায়। মোহিনী, সুমতি এবং গৃহিণী কমলের এ সব অসহ্য। সাংসারিক অশান্তির জন্য বসন্ত সহজে বাড়ী আসতে চায় না। নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে প্রতিবেশী বংশজ ব্রাহ্মণ তার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা মনোরমার বিবাহে কন্যাপণ আদায় করে। কামিনী নামে এক

১৫। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃ-২৫৬

১৬। রহস্য সন্দর্ভ—৩য় পর্ব্ব ৩৩ খণ্ড। পৃ-১৪৪

কুলীন কন্যা স্বামী নবু বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথেষ্ট কৌলীন্য মর্যাদা দিতে না পারায় স্বামীর পদাঘাতে মর্মাহত হ'য়ে হরমণি নাপিতানীর সাহায্যে কুলত্যাগ ক'রে সোনাগাছিতে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। কামিনীর দৃষ্টান্তে গোলাপীও কুলত্যাগ করতে চায়। প্রসন্নকুমারের শিশুপুত্র অপরিমিত আহারে উদরাময়ে মারা যায়। পুত্রশোকে এবং সপত্নীর কটূক্তিতে মোহিনী গলায় ক্ষুর দেয়। কিন্তু সে প্রাণে বাঁচলেও প্রসন্নকে পুলিশের হাঙ্গামায় প'ড়ে এক শ টাকা ঘুষ দিয়ে বিপদ হতে রক্ষা পেতে হয়। প্রমদা মৃত সন্তান প্রসব করে। গোলাপীর কুলত্যাগের সংবাদে কৃপারাম গলায় দড়ি দেয়, মোহিনী শেষ পর্যন্ত মারা যায়—বসন্ত এসে উপস্থিত হয়। তাকে চিঠিতে পরিবারের সমস্ত ভার দিয়ে প্রসন্ন সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যায়।

কৃপারাম প্রৌঢ় গৃহস্থ। তার দেশাচারের প্রতি আকর্ষণ অধিক। পুত্রবধূ প্রমদার প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষে সূর্যার্ঘ্য দিতে সে ব্যস্ত; মেয়ে পাঁচালী করাতেও তার মত। তার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে দুই কন্যার অকাল বৈধব্য। সে আত্মহত্যা ক'রে সব জ্বালা জুড়িয়েছে। কমল কৃপারামের উপযুক্ত সহধর্মিণী। লেখাপড়া শিখলে স্ত্রীলোক বিধবা হয়—এই তার ধারণা। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তাকে মুখরা ব'লে মনে হয়। প্রসন্নকুমার ও বসন্তকুমারের চরিত্র অস্পষ্ট। প্রসন্নর দ্বিতীয় বিবাহে এবং বসন্তের বাল্যবিবাহে তাদের কুলীন ব'লে মনে হয় কিন্তু তারা বংশজ। বংশজদের স্ত্রীপুত্র থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ অস্বাভাবিক। প্রসন্নর চাকুরি নষ্ট হওয়া ও আকস্মিক। তার উপর তার প্রথমা স্ত্রীর আত্মহত্যায় পুলিসকে একশ টাকা দেওয়ায় এবং কুশোও সহচরীকে তার পুত্রশোকে আত্মহত্যা করার কথা শিক্ষা দেওয়ায় তার চরিত্রে অসঙ্গতি এসেছে। সে ৭ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে স্বগত বলেছে, 'মিথ্যা কহিতে পারিব না, দেখি যদি কৌশলে বলিতে পারি ......।' কিন্তু সে নিজে মিথ্যা বলেছে। তার এ রকম ছলনা কেন? জ্যেষ্ঠের দায়িত্ব কনিষ্ঠের উপর দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া তার স্বার্থপরতা ও পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বসন্তের বিবাহ দেওয়া ভুল হয়েছে। সংসারের আবিলতা হ'তে এখনও সে মুক্ত। কুলীন ব্রাহ্মণ নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র স্বল্প পরিসরে সুপরিস্ফুট। তার

উক্তি 'আপনি জানেন না, কুলীনদের সন্তানাদি কি সব পিতৃজাত হয়? কখনই নয়।' —বেশ উল্লেখযোগ্য। কামিনীর বেশ্যাবৃত্তি, ঐশ্বর্য-লাভ এবং কলকাতায় স্বামীর সঙ্গে মিলনে তাকে অনুরোধ—'তুমি মাসে মাসে আমার কাছে এস, আমি পঁচিশ টাকা করে তোমাকে দেবো; আর তুমি যত সংসার করেছ, তার মধ্যে যারা দুখী, তাদের তোমার বাড়ীতে আনবে বল, আর যারা বড় মানুষের মেয়ে তারা যদি তোমার বাড়ীতে আসতে অস্বীকার করে, তুমি মাসে মাসে তাদের কাছে যাবে বল, ······।' বেশ চিত্তাকর্ষক। নিজে বেশ্যাবৃত্তি ক'রে সপত্নীদের সুখী করানোর জন্য টাকা দিতে চাওয়া অশ্রুতপূর্ব। কামিনী কৌলীন্যের মুখে ঝাঁটা মেরে যে দৃপ্ত নারীত্বের পরিচয় দিয়েছে তা বিরল-দৃষ্টান্ত। শশিমুখী ও কামিনী দুই বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি ক'রে নাট্যকার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। হরমণি কুটনী জাতীয়া স্ত্রী। বিদ্যাসুন্দর হ'তে এর ধারা-বাহিকতা। সে কামিনীকে কুলত্যাগে সাহায্য করেছে—নিস্তারিণীকে স্বামীবশ করার ঔষধ দিতে চেয়েছে। নিজের পাপ সম্বন্ধে তার সচেতনতা ৩য় অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্কে 'পুণ্যের ত ওর নেই, দিনের মধ্যে দশটা মেয়ে বার কচ্চি পাঁচটা গর্ভপাত করাতেছি, হাঁ তবে যদি ঔষধিতে কাজ করে, কিছু পুণ্য সঞ্চয় হতে পারে। আমার পাপের সমুদ্রে পুণ্যের শিশিরে কি হবে?' —লক্ষণীয়। আবার 'পাপপুণ্যি সকলই ভগবানের হাত' ব'লে সে নিজের শঠতা ভগবানের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। তার মত নারীর কাছেও গণক ঠাকুর গরু মরার প্রায়শ্চিত্তের জন্য চার কাহন কড়ি লাগবে ব'লে ব্যবস্থা দিয়ে যখন কিছু আদায় করে তখন আমরা জানতে পারি রাক্ষসের উপর খাক্কস আছে। এ রকম হরমণি ও গণকঠাকুর সমাজে কম নয়।

নাটকটির সাতটি অঙ্কের প্রথম অঙ্কে দুটি, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে চারটি ক'রে এবং সপ্তম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। ঘটনাস্থল কৃপারামের বাড়ী, নটবরের বাড়ী কৃপারামের বাড়ীর সন্নিকটে ব'লে এবং বরুণাবাদ ও কলকাতা যখন সেকালের দাসী সহচরী ট্রেন ধরে একাকী যেতে পারে তখন স্থান ঐক্য অক্ষুণ্ণ। সময় ঐক্যও বজায় আছে। তবে সামাজিক বহুবিষয় এতে স্থান পাওয়ায় গতিঐক্য বিঘ্নিত।

কামিনী ও নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপকাহিনী বেশ উল্লেখযোগ্য। তবে কামিনীর স্বামীর পদাঘাতের কাহিনী হরমণির মুখ দিয়ে না বলিয়ে ঘটনার দ্বারা দেখালে ভাল হ'ত। কৃপারাম ও প্রসন্ন—কে যে কেন্দ্রীয় প্রধান চরিত্র বুঝা যায় না। মৃত্যুর বাড়াবাড়িতে এ নাটক নীলদর্পণের মত ব্যর্থ ট্র্যাজেডি। সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য যারা দায়ী তারা কোথায়? ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে সুমতির বাক্‌চাতুর্যের হাস্যরস উচ্চাঙ্গের হ'লেও ২য় অঙ্কেরই ৩য় গর্ভাঙ্কে বর যখন বিবাহের মন্ত্র বলা নিয়ে লোক হাসাতে থাকে তখন একে ভাঁড়ামি বলতে হয়। কোন বর এ রকম করে না। ৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে এবং ৪র্থ অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে কুশোর সংলাপে পার্থক্য ঘটিয়ে নাট্যকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। প্রথম হ'তে আমাদের মনে হয় সে বালক কিন্তু ৭ম অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে প্রসন্নর চিঠিতে আমরা জানি সে বৃদ্ধ এবং চির-বিশ্বস্ত ভৃত্য। নাটকটির শেষে বসন্তের দীর্ঘ সংলাপ তার কলেজে শোনা বক্তৃতার মত শোনায়; এতে নীলদর্পণের প্রভাব পড়েছে। গদ্যে এবং পদ্যে সংলাপ বা একই ভাব প্রাচীন যাত্রার লক্ষণাক্রান্ত। কালিদাস এবং ওয়াল্টার স্কট এর লেখা উদ্ধৃত ক'রে নাট্যকার তাঁর সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানের পরিচয় দিলেও এ রকম উদ্ধৃতি দুটির সার্থকতা সম্যগ্ উপলব্ধি হ'ল না। নাটকটিতে মোট তিনটি গান আছে। তিনটিতেই সেকালের রুচিবোধের সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বাসরঘরে বরের রাগিণী ভৈরবী ও মধ্যমান তালে গানটি ষাট বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত। বালবিধবা গোলাপী রাগিণী ভৈরবী ও ঠেকা তালে তার বিরহ বেদনা ব্যক্ত করে— 'আমার যে মনোদুখ চিরদিন মনে রহিল।' —এই মনোভাব দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে কুলত্যাগ করে। নিস্তারিণী বসন্তবাহার রাগিণীতে ও আড়াঠেকা তালে তার মনোভাব জানায়। কিন্তু সাত আট বৎসরের মনোরমার সঙ্গে ষাট বৎসরের ষষ্ঠিদাসের বিবাহে উপস্থিত হ'য়ে বিরহ-জ্বালা ভুলে এরকম বিবাহের জন্য সমাজকে ধিক্কার দেওয়া ভাল এবং প্রার্থনা করা উচিত যেন এরকম বিবাহ কারও না হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব এবং নবনাটক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা হ'লেও এদের যেমন দোষ

ত্রুটি আছে তেমনি হিন্দুমহিলা নাটকখানিও দোষ মুক্ত নয়। তবে 'ইহার গল্পাংশ সুন্দর ও সুশ্রাব্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।'[১৭] জোড়াসাঁকো 'নাট্যশালা সমাজ বিগত জীবন হওয়ায় কোথা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তন্নির্ণয়ে সমধিক সময় অতিবাহিত হয়' ব'লে বিজ্ঞাপনে দুঃখ প্রকাশ করলেও গ্রন্থকার 'পরে গুণগণযুক্ত শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষ বিশেষের সবিশেষ প্রয়াসে পারিতোষিকে পরিতুষ্ট হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করা গেল।' —লিখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু নাটকটি কোথাও অভিনীত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

৬। উভয় সঙ্কট ( ১৮৬৯ ) রামনারায়ণ তর্করত্ন।

সপত্নীবিবাদে স্বামীর উভয় সঙ্কট বিষয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের উভয় সঙ্কট প্রহসন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। কীর্তিবিলাসে যার আরম্ভ, বিয়ে পাগলা বুড়োতে যার অগ্রগতি, উভয়সঙ্কটে তারই চরম অবস্থা আর জামাই বারিকে এর পরিণতি। উভয় সঙ্কটের কাহিনী—গতকাল একাদশী ছিল; আজ বড় বৌ কুটনা কেটে জল আনতে যায়। ছোট বৌ বার হ'তে এসে বড়বৌয়ের গিন্নিপনাতে রেগে যায় এবং কুটনাগুলি দূরে ফেলে দেয়। ছোট বৌ তেঁতুল পাড়াবার জন্য বাইরে গেলে বড়বৌ ফিরে এসে ছোট বৌয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে একটি কাঠ দিয়ে স্থালী ভেঙ্গে দেয়। ছোট বৌ এলে উভয়ের পরস্পর দোষারোপ চলতে থাকে। ফলে দুজনেরই অভিমান হয়। কর্তা উপস্থিত হ'লে তারা অনুযোগ করে। শেষে রান্নার দেরি আছে ব'লে কর্তাকে বড় বৌ চিঁড়া এবং ছোট বৌ ছাতু খাওয়াতে চায়। ছোট বৌ ছাতু আনতে যাওয়ার সময় গয়লানীর দেওয়া দুধ ফেলে দেয় এবং সে যখন দই নিয়ে আসছিল তখন বড় বৌয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় দইয়ের পাত্র প'ড়ে যায়। ফলে কর্তার কিছু খাওয়া হ'ল না। কর্তাকে বাতাস করা এবং পা টিপে দেওয়া নিয়ে দুজনে কথা কাটাকাটি চলে। কর্তা বিরক্ত হয়ে বিশ্রাম করতে চাইলে বৌ দুজন নিজের নিজের ঘরে কর্তাকে নিয়ে যেতে চায়। কর্তার তখন উভয় সঙ্কট।

প্রহসনটিতে কেবল একটি অঙ্ক আছে—দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক নাই।

---

১৭। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৮ হিন্দু মহিলা নাটক—মোজাম্মেল হক্‌।

ঘটনাস্থল গৃহ। একাদশীর পরদিন বেলা হওয়ার পর হ'তে দুপুর পর্যন্ত এর সময়। প্রহসনটির গতি বেশ সাবলীল। কর্তা, বড় বৌ, ছোট বৌ এবং গয়লানী—এই চারটি চরিত্র। বড় বৌ এবং ছোট বৌ পরস্পর বিদ্বেষী। বড় বৌ ছোট বৌয়ের চরিত্রে সন্দিগ্ধ। 'পাড়া কত্যে বেরোন বুঝি হয়েছে? তা হবে বৈকি; এদিগে ভেড়াকান্ত বানিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন কিছু তো বলে না।' ছোট বৌও কম যায় না। সে বলে, 'পোড়া যমের অরুচি, উনি আবার গিন্নী, ঐ যে কি একটা শ্লোক আছে না? কতই বা দেখ্‌বো আর ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।' কর্তা নায়ক এবং বৌ দু'জন নায়িকা। গয়লানীর মাধ্যমে গ্রন্থকর্তা সতীন থাকা না থাকার পার্থক্য দেখিয়েছেন। গয়লানীর সতীন না থাকায় সে এর জ্বালা বুঝে না।

বহুবিবাহ ও সপত্নীকলহ বিষয়ক নাটক ও প্রহসনের মধ্যে এর কর্তার উক্তি "ওকি? ওকি? প্রাণ যায় যে! গেলেম যে! অরে তোরা না হয় আমাকে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি করে কেটে ভাগ করে নে।" —বেশ উপভোগ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সভ্য মহাশয়দের সে জিজ্ঞাসা করে যদি তার মত কেউ থাকেন তা হ'লে তিনি এ রকম অবস্থায় কি করেন। তার অনুমান—তাঁরও এ রকম উভয়সঙ্কট। 'নীতিশাস্ত্রবিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। "উভয়সঙ্কট"……প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহ-প্রিয় এবং লম্পটের চৈতন্য হইয়াছে।' [১৮]

৭। প্রণয় পরীক্ষা নাটক (১২৭৬ সালের ভাদ্র মাস) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।
শ্রীমনোমোহন বসু।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাট্যকারগণ নাটকে আঙ্গিক বৈচিত্র্য এনেছেন। মনোমোহন বসু বাংলা নাটকে যাত্রার ত্রুটি দূর ক'রে একে গীতাভিনয়ের পর্যায়ে আনেন। সেজন্য তাঁর নাটকে গানের আধিক্য। প্রণয় পরীক্ষা নাটকে সপত্নীবিদ্বেষ এবং তার পরিণাম প্রদর্শিত। উভয়সঙ্কট প্রহসনে সপত্নীবিদ্বেষের ক্ষতিকারক ঘটনা তেমন কিছু নাই। কিন্তু প্রণয় পরীক্ষা নাটকে ক্ষতিকারক ঘটনা থাকায়

১৮। বঙ্গ দর্শন—(হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় শ্রীরামদাস সেন)।

নির্মল আনন্দরসে আমরা আপ্লুত হ'তে পারি না। এর কাহিনী এই—মানগড় প্রদেশের জমিদার শান্তবাবু প্রথমা স্ত্রী মহামায়া থাকা সত্ত্বেও সন্তান লাভের আশায় সরলাকে বিবাহ করেন। মহামায়া ঔষধ প্রয়োগ ক'রে দেখলে শান্তবাবু সরলাকে বেশী ভালবাসেন। সে প্রতিশোধ নিতে শান্তবাবুকে অপ্রকৃতিস্থ ক'রে গোপনে সরলার সঙ্গে রাত্রিযাপন করায়। শান্তবাবু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে যখন জানলেন সরলা গর্ভবতী তখন তিনি তাকে নষ্ট চরিত্রা ব'লে সন্দেহ করেন। মহামায়া তার দাসী কাজলাকে সরলা সাজিয়ে এবং অন্য এক লোককে সদারং সাজিয়ে তাদের অবৈধ সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়ায় সরলা গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার সময় শান্তবাবুর ভগ্নীপতি নটবর বাবু তাকে উদ্ধার ক'রে মৃত সাজিয়ে ছলনা ক'রে তাদের পুনর্মিলন ঘটায়।

এতে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক প্রস্তাবনা আছে কিন্তু সূত্রধার নাই। নটনটীর মারফতে নাটকের প্রস্তাবনা। বহুবিবাহের তথা সপত্নীকলহের বিষয় এতে রূপায়িত। প্রস্তাবনার পর নাটকটি ঘটনার গতিতে অগ্রসর হয়েছে। ড্রামাটিক রিলিফ দিতে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে হাস্যরস পরিবেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মহামায়ার প্রাণ-ত্যাগে এবং শান্তবাবু ও সরলার পুনর্মিলনে পোয়েটিক জাষ্টিস রক্ষিত। সময় ঐক্য এবং গতি ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও ঘটনাস্থল প্রথম দু অঙ্ক কাশীপুর এবং শেষ তিন অঙ্ক মুঙ্গের হওয়ায় স্থানঐক্য বিঘ্নিত। চরিত্র-গুলির নামকরণ ইঙ্গিতবহ। শান্তবাবু সাধারণত শান্ত; তবে তিনি সরলার প্রতি বেশী আকৃষ্ট। মহামায়ার মায়ার শরীর; সপত্নীবিরোধে এর ব্যতিক্রম। 'মহামায়াকে নাট্যকার ঠিক ঠিক শয়তানী করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন। তাহার মনের দুরভিসন্ধি কেহই টের পায় নাই। যখন সে চরম সর্বনাশ করিতেছে তখনও তাহার ভাষায় কত দরদ। সে সার্থক অভিনয় করিয়া যাইতেছে।'[১৯] সরলা সরল অন্তঃকরণে সমস্তই বিশ্বাস করে—সুশীলার সুচরিত্রের ফলেই আড্ডাবাজ নটবর চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে। কাজলার কাজল-কালো মনের আমরা পরিচয় পেয়েছি। চাঁপা তার চরিত্রের সৌরভ ছড়িয়ে আমাদের মনকে ভরিয়ে

---

১৯। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শীল। পৃ-১৭৮

তুলে। রসিক রসাল বংশীধ্বনি ক'রে চন্দ্রকলাকে তরলমতি তরলায় পরিবর্তিত করেছে। প্রথমা মহামায়ার সন্তান না হওয়ায় শান্তবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। মহামায়া তালুক পেয়ে শ্বশুরের বংশ-রক্ষায় ঐ বিবাহে সম্মতি দেয়। দ্বিতীয়ার প্রতি আসক্তি যে তার স্বামীর বেশী হবে—তা তার বুঝা উচিত। সে প্রণয় পরীক্ষা করতে আত্মছলনা ক'রে সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বহুবিবাহের জটিল পরিস্থিতিতে নাটকটি হাস্য, করুণ ও বীভৎস রসের স্ফুরণে চিত্তাকর্ষক। নটবরের নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস পরিবেষণ গতানুগতিক। ৩য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে চন্দ্রকলা (তরলা) ও রসিকবাবুর গানে পরস্পর প্রেম নিবেদনে 'লিরিকের বাড়াবাড়ি।' উপকাহিনীতে তরলা ও রসিক এবং সুশীলা ও নটবর এক বিবাহের সুখ দেখিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। এই নাটকে বাংলা সাহিত্যের পূর্বের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কিছু পরিচয় আছে। ভারত-চন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের মানের পালা, রামবসুর গানের কথা, ঝুমুর গানের বিষয়, রামনারায়ণ তর্করত্নের পতিব্রতোপাখ্যানের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সতীর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবার বাংলা প্রবাদ বাক্যের বহুল প্রয়োগ এতে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটিতে মোট তেরটি গানের প্রত্যেকটিতে রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। গানগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নটের মঙ্গলাচরণগীতে নাটকের আরম্ভ এবং দ্বিতীয় গানে এক বিবাহ সুখের এবং একাধিক বিবাহ দুঃখের বলা হয়েছে। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে বেদেনীর রাগিণী বেহাগ্ড়া, তাল খেমটায় 'ভাঙা মন যোড়া দিতে কার্ আছে আয় লো ছুটে।' —গানটি মহামায়াকে প্রণয়পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। ৫ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে রাগিণী ললিত, তাল জলদ তেতালার গানে তরলা ও রসিকবাবুর এবং সরলা ও শান্তবাবুর পুনর্মিলনের ইঙ্গিত দেয়। ৫ম অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে তরলা ও রসিকবাবু গানে আনন্দ প্রকাশ করায় আনন্দিত বটে কিন্তু—

'নহে ধন কুল বশে, এ বিবাহ বংশ আশে,
সমভাবে দুনারী রাখিল;

—অংশটি শুনে আমরা আনন্দিত হ'তে পারলাম না। শান্তবাবু সমভাবে দুনারীকে রাখতে পারেন নাই। সরলা গর্ভের সংবাদ জানিয়ে শান্তশীল

বাবুকে যে পত্র দেয় তা সুশীলা জানত। কিন্তু অবৈধ গর্ভের জন্য শান্তবাবু যখন তাকে নির্যাতন করেন তখন সুশীলা আসল বিষয় প্রকাশ করল না কেন? মন্ত্রশক্তির প্রভাব ও দ্রব্যগুণের কারসাজি নাটকটিতে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। নটনটীর সংলাপ দীর্ঘ এবং ভাবময় পদ্যে রচিত। ইন্দ্রিয়-সভার সভাদের মত নেওয়ার সময় এবং মহামায়ার মৃত্যুর পর বিষয় আশয়ের ব্যবস্থার সময় শান্তবাবুর সংলাপও দীর্ঘ হয়েছে। তবু নাট্যকার দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে (চৈত্র ১২৮১ সাল) জানিয়েছেন— 'এবারে ভাষাগত সংশোধন ও শেষের কোনো কোন দীর্ঘ বক্তৃতাকে হ্রস্বকরণ প্রভৃতি যাহা কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নতুবা সংযোগস্থল, চরিত্র ও ঘটনা ইত্যাদি মূল কল্পনার কিছুই রূপান্তর হয় নাই।' প্রণয় পরীক্ষা নাটকটি 'প্রণেতার প্রগাঢ় সুকৌশল সম্পন্না চিন্তাদেবীর সাহায্যে নির্ম্মিত এবং সুসজ্জিত।'[২০] এ মন্তব্য যুক্তিহীন। তবে অন্যান্য নাটকের তুলনায় এর দোষ কম ব'লে বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত। মিত্রপ্রকাশের (আশ্বিন ১২৭৭) মতে 'ইহার ভাষা অতিশয় মার্জ্জিত ও প্রাঞ্জল। অভিনয়ের পক্ষেও এখানির বিশেষ উপযোগিতা আছে।' বহুবিবাহ বিষয়ে রামনারায়ণের নবনাটকের সহিত তুলনায় 'অনেক অংশ উৎকৃষ্ট বোধ হয়।'

সমস্ত বিষয় আলোচনান্তে অভিনয় সম্বন্ধে বলতে হয়। ১৭ই চৈত্র ১২৭৯ সাল চন্দননগরে (ফরাসডাঙ্গা) এর প্রথম অভিনয় হয়। 'অভিনয় ব্যাপারটী সন্তোষজনক হইয়াছে। প্রায় অধিকাংশ অভিনেতার কথোপকথন যথোপযুক্ত। দুই একজনকে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলা যাইতে পারে। কেবল পর্ব্বত, ঐকতান বাদন ও গানের ব্যাপার ভাল হয় নাই। ঐকতান বাদন ভাল না হওনের সম্ভব। যেহেতু কলিকাতা হইতে সুযোগ্য সম্প্রদায় লইয়া যাওয়া বহু ব্যয় ও কষ্টসাধ্য। সঙ্গীতের বিষয়ে অধ্যক্ষগণ যথা যাগ্য মনোযোগী হইলে এ অভিনয় আরো সুন্দর হইত...।'[২১] প্রথমবারের অভিনয়ে ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তবে পাঁচ শতাধিক দর্শকের মধ্যে অনেকগুলি মাতালের চপলতায় অভিনয়-

২০। ভারতরঞ্জন—১০ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬

২১। মধ্যস্থ—১ম ভাগ। পৃ-৮৮৫

কালীন প্রথম দিকে সংলাপ শুনতে পাওয়া যায় না। ফরাসডাঙ্গা সভ্য স্থান হ'য়েও এখানে এরকম অসভ্য ব্যবহারের জন্য দুঃখ আক্ষেপের সঙ্গে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

৮। মাগ সর্ব্বস্ব প্রহসন (১৮৭০) হরিমোহন কর্মকার।

দ্বিতীয় বিবাহের ফলে স্ত্রৈণতা হ'তে বিপর্যয়ের উৎপত্তি নিয়ে হরিমোহন কর্মকারের সম্বৎ ১৯২৭ এ ( খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭০ ) মাগ সর্ব্বস্ব প্রহসন প্রকাশিত। এতে আমরা জানি—রমাকান্ত দত্ত এবং রামেশ্বর তর্করত্ন দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রে অতিরিক্ত স্ত্রৈণ হয়। রামেশ্বর স্ত্রীর প্ররোচনায় ভাই, ভাইপো প্রভৃতিকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেয়। রমাকান্ত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর কথায় মা ও বিধবা ভগ্নী কামিনীকে রাজলক্ষ্মীর মন জুগিয়ে চলতে বলে। তাদের বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে বড় লোকের মেয়ে বিবাহ ক'রে তার মন জোগাতে রমাকান্ত পামর কোম্পানীর বারো হাজার টাকা তহবিল ভেঙ্গেছিল। রাজলক্ষ্মীর হীরার গহনা এবং সাত নরী হারের বায়না মেটাতে সে চার পাঁচ হাজার টাকা কোম্পানীর ক্যাশ ভাঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সতর হাজার টাকা তছরুপের অভিযোগে তাকে পাহারাওলা ধরে নিয়ে যায়।

প্রহসনটিতে তিনটি অঙ্ক আছে। গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের কোন উল্লেখ নাই। বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বার স্ত্রী গ্রহণ ক'রে তাকে সর্ব্বস্ব দিলে পরিণতি কি হয় তা গ্রন্থকার স্বল্প পরিসরে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথমাঙ্কে রমাকান্ত ও রামেশ্বরের সংলাপে এবং প্রতিবেশিনী সৌদামিনী ও কুমুদিনীর কথোপকথনে রমাকান্ত ও রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গ্রহণ, দ্বিতীয় অঙ্কে স্ত্রীর জন্য রমাকান্তের টাকা তছরুপ এবং তৃতীয় অঙ্কে এর জন্য তার শাস্তি পাওয়া—বেশ ভাল লাগে।

রামেশ্বরের মতে স্ত্রীর প্রতি অনাসক্ত ভাব দেখিয়ে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হওয়া অনুচিত। সে বলে, 'আজকাল এমন বাবু ঢের আছে, মোছলমানী, ফিরিঙ্গি ইহুদি বই কথাটি কন্ না; বাড়ীর মেথ্রানী দেখতে ভাল হলে তিনিও পার পান্ না।' রাঁড় নিয়ে আজকাল আহাম্মকরা আমোদ করে ব'লে রমাকান্ত বলে, 'আরে ব্যাটারা, তোরা রাঁড়ের বাড়ীতে লোচ্চাম কর্তে যাস, সমস্ত রাত কাটিয়ে আসিস; বাড়ীতে

তোদের মাগ্‌কে ঠাণ্ডা করে কে? তারাও তো লোচ্চা খুজে বেড়ায়?' তারা দুজনেই স্ত্রৈণতায় দোষী হ'লেও বেশ্যা বা অন্য নারী নিয়ে ব্যভিচার করে না। দ্বিতীয় অঙ্কে পেঁচোর মা যখন রমাকান্তকে তার মা ও ভগিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুযোগ করে তখন সে বলে, 'মাগই তো আপনার, আর মা, বাপের পরিবার বৈতো নয়।' এতে তার পত্নী-প্রেম এবং পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশিত। আত্যন্তিক পত্নীপ্রেমই তাকে শেষ পর্যন্ত আক্ষেপ করিয়েছে—'মাগকে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার এই দশা হলো।' রামেশ্বর ও রমাকান্ত এই দুজনের দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে প্রহসনটি রচিত। মূল কাহিনী রমাকান্তের; উপকাহিনী রামেশ্বরের। তবে রমাকান্তের কাহিনীতে দ্বিতীয় বিবাহ অপেক্ষা বৃদ্ধের যুবতী ভার্যার কুফল দেখান হয়েছে।

প্রথমাঙ্কে কুমুদিনী ও সৌদামিনীর সংলাপে নাট্যরস বেশ জমে উঠে। কুমুদিনীর মত চতুরা স্ত্রীলোক বড়লোকের কথায় সাড়ে ষোল আনা থেকেও 'বড়লোকের কথায় তাদের থাকিয়া কাজ নাই' ব'লে সৌদামিনীকে সাবধান করে। যুবতী দ্বিতায়া স্ত্রী এবং বিধবা ভগ্নীর মধ্যে অনেক সংসারে মিল হয় না। বধূর লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রে অনেক ভগ্নীকে বেঁচে থাকতে হয়। কামিনীকে রাজলক্ষ্মীর 'কেনলা আবাগি সর্ব্বনাশি, বিদ্যাসাগরের কাছে যানা, আবার ভাতার জুটিয়ে দেবে এখন' এ রকম কথা শুনতে হ'ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করলেও সমাজ তা স্বীকার না করায় বিপত্তি ঘটেছে। অনেক বধূ ননদ ও স্বামীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করে। এতে সাংসারিক চরম অশান্তি ঘটে। দ্বিতীয়াঙ্কে যখন রমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে, 'বৌ তুমি বাপের বাড়ী যাবে! তবে আমার উপায় কি হবে?' —তখন রাজলক্ষ্মী উত্তরে জানায়, 'কেন যার অমন রাঁড় বোন বাড়ীতে, তার আবার ভাবনা!' এই ব্যাপারে তিলকে তাল হয়ে যেতে পারত; কিন্তু রমাকান্ত একে রসিকতা মনে ক'রে বলে, 'বৌ, তবে বুঝি তোমার বাপের বাড়িতে তোমার মাগমরা ভাই টাই আছে?' এই রসিকতায় দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী রাজলক্ষ্মী রেগে গেল না—এটা আশ্চর্যের।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন—'প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

যদি কিঞ্চিৎ দোষের সংশোধন হয় তাহাই পরম লাভ।' কিন্তু সামাজিক ত্রুটি নিয়ে এর পূর্বে অনেক নাটক ও প্রহসন লিখিত ও অভিনীত হয়েছে। জোড়াসাঁকো নাট্যমন্দিরের জন্য এই প্রহসন রচিত হ'লেও গ্রন্থকার এর অভিনয়ের আশা করেন নাই। 'এক্ষণে সহৃদয় নাট্যামোদী মহাশয়েরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমোদ প্রকাশ করিলেই সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।'

# পঞ্চম অধ্যায়

## পণ-প্রথা ও অসম-বিবাহ, বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে আট রকম বিবাহের মধ্যে পিশাচ ও রাক্ষস বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব বিবাহ এখন অপ্রচলিত। বাকি ব্রাহ্ম ও আসুর পদ্ধতি। ব্রাহ্ম বিবাহ উৎকৃষ্ট ব'লে স্বীকৃত। কন্যাকে ও কন্যার পিতা, মাতা প্রভৃতিকে ধন দান ক'রে কন্যা বিবাহ করাকে আসুর বিবাহ বলে। 'কন্যাপণ গ্রহণে বিবাহ যদি আসুর বিবাহ হইল, তবে বরপণ গ্রহণে যে বিবাহ, তাহা কোন বিবাহের অন্তর্গত?' [১]

তবে ব্রাহ্ম বিবাহে বরপণের আভাস আছে। এখন ব্রাহ্মণও নাই ব্রাহ্ম বিবাহও নাই। বিশেষতঃ কন্যাপক্ষের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যৌতুক যখন দাবীতে পরিণত তখন সেই বিবাহ প্রকৃত বিবাহ নয়। যদি বরপণ দিতে কন্যার পিতামাতা বা অভিভাবক সর্বস্বান্ত হয় তবে কন্যার মানসিক দুঃখ স্বামীর ঐশ্বর্য প্রশমিত করতে পারবে না। ফলে স্বামীস্ত্রীতে 'গরমিলের' সম্ভাবনা। আবার কন্যাপণ দিয়ে বরের পিতামাতা বা অভিভাবক সর্বহারা হ'লে বিবাহের পরে কন্যার এবং তাদের সন্তানসন্ততির শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বরপণ চললেও কন্যাপণ অবাঞ্ছনীয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অথবা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যেখানে উপার্জনক্ষম সেখানে এই প্রথা চলতে পারে। কিন্তু জোর ক'রে দাবী স্বরূপ অর্থ বা অলঙ্কার আদায়কে যৌতুক বলা যায় না। উচ্চ হিন্দু সমাজে পাত্র বরপণ (যৌতুকাদি) না পেলে হেয় হয়। আবার ততোধিক হেয়, হতে হয় যদি পাত্রপক্ষকে কন্যাপণ দিতে হয়। কন্যাপক্ষ পণ গ্রহণ করলে তারও কম নিন্দা হয় না। নিম্ন হিন্দু সমাজে পাত্র বরপণ পেলে বর এবং কন্যা উভয় পক্ষই সম্মানিত। কন্যাপণেও বর এবং কন্যা উভয় পক্ষেরই কোন অপমান নাই। এখন জাতি কৌলীন্য নাই; যখন ছিল তখন ঐ হিসাবেই পণ নির্ণয় হ'ত।

---

১। বিবাহে পণ গ্রহণ—শ্রীললিত মোহন দাস। পৃ ১৬

কুলীনদের বিপরীত চিত্র আমরা অকুলীনদের ক্ষেত্রে দেখি। কুলীনদের বহুবিবাহ—অবিবাহিতা যুবতী বা বিগতযৌবনা কন্যা—বরপণের বিপরীত অবস্থা অকুলীনদের—বংশজ, শ্রোত্রীয, বৈদিক, মৌলিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিক বয়স্ক পর্যন্ত অবিবাহিত পাত্র, কন্যাপণ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি। কৌলীন্য এবং তার মর্যাদা স্বরূপ বরপণ বিষয়ে কৌলীন্য অধ্যায়ে আলোচিত।

আশ্চর্যের বিষয় শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এগিয়ে এসে সামাজিক কুসংস্কার বা কুরীতি দমনে সে রকম যত্ন করেন না। 'তাঁহারা কেন সকলে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করুন না যে "আমরা আমাদের বিবাহে কন্যাপক্ষকে পীড়ন করিয়া এক কর্পদ্দকও গ্রহণ করিব না।" [২] সে চেষ্টাও হয়। যুবকগণকে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করান হয়েছে- 'আমি ঈশ্বরের সাহায্যে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছি যে আমি ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না এবং কন্যার পিতা কিম্বা আত্মীয়গণের নিকট হইতে পণ বাবদে কোন অর্থ গ্রহণ করিব না।' [৩] বলাই বাহুল্য তাদের প্রতিজ্ঞাপত্র অচিরেই ধূলিতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পণ প্রথার জন্য উপযুক্ত বয়সে পাত্রপাত্রীর বিবাহ হ'ত না। তাদের শিক্ষা, গুণ এবং বয়স না দেখে পণের পরিমাণ কম বা বেশী হ'লেই বিবাহ হয়। ফলে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বা যুবকের বালিকাবধূ লাভ। আবার বিদ্বান, রূপবান, গুণবান পাত্রের সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, বিদ্যাহীনা, ধনীপিতার আদুরীর বিবাহ হয়। অন্যক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা ও দেখা যায়। এই অসম বিবাহের ফলে স্বামীস্ত্রীর মনোমালিন্য, সাংসারিক অশান্তি, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ, বেশ্যাসৃষ্টি প্রভৃতি সমাজে ঘটাত। কন্যাপণে সমাজের অবস্থা বিষয়ে আমরা কয়েকটি নাটক ও প্রহসন পাই।

১। কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে ( ১৮৬৩ )-ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।
কন্যাপণ ও তার কুফল দেখিয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৩

২। সমাজ সংস্কার—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন। পৃ ৮
৩। বিবাহে পণ গ্রহণ—শ্রীললিতমোহন দাস। পৃ ৫২

খ্রীষ্টাব্দে 'কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে' নাটক রচনা করেন। এর কাহিনী—রায় মশায়ের বাড়ীতে ঘটক ঘোষাল শিক্ষিত এবং উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান আনলেও তারা বেশী পণ দিবে না ব'লে রায় মশায়ের অমত। ঘটক বড়াল আটশ টাকা পণে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ আনলে তার মত হয়। রায় গিন্নী এই বিবাহ দিতে না চাওয়ায় সে কোনে নিয়ে চক্রবর্তীদের বাড়ী যায়। শেষে পণের আটশ টাকা তাকে দিলে সে একদিকে কাঁদে এবং অন্যদিকে টাকার পুঁটুলি বাঁধে। তারপর বিবাহ হয়।

বর না আসা পর্যন্ত সূচনা বা প্রস্তাবনা। নাটকটির চরমকাল—যখন বর একটি বালককে বলে, 'কান্না কেন, তুমি বল গে, আমি•• দধী খেতে পারি, মর্ত্তমান রম্ভা খেতে পারি। কান্না কি? আমি তেমন বুড়ো নই।' বালকের এবং বরের কথায় হাসি পায়; কিন্তু অসম বিবাহ, কন্যাপণ বিষয়ে চরিত্রানুগ সংলাপ প্রশংসার যোগ্য। বরের যুক্তি—তার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসার ভয়ে তার বিবাহ করা। কিন্তু কন্যাকর্তার টাকা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। পুত্রকে পিতার বিবাহ দেখতে নাই—এটি সামাজিক প্রথা। তবে পুত্রকে যুবতী বিমাতার বৈধব্য দেখতে—এমনকি আজীবন শত্রু সৃষ্টি করতেও কোন আপত্তি নাই।

চরিত্রের দিকে সবগুলিই যথাযথ। রায় মশায়ের নজর টাকার দিকে। তার অবস্থা ভাল ব'লে কন্যা বড় করতেও আপত্তি নাই। জামাই যদি মরে যায় তা হ'লে পণের টাকা পাবে না ব'লে সে টাকা বাকি রাখতে চায় না। এ রকম অর্থপিশাচ পিতার জন্য কত কন্যা বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে! রায় গিন্নী কন্যার সুখ চাইলেও আটশ টাকা পেয়ে সে এই বিবাহ বন্ধ করল না। বরের চতুর্থ পুত্র মাতাল অবস্থায় কন্যা-কর্তাকে বলেছিল, 'তোমরা এ উপজীবিকা ছেড়ে দাও, পাঠী বেচা আর মেয়ে বেচা সমান পাপ।' মাতাল যা বুঝে স্বাভাবিক মানুষ হ'য়ে রায় মশায় তা বুঝে না—এই দুঃখ। রায় মশায়ের মতে এখনকার ছোকরা গোছের ছেলেরা গুলি গাঁজা ও মদ খায়—সুতরাং ছোকরাকে মেয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে বৃদ্ধ পাত্র বেশী টাকা দিবে না তাকে কি সে কন্যা দিবে? বর এই নাটকের নায়ক। একটি বালক বরের বার্ধক্যের কথা

জানালেও সে অস্বীকার করে। এই যে তার সজ্ঞান আত্মছলনা—এই খানেই ট্রাজেডি। হাস্যরসের অন্তরালে করুণরসের প্রস্রবণ সৃষ্টি গ্রন্থকারের কৃতিত্ব। রায় গিন্নীর চরিত্রে কিছু অসঙ্গতি আছে। পূর্বে তার মুখে শুনেছি—'এ পাটী বেচার টাকা থাকে না, আমার বাপ আমাকে তো ৫০০ টাকা পোণে বেচেছিলেন কিন্তু তিনটী মাস না যেতে যেতেই যে দুঃখ সেই দুঃখ।' শেষে দেখি সে কাঁদছে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধছে। নাটকটির নামকরণ সার্থক। সামাজিক ত্রুটি সংশোধন প্রয়াসে ঠিকমত নাট্যরীতি মেনে না চলায় একে নাটক না ব'লে প্রহসন বলা ভাল। '...কৌতুকের আড়ালে সমাজ-বিধির প্রতি যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লুক্কায়িত আছে এবং সেই বিদ্রূপের হুল কতখানি জ্বালাময় তাহা সহজেই অনুমেয়।' [৪]

২। কন্যাবিক্রয় নাটক ( ১৮৬৪ ) শ্রীনফর চন্দ্র পাল।

কন্যাবিক্রয়ের দোষ দেখিয়ে শ্রীনফর চন্দ্র পাল ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৭০ সালে 'কন্যাবিক্রয় নাটক' প্রকাশ করেন। এর কাহিনীতে আমরা জানি—কর্তাঠাকুর পাঁচশ টাকা পণ নিয়ে এক বৃদ্ধ বরের সঙ্গে মধ্যমা কন্যা মালতীর বিবাহ স্থির করায় গৃহিণী অসন্তুষ্ট। এয়ো ও অন্যান্য রমণী বরকে বরণ না ক'রে চ'লে আসায় বরের মামা ভয় দেখিয়ে কর্তাকে রাজী করিয়ে বিবাহ দেয়। মালতী শ্বশুর বাড়ী হ'তে তার কনিষ্ঠা ভগিনী মোহিনীকে পত্র দিয়ে অর্থলোভী পিতা তাকে রূপগুণ হীন বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় দুঃখের কথা জানায়। মোহিনী তার দিদির দুঃখে কাঁদে এবং নিজের ভাবী পরিণামে চিন্তিত হয়।

অসমবিবাহ ও কন্যাপণ বিষয়ে জলধরের, 'শিরোমণি মহাশয় যে বারে তৃতীয় পক্ষ বিবাহ করেন তাতে কি বিপদ না ঘটেছিল; ছাঁল্লাতলায় শাশুড়ী মাগী চীৎকার ধ্বনি কত্তে লাগলো, বরকে কনে বাবা বলে ডাকতে লাগ্‌লো, তারপর তিনশত টাকা বয়স অধিকের জরিমানা দিলে বিবাহ হলো; বরের বাঁ পায়ে একখান দাদ ছিল বলে তার জন্য পাঁচিশ টাকা নিলে।' এবং মাধবের 'চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণদের তিনপুরুষের মধ্যে একটি বিয়ে হয় না; আপনার বিয়ের নামে দেড়কাহন মেয়ে জুটেছে।

৪। বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন—ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ ২৫০

আপনি যদি স্পষ্ট বলেন যে বিয়ে করবেন না, মেয়েদের বাজার একদিনে নরম হয়ে যাবে। মহারাজ আজকাল দর খুব বেড়েচে, আমি ভেবেছিলেন এইবার অল্পদরে একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিন্‌বো, তা মহারাজ, এগোনা যায় না, বাজার ভারি গরম।' —উক্তিতে সমাজচিত্র স্পষ্ট।

নাটকটির প্রথম অঙ্কে মালতীর পাঁচশ টাকা পণে বিবাহ স্থির, দ্বিতীয় অঙ্কে মালতীর বৃদ্ধ বরে বিবাহ ও তৃতীয় অঙ্কে মালতীর দুঃখ—এ ভাবে কাহিনীর আরম্ভ, অগ্রগতি, চরম অবস্থা ও পরিণতি। তিনটি অঙ্কেরই ঘটনাস্থল কর্তাঠাকুরের বাড়ী—ঘটনাকালও বেশী দিন ধ'রে নয়। মালতীর বিবাহের পূর্বে এয়োগণ ও অন্যান্য রমণীর বৃদ্ধ বরের জন্য অনুযোগ এবং বিবাহের পব সুশীলা, মোহিনী এবং বিনোদিনীর কন্যা বিক্রয়ের দোষ প্রকাশিত। এই দেশাচারের বিরুদ্ধে দলাদলি করার কথাও আছে। এ সব কারণে 'কন্যাবিক্রয় নাটক' নাম সার্থক। তবে যে মালতীকে নিয়ে কাহিনী তাকে নির্বাক রেখে এবং কর্তাঠাকুরের কন্যাবিক্রয়ে পাপের ফল কিছু না দেখিয়ে কাহিনী শেষ হওয়ায় ভাল হ'ল না। তৃতায় অঙ্কে মোহিনী ও বিনোদিনী সমাজ নিয়ে বড় বেশী আলোচনা করেছে। কনিষ্ঠা মোহিনী যদি স্বাধীনভাবে কন্যাবিক্রয়ের বিরুদ্ধে বলতে পারে তবে তার দিদি মালতী বিবাহের পূর্বে বৃদ্ধ বরের জন্য কিছু বলল না কেন? মূল কাহিনীতে 'কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে' নাটকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৃদ্ধ বরের সঙ্গে যুবতী মালতীর বিবাহে শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহের কথা প্রকাশিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের প্রভাবও এই অংশে পড়েছে। রাগিণী সুরট, তাল কওয়ালিতে।

"ছি ছি একি লাজ মরে যাই সইলো।
মালতী সতীর পতি হোয়ে এল ঐ লো।" —গানটিতে

বৃদ্ধ বরের জন্য লজ্জা। মালতীর সতীত্ব বেশীদিন থাকবে না ব'লে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এ গানটি কার? গানটির পূর্বে [ সকলের প্রস্থান ও মধুর স্বরে গান। —লিখিত। নাট্যকারের হঠাৎ মনে পড়ল যে নাটকে গান দেওয়া হয় নাই; সেজন্য একটি গান দিয়েছেন। বৃদ্ধ বর নিয়ে 'অন্য এক রমণী' নামে পর পর অনেক জনের সংলাপ এবং

# কন্যা বিক্রয় নাটক

পাবনা বাসী

শ্রীনফরচন্দ্র পাল।

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শকাব্দ ১৭৮৫।

*CALCUTTA:*

PRINTED AT THE 'GUPTA PRESS' NO., 16 MIRZAFFER'S LANE.

1864.

মূল্য চারি আনা মাত্র।

কন্যা বিক্রয় নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ

তাতে হাসি ঠাট্টাও চলেছে। তারপর এই গানে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল বুঝা গেল না। এতে প্রাচীন যাত্রার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এরপর গৃহিণীর প্রবেশ এবং এয়োগণের উদ্দেশ্যে কথার পর তাদের সংলাপ আছে কিন্তু তাদের প্রবেশ লেখা নাই বা নেপথ্যে ব'লেও উল্লেখ নাই। প্রথম অঙ্কে গৃহিণীর উক্তিতে মালতীর তেরিজ লেখা শেষ করার কথা থাকলেও তৃতীয় অঙ্কে তার পত্রের ভাষায় 'দুঃখের কথা লিখিতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে, লেখনী গতিরোধ করিয়া শান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছে।' —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্বের উক্তি স্মরণ করায়। নাটকটির শেষাংশে কন্যাবিক্রয় সম্বন্ধে বাইশ লাইন পয়ার আছে। অনুমান যে ঐ উক্তি মোহিনীর। কারণ বিনোদিনী ও সুশীলার প্রস্থানের পর সে-ই ছিল। বাইশ লাইন পয়ার নাটকটিতে দোষ ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে পয়ার সংলাপে মেলোড্রামার লক্ষণও লক্ষ্য করা যায়। নাটকটিতে জেয়াদা (১ম অঙ্ক), ঠেকারে (২য় অঙ্ক), চালন ডালা (২য় অঙ্ক), বর বর্ত্তো (২য় অঙ্ক)—ভাষা বৈশিষ্ট্য আছে। তবে তৃতীয় অঙ্কের 'অশ্রুবারি পূঁচন' গুরুচণ্ডালী দোষ-দুষ্ট।

বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকারের—'অস্মদ্দেশীয় কন্যাবিক্রয় কুপ্রথা দ্বারা, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যে প্রকার কুকাণ্ড হইয়া যাইতেছে, তাহারই একটী দৃষ্টান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।' —এই উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট। কর্তাবাবুর অর্থলোভ এবং গৃহিনীর একদিকে কন্যাস্নেহ অন্যদিকে অর্থলাভের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। মালতীর 'যেখানে মূল্য অধিক সেইখানেই আমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহাতে পতির কুল মন্দই হোক, পতি অন্ধই হন বা বৃদ্ধই হন, বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক্ না থাকুক্, অধিক মূল্য দিলেই আমরা তাঁহার নিকট বিক্রীত হইব।' এবং মোহিনীর 'ছাগী গাভীদেরও কিছু সুখ আছে আমাদের কোন সুখ নাই। যারা ছাগী গাভী বেচে খায়, তাদের শরীরেও এত মায়া যে ছাগী গাভী সুখে থাকবে বলে ভাল লোকের কাছে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে।......হা বিধাতঃ আমরা কি ছাগী গাভী অপেক্ষাও নীচ ?' —এই বুকফাটা আর্তনাদেও সমাজ হ'তে এই কুরীতি দূর হবে না? কর্তাঠাকুরের অর্থলোভে মোহিনীর চিন্তা।—

লাঠি ধরা বুড়ো এক, ডাকিয়া আনিবে।
টাকা লয়ে তার কাছে, আমারে বেচিবে ।।

কন্যাবিক্রেতা পাপে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে—বিনোদিনীর এই কথা আমরা কর্তাঠাকুরের ক্ষেত্রে ফলতে দেখলাম না। তবে বেঁচে থেকেও যে মালতীরা বিবাহের পর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে তা দেখি। সুশীলা এ দেশের লোকের ব্যবহার সম্বন্ধে বলে, 'পোড়ালোকেরা বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখ্‌লেই অমনি খড়্‌গ হস্তে করে দলাদলি কত্তে বসে! ...এই যে কন্যাবিক্রয় করায় কত পাপ হোচ্চে ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কত কুব্যবহার করা হোচ্চে, অলোপ্‌পেয়ে লোকেরা এটা নিবারণ করবার জন্য দলাদলি কত্তে পারে না,...।' দেশাচারের জন্য শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করা অনেকে পাপ মনে করে না। সামাজিক কুপ্রথা শুধু দলাদলিতে দূর হবে—এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় না। তবে মালতীর অকালবৈধব্যে তার ব্যভিচার ও দুঃখের বিষয় স্থান পেলে কন্যাবিক্রয়ের বিরুদ্ধে মনোভাব আরো দৃঢ় হ'ত। হাস্য, করুণ ও বীভৎস রসের পরিবেষণে গ্রন্থ শেষ। নাটকটি কোথাও অভিনীত হয়েছিল কিনা জানি না। তবে এর অভিনয় হ'লে কন্যাপণের বিরুদ্ধে ভাল ফল পাওয়া যেত।

৩। কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে (১২৭৫ সাল ৩রা জ্যৈষ্ঠ) সেখ আজিমুদ্দীন।

বৃদ্ধের বিবাহ বিষয়ে অনেকেই নাটক ও প্রহসন রচনা করেছেন বটে কিন্তু হিন্দুদের সমাজ ব্যবস্থার এই বিশেষ দিকে সেখ আজিমুদ্দীনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর কাহিনীতে আমরা জানি—এক বৃদ্ধের পরিবারের সকলের মৃত্যুতে তিনি বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। তাঁর বৈবাহিক এই বিষয় জেনে গৃহিণীর নিকটে সমস্ত বলেন। তিনি আশ্চর্য হ'লেও বস্ত্রও অলঙ্কারের লোভে পাত্রী অন্বেষণে যত্ন করেন। এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, উত্তম উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারের বিনিময়ে সৌদামিনী নামে ষোড়শী, রূপবতীর সঙ্গে শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। পতিরূপ দর্শনে বিরক্ত হ'য়ে সৌদামিনী মিলনের ইচ্ছা ত্যাগ করে। কৃতকর্মের অনুশোচনায় বৃদ্ধের অল্পকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগে তাঁর

বিষয় সম্পত্তি সৌদামিনীর হস্তগত হয় এবং সে এক রূপবান সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে দাসী দিয়ে তাকে ডেকে আনে এবং তারা পরস্পর রূপযৌবন ভোগ ক'রে সুখে কালযাপন করতে থাকে।

নাটকীয় উপাদান 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'তে প্রচুর থাকলেও এটি ঠিক নাটক নয়—এটি গদ্যপদ্যে রচিত এক সামাজিক আখ্যায়িকা। একদিকে কন্যাপণ অন্যদিকে অসমবিবাহের দোষ এই গ্রন্থের বিষয়। অর্থের দ্বারা বৃদ্ধ ষোড়শীকে বিবাহ করতে পারলেও তার যৌবনক্ষুধা মিটাতে পারে না ব'লে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হ'য়ে সমাজকে বশীভূত ক'রে ব্যভিচারিণী হ'তে পারে। গ্রন্থকারের হিন্দু সমাজের কুরীতি জ্ঞানের মূল্য অনেক। কন্যাবিক্রয় নাটকে বৈধব্য ও ব্যভিচারের অভাব এতে পূর্ণ।

ধনী বৃদ্ধ এই নাটকের নায়ক এবং সৌদামিনী নায়িকা। বৃদ্ধ নিজেকে অধিক বৃদ্ধ ব'লে স্বীকার না করলেও বৃদ্ধ ব'লে মনে করেন। মরণকালে মুখে জল পাওয়ার জন্য তিনি বিবাহ করতে চান। সৌদামিনী কুলবতী, ষোড়শী, রূপবতী, চন্দ্রাননী, বিধুবদনী, মৃগলোচনী, পীনস্তনী। সে অর্থলোভী পিতামাতার জন্য বৃদ্ধকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। ব্যর্থ জীবনের জন্য তার দুঃখ 'শুনিয়াছি বৃদ্ধ নাকি শক্তি নাই গায়।' এ সংবাদ সে কার কাছে শুনেছে? বিবাহের পূর্বে অন্য পুরুষের সঙ্গে তার মিলন হয় নাই—বিবাহের পরও তার দুঃখ গেল না—ইহাও ঠিক। স্বামীর মৃত্যুর পর সাধুপুত্রকে দেখে তার মিলনের ইচ্ছা জাগল! একে দর্শনজাত ভালবাসা ধরলেও বৃদ্ধের জীবদ্দশায় সে কি কোন রূপবান যুবকের সাক্ষাৎ পায় নাই? বরং বৃদ্ধের জীবদ্দশায় তার গোপনে ব্যভিচারের প্রচুর সুযোগ ছিল। বৈবাহিক ও বৈবাহিকার চরিত্রে বৈপরীত্য সৃষ্টি নাটকীয় কৌশল। বৃদ্ধের সঙ্গে বৈবাহিকার রসিকতায় আমরা হাস্যরসে ডুবে যাই। কিন্তু বৈবাহিকার 'মর পোড়ারমুখো……আমার কি স্বামী নাই, তুই এ বয়েসে বিবাহ করে বনিতাকে কি আমার স্বামিকে দিয়ে যাবে, ভাই বুঝি তুই বেহাই যুক্তি স্থির করিয়াছ।' —এই উক্তি একেবারে সত্য না হ'লেও সৌদামিনীর সাধুপুত্রের সঙ্গে মিলনে নাটকীয় তাৎপর্য বহন করে।

গ্রন্থটিতে কয়েকটি গান আছে। প্রথম গানে তাল আড়া তেতালায় গ্রন্থকার অর্থের বিষয় বেশ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন—

হায় কড়িকে কি পদার্থ বিধি করেছেন সংসারে।
কড়ি যার না থাকে করে, কেহ না জিজ্ঞাসে তারে ॥

এই খানেই গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা। পরে কবিকারের উক্তিতে গ্রন্থকার নিজের আরো কিছু পরিচয় দিয়েছেন—

'দীন হীন ক্ষীণ জন, করে অত্র নিবেদন,
জ্ঞানিগণে প্রণতি বচনে।
হীন আমিরদ্দীনাম, কড়েয়া গ্রামেতে ধাম
জেন খেদ এ কাব্য রচনে।'

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভণিতা ও লক্ষণীয়। তাল মধ্যমান ঠেকায় দ্বিতীয় গান—'ওরে ভোলা মন আমার' অর্থলোভে বৈবাহিকার প্রণয় বিকারের ইঙ্গিত দেয়। তাল আড়া যৎএ বৈবাহিকের গীতে অর্থের সর্বদুঃখহরের কথা বলা হয়েছে। তাল তেতালায় বৃদ্ধের গীতে তাঁর বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশিত। পূর্বে গদ্যে যা ব্যক্ত তা পরে গানে প্রকাশিত ব'লে প্রাচীন যাত্রা রীতি লক্ষণাক্রান্ত। তাল যৎ এ স্বামিসুখে বঞ্চিতা সৌদামিনীর 'হায় বিধি একি দায় ঘটালে আমারে।' এই গানে তার মনোবেদনার প্রকাশ। হিন্দুসমাজে সৌদামিনীর মত কত কুলকামিনী যে ঐ রকম দুঃখ প্রকাশ করে তা আমরা জানি না। আমরা সৌদামিনীর দুঃখে করুণ রসে আপ্লুত হই। আবার যখন সে ও সাধুপুত্র পরস্পর রসিকতা করে তখন আমরা আলম্বনও উদ্দীপন বিভাবের পর শৃঙ্গার রসের সন্ধান পাই।

গ্রন্থটির ভাষা স্থানে স্থানে দোষদুষ্ট। বৈবাহিকার 'একি আশ্চর্য! যমদূতে যে বুড়োর ঘাড় ধৃত করিয়াছে কিবল ভাঙ্গিতেই বাকি রাখিয়াছে, যেমত ব্যাঙ্গের গায় জ্বর ও কুম্ভীরের সন্নিপাত।' সৌদামিনীর সাধুপুত্রের নিকট প্রেম নিবেদনের ভাষা 'কৈ হে যুবরাজ এ তোমার কি বিচার যে এ অধীনিকে স্বীয় চন্দ্রবদন অবলোকন করাইয়া ধন মন চুরি করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত ছিলে,......প্রতিকার করা তব কৃপা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।' —শুনলে তাকে অধ্যাপক-পত্নী ব'লে মনে হয়।

সাধুপুত্র ও কম নয়। সে তার প্রস্তাবের সমর্থনে বলে, 'প্রিয়সী ইতিমধ্যে তব দাসী আহ্বান করিবায় আসিতে পদ্মচক্ষে আর দৃষ্টি হইল না যে কোন পথে কি মতে শীঘ্র তব দর্শন নিকটস্থ নয়নে নিরীক্ষণ করি, ...তব আজ্ঞাকারী হইয়া জীবদ্দশাবধি নিরবধি পরম সুখে রাখিব তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না।'

৪। অযোগ্য বিবাহ নাটক- ( জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ সাল ) শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার আর এক চিত্র আমরা শ্রীনবীনচন্দ্র দাসের অযোগ্য বিবাহ নাটকে পাই। এর কাহিনী—ঢাকা শহরের শিবদাস নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা মোক্ষদাকে বিবাহ করতে মহানন্দ, দীনবন্ধু এবং শঙ্কর এলেও তারা যথাক্রমে কুঁজো, কালো এবং গরীব। বৃদ্ধ ও বিপত্নীক ব্রাহ্মণ হরিদাস পণের জন্য বহু টাকা দিলে তার সঙ্গে মোক্ষদার বিবাহ হয়। মোক্ষদা যুবতী হ'লে বৃদ্ধ স্বামীর জন্য আক্ষেপ করে এবং শঙ্করও সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মোক্ষদাকে বিবাহ করতে না পেরে নিজের দারিদ্র্যকে দোষ দেয়। পূর্ব অনুরাগের ফলে হরিদাসের বাড়ীতে দাসীর সাহায্যে তাদের গোপন মিলন ঘটে। জানাজানির ফলে হরিদাস মোক্ষদাকে তিরস্কার করে এবং সদর ও খিড়কির দরজায় দ্বারী বসায়। মোক্ষদার অসুখে শঙ্কর সন্ন্যাসী সেজে তার রোগ ভাল করতে আসে। রাত্রে সকলে ঘুমালে মোক্ষদা স্বণমুদ্রা নিয়ে গৃহত্যাগ করে এবং সন্ন্যাসীর চেলা সেজে অন্যত্র চলে যায়। দুঃখিত হরিদাস শঙ্করের বিরুদ্ধে ঢাকার রাজবল্লভের নিকট স্ত্রী হরণের জন্য নালিশ করে। বিচারে মোক্ষদাকে স্বামীর সঙ্গে যেতে বলা হ'লেও সে রাজী না হ'য়ে শঙ্করের সঙ্গে যেতে চায়। রাজার অনুমতিতে তারা মিলিত হ'য়ে সুখী হ'লেও ব্রাহ্মণ সমাজ চ্যুত হ'য়ে বৈষ্ণব হয়ে বৃন্দাবনে যায় এবং সেখানে ধ্রুবের তপস্যার ঘাটে ব্রহ্মের তপস্যা ক'রে প্রাণত্যাগ করে।

লেখক বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন 'অধুনা বঙ্গদেশস্থ বিজ্ঞতম মহোদয়গণের উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমে গদ্যগ্রন্থের প্রায় অসদ্ভাব দেখা যায় না; কিন্তু সামাজিক কুনীতি সংশোধক পদ্যগ্রন্থ রচনা বিষয়ে বিদ্যোৎসাহিদিগের তাদৃশ যত্ন দৃষ্ট হয় না' এ জন্য তিনি সামাজিক কুনীতি সংশোধক 'সাধারণের পাঠোপযোগী অতি সরল ভাষায় এই ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থখানি

প্রণয়ন' করেছেন। গ্রন্থটি পয়ার, ত্রিপদী—ছন্দে রচিত। মধ্যযুগীয় ভণিতাও আছে। অযোগ্য বিবাহের কুফল দেখিয়ে বিরচিত ব'লে গ্রন্থটির নামকরণ সার্থক। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় লেখক জানিয়েছেন 'শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মৃত কৃষ্ণলাল বসু মহাশয়েরা মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন বলিয়া আমি মুদ্রিত করণে সমর্থ হইলাম। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।'

আটাত্তর পৃষ্ঠার গ্রন্থটির সূচীপত্রে নির্ঘণ্ট তালিকা কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। নবদ্বীপে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের ভাঁড় গোপালের মুখ দিয়ে অযোগ্য বিবাহের বিষয় বলা হয়েছে। একে সুধীজন ভাঁড়ের ভাঁড়ামি মনে করলে লেখকের আশা নির্মূল হয়। ভাঁড়ের মুখ দিয়ে না বলালেই ভাল হ'ত। অর্থলোভী পিতা মাতা শিবদাস ও গৃহিণী বেশ ভাল। গৃহিণী কর্তাকে ছাড়িয়ে গেছে—

বলে প্রসবিনু মেয়ে, পালিলাম জল খেয়ে,
ধন লব তার কিবা ভয়॥ (পৃষ্ঠা ৬)

সে এ বিষয়ে স্বামীকে ভয় করে না—টাকা নিয়ে সে গহনা গড়াবে ব'লে জানায়। কন্যার প্রতি স্নেহ মায়ের বেশী হয় কিন্তু এখানে শিবদাসের চেয়ে তার কম। কন্যাপণের বিষয়ে পূর্বের দুটি নাটকের পরিপূরক এই গ্রন্থটি। অযোগ্য বিবাহের জন্য পিতামাতা, পুরোহিত, ঘটক প্রভৃতিকে ধিক্কার যথাযথ। যুবতী মোক্ষদা যে ইঙ্গিতে শঙ্করকে তার মনোভাব জানিয়েছে তাতে তাকে কামকলা-নিপুণা বলা যায়। স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে সে রান্নাঘরে শঙ্করের কাছে গিয়েও বলে—

এত ব্যস্ত কেন তুমি হৈলে বঁধু।
পরে তৃপ্ত হবে পানে পদ্ম মধু॥ (পৃষ্ঠা ৩১)

প্রথমদিন বিহারের পর শঙ্কর তার পরদিনই আবার আগ্রহী হ'লেও মোক্ষদা তাতে রাজী নয়। তার পরদিনে তাদের মিলন হয়েছে। কামশরে জর্জরিত হ'য়ে সে কি স্বামী, দাসদাসী প্রভৃতির কথা ভুলে মিলনে এত আগ্রহী হয়েছিল? প্রথম মিলনে সারারাত্রি কেটে যায়—এটা সম্ভব কি? রাজা রাজবল্লভের বিচার সভায় সমাজ সম্বন্ধে মোক্ষদার

উক্তি বক্তৃতাধর্মী হ'লেও বক্তব্য বিষয়ে যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। সে শঙ্করকে চায় এবং হরিদাসের মৃত্যু কামনা করে। শঙ্করকে না পেলে সে আত্মহত্যার ইচ্ছা করে। রাজা তাকে সুখী করতে শঙ্করের সঙ্গে যেতে অনুমতি দেন। শঙ্কর রূপবান, বিদ্বান হ'লেও নির্ধন হওয়ায় মোক্ষদার সঙ্গে তার বিবাহ হয় নাই। সে মোক্ষদার শ্বশুর বাড়ীর দিকে 'আনাগোনা' করতে থাকে। শঙ্করকে পরস্ত্রীলোলুপ লম্পট বলা যায়। যুবতী মোক্ষদা ইঙ্গিতে তার কামানলকে প্রজ্বলিত করেছে। বাড়ীতে মিলনের অসুবিধা হওয়ায় শঙ্কর সন্ন্যাসী হ'য়ে হরিদাসকে প্রতারণা ক'রে তার স্ত্রী হরণ ক'রে চলে গেছে। এত সব ক'রেও সে বিচার সভায় হাল ছেড়ে দেয়—'নারী যদি হরিদাসে লয় মহারাজ।

তাহাতে আপত্তি মম নহে কোন কায॥ (পৃ ৬৬)

এতে মোক্ষদার প্রতি তার প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না। মোক্ষদা প্রেমের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'তে রাজার সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হরিদাস ধনী, বৃদ্ধ ও বিপত্নীক। মোক্ষদাকে বিবাহের পর মোক্ষদা ও শঙ্করের গোপন মিলনের কানাকানি শুনে সে মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করে,

কহ প্রিয়া এ কেমন শুনি চমৎকার।
শঙ্করের সঙ্গে তুমি করহ বিহার॥ পৃ ৪০

কিন্তু মোক্ষদার অস্বীকারে তার করার কিছু নাই। কারণ 'বুড়ার যুবতী ভার্য্যা প্রাণের সমান।' (পৃ ৪১)। মোক্ষদাকে হারিয়ে তার উক্তি—

কাশীবাসী হব কিম্বা ত্যজিব জীবন।
শূন্য গৃহ দেখি মম নাহি লয়ে মন॥ (পৃ ৫৬)

যেমন করুণ তেমনই হাস্যকর। রাজার শেষ আজ্ঞায় যখন মোক্ষদা শঙ্করের সঙ্গে চলে গেল তখন তার অবস্থায় না হেসে থাকা যায় না; আবার তার দুঃখে মনও ভারাক্রান্ত হয়।

গ্রন্থটির মূল কাহিনী আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নবদ্বীপের তৎকালীন অবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ জীবনের এক বাস্তব ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে।

ধিক পিতা ধিক মাতা ধিক মোর প্রাণে।
কি সুখে কুণ্ডল আমি পরিয়াছি কানে॥ পৃ ১৪

ইত্যাদি ব'লে মোক্ষদার আক্ষেপ বা ধিক্কার শুধু মোক্ষদার নয়—এ রকম ধ্বনিতে উনিশ শতকের বাংলার আকাশ বাতাস কম্পিত। রাজা রাজবল্লভের সভায় মোক্ষদা সমাজ-সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে—

দোজবেরের বিয়া দেহ বিধবার সনে।
অনাসে পিরীতি হবে উভয়ের মনে॥ পৃ ৬৯

এ প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণকে সে দোষও দেয়। রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের অল্পজ্ঞান, কোন্দলপ্রিয়তা, জুয়াচুরি, মিথ্যাকথন প্রভৃতি দোষের কথা উল্লেখ করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন—

কালেতে যখন লোক বুদ্ধিজীবী হবে।
বিধবা বিবাহ করি যোগ্য নারী লবে॥ পৃ ৭৮

সমাজ-বিশেষজ্ঞ গোপাল বহুবিবাহের কুরীতি বিষয়ে বলতে পারলেও কৃষ্ণচন্দ্র বহু স্ত্রী নিয়ে রসরঙ্গে দিন কাটান ব'লে বঙ্গদেশের অযোগ্য বিবাহের কুরীতি তাঁর চোখে না পড়ায়, গোপাল মৃদু অভিযোগ করে। বৈরাগী হ'য়ে মোক্ষদাও শঙ্কর বৃন্দাবনে চলে যায়। এখনও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মধ্যে অনেক শঙ্কর—মোক্ষদাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। গ্রন্থটিতে ভাষার ত্রুটি কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। মোক্ষদার মুখে 'মহানশ' শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়। দাসীর 'পন্নগ হারায়ে যেন শিরঃ স্থিত মণি।' এবং রাজার 'কেশ মুড়াইয়া তক্র সেচি দিব শিরে।' প্রভৃতি উক্তি দোষদুষ্ট।

মোক্ষদার রূপ বর্ণনা খুব বেশী উত্তেজক নয়। কারণ লেখক সাত্ত্বিকের ভাব লক্ষ্য করে বলেছেন—

নাগরী চতুরা অতি, মনসুখে ভুঞ্জে রতি,
আহ্লাদ সাগর মাঝে ভাসি।
সাত্ত্বিক ভাবেতে কাঁপি, আবেশে ধরয় চাপি,
খেলে ধনী হৃদয়েতে হাসি॥ পৃ ৩২

কিন্তু এর সাত্ত্বিকভাব আমরা বুঝতে পারলাম না। বিদ্যা ও সুন্দরের বিহারের সহিত মোক্ষদা ও শঙ্করের বিহারের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার মোক্ষদার অভিসারে যাওয়ার সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার অভিসার

স্মরণ করায়—

সাহসে করিয়া ভর, চলে রমা ত্যজি ঘর
চলিতে বাজিল আভরণ।
সেই ক্ষণে আভরণ, করি রামা উন্মোচন,
বস্ত্রে রাখি করিল বন্ধন ॥ পৃ ২৭

৩৭ পৃষ্ঠায় মোক্ষদা শঙ্করকে—

এই ভয় করি বঁধু যদি ফেলে যাও।
সুখের সাগরে রেখে পাছে দুখ দাও ॥

—বলায় বৈষ্ণব পদাবলীর মিলনেও বিরহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শঙ্কর ও মোক্ষদাকে ধ'রে আনতে চৌকিদার, দারগা প্রভৃতির যাওয়া এবং তাদের হাঁকডাক একটু বাড়াবাড়ি হ'লেও রাজাদেশে সুন্দরের বন্দী হওয়ার পূর্বের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়।

মোক্ষদা ও শঙ্করের বিহারে শৃঙ্গার রস, মোক্ষদাকে কৌতুক করবার জন্য রাজার ইচ্ছার দ্বারা কৌতুক রসের সঞ্চার হ'লেও শেষ পর্যন্ত অযোগ্য বিবাহের প্রতি ঘৃণার ভাব স্থায়ী হওয়ায় বীভৎস রস পরিবেশিত।

৫। আসুরোদ্বাহ ( ১২৭৬ সাল )—জনৈক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

কন্যাপণ ও অসম বিবাহের বিষয় অবলম্বনে জনৈক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ আসুরোদ্বাহ নাটক প্রকাশ ( ১২৭৬ সাল ) করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন গ্রন্থের ২৫৪ পৃষ্ঠায় 'অসুরোদ্বাহ' (১৮৬৯) নামক প্রহসনটির রচয়িতা 'জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ' লিখেছেন। এতে জানা যায় হরিহর চক্রবর্তী তার তিন বৎসরের কন্যা জ্ঞানদার বিবাহের পণ বেশী চায় ব'লে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত। কেদার নাথ রায়ের অবস্থা ভাল হ'লেও সে চারশ টাকার বেশী পণ না দেওয়ায় অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জ্ঞানদার বিবাহের ঠিক হয়। বিবাহের রাত্রে ঘটক বিদায়, মানসিকের টাকা, বেমানানের দরুণ টাকা প্রভৃতি চেয়ে বর ও বরকর্তা অভয়াচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিপদে ফেলে কৌশলে বেশী টাকা আদায় করা হয়। অন্যদিকে কেদারের সঙ্গে জাহানাবাদের নিকটে মুথাডাঙ্গার কালিপ্রসাদ

সাহার ভগিনী কুমুদিনীর ছশ টাকা পণে বিবাহের স্থির হয়। বিবাহের পর জানা যায় কুমুদিনী বিধবা। কুমুদিনীকে ত্যাগ করতে মন না চাইলেও কেদার দাসী আহ্লাদীর সঙ্গে তাকে মুথাডাঙ্গা পাঠিয়ে দেয়। তার মা পূর্বেই চ'লে গিয়েছিল এবং মামাও কোন দায়িত্ব না নেওয়ায় কুমুদিনী ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় সরোবরে প্রাণত্যাগ করে।

নাটকটিতে ছটি অঙ্কের মধ্যে ১ম অঙ্কে ২টি গর্ভাঙ্কের উল্লেখ আছে; বাকি অঙ্কগুলিতে কোন গর্ভাঙ্কের উল্লেখ নাই। ১ম অঙ্কে ২টি গর্ভাঙ্কের পরও ১ম অঙ্ক চলেছে—অথচ ৩য় গর্ভাঙ্কের উল্লেখ নাই। নাটকটির প্রথম ঘটনায় জ্ঞানদার পিতার অর্থলোভ এবং বেশী কন্যাপণলাভে তার উপশম যে রকম প্রকাশিত দ্বিতীয় ঘটনায় কুমুদিনীর মা ও মামার তা দেখালেও বিধবাবিবাহ, বিধবাবিবাহে সামাজিক বিপত্তি, পত্নীত্যাগ, পত্নীর আত্মহত্যা প্রভৃতি কাহিনী এসেছে। এই ঘটনায় মূল কাহিনীর গতি ক্ষুণ্ণ।

হরিহর ও কামিনী—যেমন দেব তেমন দেবী। অর্থলোভ দুজনেরই আছে তবে হরিহরের টাকাই সব, পাত্র যাই হোক—আর কামিনীর টাকাও চায় ভাল পাত্রও চায়—এই প্রভেদ। নিজের ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র বৃক্ষমূলে দিয়ে হরিহর যখন স্ত্রীর জন্য কুমুদিনীকে প্রায় বিবস্ত্রা ক'রে তার ঢাকাই নতুন শাড়ী নিতে চায় তখন আমরা তার নির্লজ্জতায় শিহরিত আর কুমুদিনীর লাঞ্ছনায় আমরা মর্মাহত। ৩য় অঙ্কে কামিনীর সাজসজ্জায় সৌদামিনীর রসিকতায় আমরা হাসি বটে কিন্তু জ্ঞানদা যখন জিজ্ঞাসা করে 'ওমা! ও মা! আজ তোর বে হবে মা—না আমার বে হবে?' —তখন আমরা দুঃখে অভিভূত হই।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কন্যাপণ সম্বন্ধে কুৎসিত ব্যবহার দেখানই আসুরোদ্বাহ নাটকের মূল বিষয়। অর্থ দ্বারা কন্যা ক্রয় ক'রে যে বিবাহ তাকে আসুরোদ্বাহ বলে। নাট্যকারের গ্রন্থটির নামকরণ যথাযথ। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ কুরীতি দূর হবে - এ আশা অনেকেই করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্তবাবু কৈলাস চন্দ্র দত্ত নাটকটির সংশোধন ও মুদ্রণে সর্বতোভাবে সাহায্য করায় লেখক কৃতজ্ঞ। এমন কি ডভেটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্তবাবু কেদার নাথ তর্করত্ন মহাশয় নাটকটির

কয়েক ফরমা সংশোধন করায় লেখক তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কেদার এবং কৈলাস নামে চরিত্র সৃষ্টিও ইঙ্গিতবহ নাটকের মধ্যে বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, সামাজিক দলাদলি প্রভৃতি এসে পরিণতিতে বিধবাবিবাহে যত গণ্ডগোল হওয়ায় এক অসহায়া নারী আত্মহত্যা ক'রে সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি হ'ল।

নাটকে যে দুটি গান আছে তার প্রথম গান বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী শ্যামাচরণকে দিয়ে না গাওয়ালে ভাল হ'ত। জ্ঞানদার বিবাহের যে রকম আয়োজন তাতে বাসরঘর কেমন হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবু বাসর ঘরে লক্ষ্মীর গান নিয়মমাফিক।

স্ত্রী চরিত্রলিপিতে জগদম্বা নামে কোন চরিত্রের উল্লেখ নাই। তবে জ্ঞানদার বাসরঘরে তার কথাবার্তায় বুঝা যায় সে কৈবর্ত। সেকালে ব্রাহ্মণ বাড়ীর বাসরঘরে কৈবর্তের উপস্থিতি আশ্চর্যের। শুধু ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধে একটু বলবার জন্য তার আবির্ভাব! কৈলাসচন্দ্রের পদ্ম-পুরাণ, ক্রিয়াযোগসারের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা একঘেয়ে। আবার গঙ্গা প্রসাদের সঙ্গে তার সামাজিক বিষয় আলোচনা সমাজের পক্ষে উপযোগী হ'লেও নাটকের পক্ষে দোষযুক্ত। কুমুদিনীকে আমরা ৪র্থ অঙ্কে প্রথম দেখি। তার বয়স ১০। ১১ বৎসর হ'লেও কথাবার্তায় তাকে একটু বেশী বয়সের মনে হয়। সে যে পরিবেশে ছিল তাতে তার লেখাপড়া হওয়া অসম্ভব। স্বামী পরিত্যক্ত অবস্থায় মুখডাঙ্গার সন্নিকটে প্রান্তরের বৃক্ষমূলে তার স্বগত ভাষণের ভাষা 'রে আশা! তোর কি মোহিনী শক্তি তুই এখনও আমাকে আশ্বাসিত করিতেছিস্?' কৃত্রিম। সরোবরে প্রাণ বিসর্জনের পূর্বে কুমুদিনীর সংলাপে মাতার জন্য আক্ষেপ, ভগবানের নিকট অভিযোগ, কন্যাপণ ও দেশাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেশ করুণ ভাবে প্রকাশিত হ'লেও সংলাপটি দীর্ঘ। তার বিবাহের পূর্বে বৈধব্যের বিষয় প্রকাশ ক'রে বিবাহ দিলে অন্যদিকে ঘটনা ঘুরত। তার দুঃখের সংলাপ অলংকার প্রয়োগে দূষিত।

নাটকটিতে সৌদামিনী হাস্যরসের উৎস। একটি গৌণ চরিত্র হ'লেও তার মত হাসাতে কেউ পারে না। কিন্তু অনেকে অপরকে কষ্ট দিয়ে হাস্যরস পরিবেশণ করে। সৌদামিনী তা করে নাই। কুমুদিনী

'বেশ্যাবৃত্তি অথবা দাস্য বৃত্তি ভিন্ন উদরপূর্ত্তির অন্য কোন উপায়' না দেখে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা ক'রে করুণরসের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

৬। নয়শো রূপেয়া (১৮৭২) শিশির কুমার ঘোষ।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শিশির কুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া' কন্যাপণ বিষয়ে আর একটি প্রহসন। সাংবাদিক শিশির কুমার যথেষ্ট পরিমাণে সমাজ-সচেতন। তাঁর নয়শো রূপেয়া এবং বাজারের লড়াই এই সচেতনতার পরিচায়ক। নয়শো রূপেয়ার কাহিনী এই—সরলার বাবা রামধন মজুমদার এক হাজার টাকার কমে সরলার বিবাহ দিতে চায় না। শেষে নয় শত টাকায় রঞ্জনের সঙ্গে বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। এ দিকে সরলা রঞ্জনের মামাত বোন ব'লে বিবাহের অন্তরায়। টাকায় বিদ্যাভূষণের মুখ বন্ধ করা হয়। এ দিকে সরলা বিবাহের পর ভাই-বোনের মত জীবন কাটাবে বলে। সে রঞ্জনকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বললে রঞ্জনও তাকে ঐরূপ করতে বলে। শেষ পর্যন্ত বিন্দুবাসিনীর পত্রে জানা যায় রঞ্জন কানাই এবং শশীর মায়ের সন্তান। তাকে মজুমদারেরা চুরি করেছিল। সাতুলাল জামাই ও ভাইঝিকে শশীর মায়ের কাছে আনে এবং পণের নয় শত টাকা দাদার কাছ হ'তে নিয়ে এদের দেওয়ায় সকলে আনন্দিত।

পণের নয় শত টাকা নিয়ে গ্রন্থটি রচিত বলে নয়শো রূপেয়া নামকরণ সার্থক। উপকাহিনীতে আছে—গোপীমোহন নামে এক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের জামাই বিবাহের পণ সব দিতে না পারলেও গোপনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হ'লে গোপীমোহন পাড়ার লোক ডাকতে যায়। সাতুলালের চেষ্টায় জামাই এবং বামা পালকিতে চলে যায় এবং যাওয়ার সময় তাদের বিবাহে গোপীমোহন যে ৩৫০ টাকা পেয়েছিল তা নিয়ে যায়। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের কন্যাপণের ফলে কান্তিচন্দ্র মজুমদার ও তার ভায়ের বিবাহ হয় না। অন্যদিকে কুলীন ভুবন মুখার্জীর চার কন্যার বরপণ দিয়ে বিবাহ হয় না।

রামধন মজুমদারের টাকার লোভের কারণ তার মুখেই শুনি 'আমি টাকা দিয়ে বে কোরেছিলাম, যদি আমি উপস্বত্ত ভোগ না

কোর্‌ব তবে আমার টাকা খরচ কোরে বে করার দরকার কি ছিল?' এই লোভের জন্য ঘটক হলধরের সঙ্গে তার কথাবার্তা কুরুচির পরিচায়ক। কন্যা সম্বন্ধে ঘটকের ঠাট্টা দেরিতে হ'লেও সে যে বুঝেছে এতে আমরা খুশী। টাকার লোভে সে কন্যার বারবার বিবাহ দিতে চায়। 'বুড় মুখুয্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ৮০০ টাকা পাওয়া যেত সে মরে যেত অল্পদিনে আবার বিয়ে দিয়ে ৫। ৭ শত পাওয়া যেত।' —এই উক্তি তার হৃদয়-হীনতার পরিচায়ক। সাতুলাল তার বিপরীত চরিত্র। দাদার লোভে সে ঠাট্টা করে। এতে হাস্যরস পরিবেষিত হ'লেও তার সমাজসচেতনতা প্রশংসনীয়। কানুর 'হাজার টাকার কিছু কমে হবে না?' এর উত্তরে সে বলে, 'বাবা, কম্ কম্ কোচ্ছ, এ যে তোয়েরি মাল, দুদিন রেখে বেচ্‌লে [illegible] হাজার টাকায় পড়্‌তে পাবে না। আমার দাদা এক কথার মানুষ তিনি এ বৎসর যে ১লা কার্ত্তিক পড়েছে, অমনি রাইট করে দর বেন্ধে দিয়াছেন। এ বৎসর হাজার টাকা কমে তিনি মাল ছাড়বেন না, তা পোচে গেলেও না।' ভাইঝিকে টালার নীলামে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে তার তামাসায় আমরা একদিকে হাসি অন্যদিকে ঘৃণায়, লজ্জায় শিহরিত হই। সে আরও বলে, 'আমি নাটক লিখ্‌বো ও তাহার মধ্যে চারি পোড়াকপালে ও চারি পোড়া কপালি ঢুকাইয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে ইহার অভিনয় করিব, করিয়া বলিব যে তোমাদের মুখে আগুন।' ব্রাহ্মণদের মুখে আগুন দিয়ে সে হিন্দু সমাজের মুখে আগুন দিয়েছে। পোড়া মুখ নিয়ে সমাজ অন্যকেও মুখপোড়া করে চলেছে। সাতুলাল যখন মেয়েদের গরুর সঙ্গে তুলনা করে তখন আমরা তার সত্যদৃষ্টিতে বিস্মিত। 'জামাইকে মেয়ে পোষাণী দিয়ে বোল্লে হোত যে, ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌বে তুমি, দুধ তোমার বাছুর আমার। দেখ দেখি সে কেমন মজা হোত।' সাতুলাল সামাজিক দোষ দেখাতে গাঁজাখোর। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা করতে আফিমখোর। নাট্যকারের বক্তব্য শেষ হওয়ায় পরিণতিতে সাতুলাল গাঁজা ছেড়ে বিবাহ ক'রে সংসারী হতে চায়। 'সাতুলালের এত গুণ আছে যে, সে নিমচাঁদের কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইবে বড় আশ্চর্য্য নয়।' [৫] রঞ্জন এবং সরলা নায়ক নায়িকা হ'লেও তারাই সর্বাপেক্ষা দুর্বল

৫। বঙ্গদর্শন—বৈশাখ ১২৮০।

চরিত্র। 'ব্রাহ্মণ বংশ অধঃপতন' সম্বন্ধে রঞ্জনের মন্তব্য শুনি কিন্তু বিবাহ, পণের টাকা প্রভৃতি নিয়ে তার চরিত্র বেশ সুন্দর হ'তে পারত কিন্তু নাট্যকার তা করেন নাই। সরলা ও রঞ্জনের বিবাহ টাকার জন্য দেরীতে হয়েছিল। মামাত বোন ব'লে আপত্তি পরের ঘটনা। অহেতুক ঐ রকম একটি সম্পর্ক আনার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তবে রঞ্জন ও সরলার প্রেম নিবেদন ললিত ও লীলাবতীর (লীলাবতী নাটকে) প্রেম নিবেদন অপেক্ষা আকর্ষণীয়।

প্রহসনটিতে পাঁচটি অঙ্কের প্রথমটিতে চারটি, দ্বিতীয়টিতে তিনটি, তৃতীয়টিতে তিনটি, চতুর্থটিতে তিনটি এবং পঞ্চম অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক আছে। প্রহসনের বিচারে পাঁচটি অঙ্ক থাকা অনুচিত। গ্রন্থকার নাটক লিখতে ইচ্ছা ক'রলেও গ্রন্থটি প্রহসন। নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণের তালিকায় কান্তি চন্দ্র চৌধুরী আছে। পরে তার পদবী মজুমদার বলা আছে। তৃতীয় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কটি বেশ উপভোগ্য। ডাক্তার, কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তিনজনের উপস্থিতিতে তাদের পৃথক পৃথক মতে হাস্যরস বেশ জমে উঠে। তবে গ্রন্থটির ভাষা সম্বন্ধে 'গ্রন্থকার ভবিষ্যতে আবার নাটকাদি রচনার সময় ভাষা সম্বন্ধে আরও কিছু সতর্ক হয়েন এবং গ্রাম্যতা দোষে পুস্তককে কলঙ্কিত না করেন।'[৬] —এ রকম পরামর্শ দেওয়া যায়।

তবু প্রহসনটির জনপ্রিয়তার জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এর প্রথম অভিনয় হয়। সাতুলালের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর অভিনয় অতুলনীয়। অভিনয়ে নতুন নতুন কলাকৌশল প্রয়োগে মুস্তফী সাহেবের সম্পর্কে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ বলেছেন, 'নিমচাঁদের মদের গ্লাসের ন্যায় গাঁজার হুঁকো হাতে করিয়া অভিনয় করিতে হয়। অর্দ্ধেন্দু ছাতুলালের গাঁজার কল্কে হইতে হঠাৎ আগুন পড়িয়া গেল। এই—যাহার সহিত অভিনয় হইতেছিল, তাহার প্রতি ছাতুলালের তাড়না,—"হামারা পা পুড়িয়ে যাতা হ্যায়, তোম্ দেখ্‌তা নাই?" .........ছাতুলালের তাড়না বাড়িল, সে পলাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া অভিনয় চলিল।'[৭]

৬। জ্ঞানাঙ্কুর—১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, ৯ম সংখ্যা পৃ ২২২
৭। বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৃ ২৭

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## বিধবাবিবাহ বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

উনিশ শতকে এ দেশে সর্বাপেক্ষা বড় আন্দোলন নারী-বিষয়ক। সতীদাহ নিরোধ হ'তে আরম্ভ ক'রে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিষেধ প্রভৃতি সমস্তই নারী জাতির কল্যাণ কামনায় আরম্ভ। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে নারীর মুক্তি চিন্তার প্রথম ফল সতীদাহ নিবারণ। যে হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত তার সতীদাহ বন্ধ করলে কি হবে? বরং সমাজে হেয় অবস্থায় আজীবন দাসীবৃত্তি ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল। বহু বিধবা বহু রকমের। নানা বয়সের বিধবায় সমাজ বিব্রত। যাদের বয়স বেশী তাদের নিয়ে তেমন চিন্তার কারণ না থাকলেও অন্য বিধবাদের নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য বিধবাবিবাহ বিষয়টিতে জোর আলোচনা চলে। শাস্ত্রের যুক্তি নিয়ে বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বিপক্ষে বিদ্যাসাগর ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের যে সব তর্ক বিতর্ক হয়েছিল তা উল্লেখ করা এখন নিষ্প্রয়োজন। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময়ে সামাজিক পরিস্থিতি বিধবাবিবাহের অনেকটা অনুকূল হওয়ায় শিক্ষিত হিন্দু যুব সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ ক'রে তিনি দুস্তর দেশাচার সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন।

ধর্মশাস্ত্র যুগভেদে বিভিন্ন। ধর্ম সমাজ, কৃষ্টি প্রভৃতির ধারক। কিন্তু একই ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনের বিভিন্ন অর্থে মহা মুসকিল। পরাশর সংহিতার যে উদ্ধৃতি বিদ্যাসাগরের অকাট্যরূপে প্রতিষ্ঠা তা-ই আবার বাগ্দত্তার ক্ষেত্রে অন্যজনের প্রয়োগ বিস্ময়ের কারণ। অন্য ধর্মশাস্ত্রে এটা নিষেধ থাকবে—এতে আশ্চর্য কি? আমাদের ধর্ম শাস্ত্রের বিধান নিয়ে পণ্ডিতদের তর্কবিতর্কের অন্ত নাই। এতে আমরা সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। এখন দেখা যেতে পারে আমরা ধর্মশাস্ত্র কতদূর মানি। যদি আমরা বাস্তবতাকে স্বীকার করি তবে ধর্মের নীতি লঙ্ঘনও করতে হয়। বিধবাবিবাহ দেশাচার বিরুদ্ধ কেন? এতে পত্নীপ্রেম কম হয়। দ্বিতীয় বিবাহ ব্যভিচারের নামান্তর, উত্তরাধিকার আইনের

বিরোধী। আবার পক্ষেও তো অনেক কথা বলা যায়—প্রথম স্বামী মরলে স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারবে—এ জন্য স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসবে না—এ যুক্তি ঠিক নয়। যার ভালবাসা আছে সে ভালবাসবেই। সে আবার বিবাহ করতে পারলেও ভালবাসবে আর না করতে পারলেও ভালবাসবে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করা ব্যভিচার আর বিবাহ না ক'রে অবৈধ সম্ভোগে লিপ্ত হ'লে তা গোপনে ব'লে ব্যভিচার হবে না? বিধবা-বিবাহ ঘটলে উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন করা চলবে বা আইন পরিবর্তন ক'রে বিধবার বিবাহ দিলেই চলবে। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। যদি স্ত্রীলোক বিধবা হ'লে বিবাহ করতে না পায় তবে বিপত্নীক পুরুষেরও বিবাহ নিষেধ হোক। 'পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু আপনাদের বেলায় কি করেন? বহুদার গ্রস্ত বিলাসীর মুখে সতীত্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যেরূপ বিসঙ্গত, তাঁহার উপদেশও কতকটা সেইরূপ। ...তারা যখন নিজেদের বেলায় মৃত পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নব বধূর পরিণয়ে এতটুকুও ইতস্তত: করেন না, তখন তাঁদের কথার মূল্য কি?'[১] পুরুষ প্রবৃত্তিকে জয় করতে না পেরে বিবাহ করলে স্ত্রীলোক করবে না কেন? পুরুষের কামনা তৃপ্তির জন্য গণিকালয় আছে স্ত্রীলোকের তো ঐ রকম প্রকাশ্য ব্যভিচার চিন্তা করাও যায় না। প্রকৃতিকে জয় করতে না পারায় সমাজে স্ত্রী পাগলের সংখ্যা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।

হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার ফলে বহু বিধবার সৃষ্টি। বিধবার ব্রহ্মচর্য পালন উত্তম হ'লেও যদি কোন বিধবা তাতে অক্ষম হয় তার কি হবে? 'বিধবার ব্রহ্মচর্য যদি সদনুষ্ঠান হয় তবে পালনীয় বটে, —কঠোর হইলেও পালনীয়। সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও অবশ্য পালনীয়।'[২] কিছুটা ব্রহ্মচর্য পালন কিছুটা ভোগ কিভাবে হবে? 'তবে কেহ কেহ এস্থলে প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার নামোল্লেখ করিতে পারেন। আমরা বলি যদি কেহ দুহিতা বা ভগ্নিকে পঞ্চকন্যার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া সতী করিয়া ঘরে রাখিতে চান রাখুন।

১। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর। পৃ ২৪২

২। অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার—সম্পাদক ডঃ কালিদাস নাগ। পৃ ১১০

তাঁহার পক্ষে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অসঙ্গত হইতে পারে।' [৩]

হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সতীদাহ প্রচলিত ছিল। সরকারী আইনে তা নিষিদ্ধ হওয়ায় বিধবা সমস্যা সমাধানের নিকটতম উপায় বিধবাবিবাহ। 'সহমরণ উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ হইয়াছে? ........ তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত, —এখনও পুড়িতে পায়. কেবল মরিতে পায় না।' [৪] পুরুষ-প্রধান সমাজে পুরুষ শাস্ত্রকারেরা পক্ষপাতিত্ব করেছেন। 'পরাশর যেমন লিখিয়াছিলেন, যে সহমৃতা বিধবা সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিবে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখিতেন যে সহমৃত পুরুষ সাড়ে তিন শত কোটী বৎসর স্বর্গ ভোগ করিবে তাহা হইলে এত কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত না' [৫]

বিধবাবিবাহ রামায়ণ মহাভারতের যুগেও ছিল। তারা, মন্দোদরী এবং হিড়িম্বার সুগ্রীব, বিভীষণ ও ভীমের সঙ্গে বিবাহ এর উদাহরণ। অনেকেই বলবেন হনুমান এবং রাক্ষস সমাজে ঐ বিবাহ চললেও উচ্চ হিন্দু সমাজে তা কি ক'রে চলতে পারে? নিম্ন হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ পূর্বেও ছিল এখনও আছে। বিধবা সমস্যা এতে নাই। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা যে জাতির জীবিকা নির্বাহ হয় সে জাতির মধ্যে বয়স্ক বিধবা-বিবাহ পূর্বেও ছিল এখনও আছে। বিধবা সমস্যা এতে নাই। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা যে জাতির জীবিকা নির্বাহ হয় সে জাতির মধ্যে বয়স্ক বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। নিম্ন হিন্দুর ক্ষেত্রে প্রথম বিবাহ কুমারীর সঙ্গে হ'লেও দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি বিবাহে সাধারণতঃ বিধবাবিবাহ হ'ত। আবার নিম্ন হিন্দু সমাজে স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামী পরিত্যাগিনীকে সাধারণতঃ বিপত্নীক বা স্ত্রী পরিত্যাগী বিবাহ করত। হিন্দু সমাজে দেবরের সঙ্গে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হ'লেও এর বেশী প্রচলন ছিল না। মন্দোদরী ও তারা দেবরকে বিবাহ করেছিল বটে কিন্তু এর বেশী উদাহরণ পাওয়া যায় না। নিম্নহিন্দুসমাজে যা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নাই তা-ই উচ্চ হিন্দুসমাজে প্রবলাকার ধারণ করে।

---

৩। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র— চতুর্থ খণ্ড – বিনয় ঘোষ। পৃ-৩৩৭

৪। বঙ্গ দর্শন—১২৮৪, আষাঢ়।

৫

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রচণ্ড হওয়ায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। * এই আইনের ফলে বিধবাবিবাহের বাধাগুলি দূর হয়ে গেল। 'একদল মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা আমাদের বেওয়ারিস সমাজের প্রতি বড় কৃপাবান। সমাজকে অষ্টে পৃষ্ঠে ইংরাজী আইনের বন্ধনে বান্ধিয়া, ইহার সংস্কার করিতে ইঁহাদের বড় আগ্রহ।' [৬] বিধবাবিবাহ আইন পাস হ'লে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে। বাস্তবক্ষেত্রে বিধবার বিবাহ দেওয়া কঠিন সমস্যা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে পলাশ ডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিধবা কালীমতীর বিবাহ স্থির করলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর কন্যার মাতা লক্ষ্মী দেব্যা কন্যা সম্প্রদান ক'রে হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজের বিধবার বিবাহ দিয়ে সামাজিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। বিদ্যাসাগরের এতদিনের পরিশ্রম, যত্ন সফল হ'ল। যার সুফল তিনি দেখবার আশা করেছিলেন তা তিনি দেখতে পান নাই। বিধবাবিবাহ অনেক ক্ষেত্রেই সাংসারিক জীবনে দুঃখ লাঞ্ছনা ডেকে এনেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী এ রকম এক লাঞ্ছনার বর্ণনা দিয়েছেন—'My friend who had married the widow was beoycotted not only by his friends and relations but even by the ordinary class of Hindu servants.' [৭] সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় অনেকে যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করত। বিধবা বিবাহের খরচ যোগাতে বিদ্যাসাগরকে ঋণ করতে হয়। তাঁর আশা ছিল অনেক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের দ্বিতীয় বিবাহ কালে (বিধবাবিবাহ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এক বন্ধু তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। ঐ কন্যা বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করলে তিনি তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, "May you live long, my little daughter, may you be united to a suitable bridegroom, but then become a widow,

---

* পরিশিষ্ট ১ গ

৬। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত। পৃ ১১৮

৭। Men I have seen—Sivanath Sastri. P-9

and may I have the opportunity of getting you married again." [৮] কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'if the daughters of his friends did not become widows how was he to carry out his pet idea ? It was so unpopular amongst his countrymen.' [৯] হিন্দু সমাজ বিধবাবিবাহ স্বীকার করল না অথচ 'কুলীন কন্যাপেক্ষা বিধবা কন্যা বিবাহ করা ভাল, তাহা করিলে কত উন্নতি লাভ হইতে পারে।' [১০] ক্ষতযোনিও অক্ষতযোনি ভেদে বিবাহ ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিভিন্ন। অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-সমর্থিত। বিদ্যাসাগরও বালবিধবার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিধবাবিবাহ আইন পাস হ'লে এতে দুটি ত্রুটি সর্বাধিক সমালোচনার যোগ্য। প্রথম—বিধবাবিবাহ করলে পূর্ব স্বামীর সম্পত্তির উপর আর কোন অধিকার থাকবে না। ব্যভিচার করলে অধিকার থাকবে আর বিবাহ করলে অধিকার থাকবে না! 'বিবাহ কি ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ, ব্যভিচারও কি বিবাহ অপেক্ষা প্রশস্ততর '।[১১] বিধবার পূর্বস্বামীর সম্পত্তির অধিকারও অক্ষুণ্ণ থাকবে আইনে এ রকম উল্লেখ থাকলে অনেকেই বিধবাবিবাহে অগ্রসর হ'ত। যা হস্তগত তা ত্যাগ ক'রে ভাবী সুখের আশায় কে ছুটতে চায় ? বিধবাবিবাহ আইনের একটি ধারা যদি এ রকম হ'ত যে বিপত্নীক বা স্ত্রী পরিত্যাগীকে অবশ্যই বিধবাবিবাহ করতে হবে তাহ'লে পুরুষ ও স্ত্রী কারও মনে কোন আক্ষেপ থাকত না। সাধারণতঃ পুরুষের কুমারী কন্যা বিবাহ করার ইচ্ছা। ৫০। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধও ১৫। ১৬ বৎসরের কুমারীকে ৩য় বা ৪র্থ বার বিবাহ করে। বিধবাবিবাহে পুরুষের মনে যেন অসন্তোষ দেখা দেয়। অন্যভাবে বলা যায় বিধবাবিবাহে যে উদারতা মনের দরকার তা অনেক

---

৮। Men I have seen—Sivanath Sastri. P-8

৯। „ P. 8-9

১০। গঙ্গাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজ নামচা—
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ-১১২

১১। অসতী বিধবার বিষয়াধিকার বিষয়ে বক্তৃতা—ভবানীপুর ধর্ম্মোৎসাহিনী সভায় শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত। পৃ ৯

পুরুষের থাকে না। 'বিধবাবিবাহ বন্ধ হয় শাস্ত্রের দোহাইয়ের জন্য নয়, ও বিষয়ে মেয়েদের নিজেদেরই একটা স্বাভাবিক অনিচ্ছা আছে বলেই। এবং ওটাকে কেবল একটা বায়লজিক্যাল ব্যাপার না মনে করে, তাকে একটা আধ্যাত্মিক কাণ্ড বলেই ধারণা করে নিয়ে মনে মনে সন্তোষ লাভ করে থাকেন।'[১২]

বিধবার বিবাহ দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। উক্ত বিবাহে স্বামীস্ত্রীতে মনের মিল ঘটল কিনা দেখতে হবে। কুমারী বিবাহেও অশান্তি হয়। 'কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রাপ্ত বয়স্ক পাত্রপাত্রীর মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। এ স্থলে উভয়ের আত্মানুরূপ জীবনসঙ্গীর নির্ব্বাচন অনেকটা সম্ভবপর।'[১৩] পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ চিন্তা করে, 'সস্তা দরে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কেতাব হইলে, অনেক স্থলে তাহা ঘাঁাস খাওয়া, কালীপড়া, পাতাছেড়া, কালীচটা; থালা ঘটী হইলে ফুটো ফাটা, তালি দেওয়া; বস্ত্রাদি হইলে, রিপু করা, দিস্তেপড়া, থসথসে হয়। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গৃহিণী কিরূপ হইবেন বলা যায় না।'[১৪]

কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির দূরীকরণে বিধবা-সমস্যা অনেক কমবে। সামাজিক নিয়মে যেমন এটা এসেছে তেমন নিয়মেই চলে যেত। বিধবা সামাজিক নির্যাতন লাভ করে। বিবাহ করলে লোকনিন্দা,—ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তার উপরি পাওনা। স্ত্রীশিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থাকলে বিধবা অন্যদিকে মনঃ সংযোগ করতে পারত—এমনকি চাকুরিও করতে পারত। এখন কত বিধবা অন্যের গলগ্রহ না হ'য়ে সৎভাবে কাজ করে তার সংখ্যা নাই। বিধবার বিবাহ না দিয়ে অন্যান্য উপায়ে সৎভাবে রাখা যায়। বিধবার প্রতি পরিবারের কর্তার সহৃদয় ব্যবহার, পরিবারের শিশু সন্তান সহ বিধবার বাস, সংসারে সধবার সহিত গৃহকার্যে নিয়োগ, সংস্কৃত শিক্ষা—ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রতাদির সুযোগ দানে অর্থব্যয়ে অসঙ্কোচ, প্রভৃতি উপায় উল্লেখ কর যায়।[১৫]

১২। হিন্দু আইনে বিবাহ—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। পৃ ২৮-২৯

১৩। সমাজ সংস্কার—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন। পৃ-১৪

১৪। বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা। সমালোচক শ্রীগণ্ডুষ জল সফারি সফর। পৃ ১৬৫

১৫। পারিবারিক প্রবন্ধ—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পৃ ১৬২-১৬৬

তবে উনিশ শতকে বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থায় এ রকম ব্যবহার আশা করা যায় না। সেজন্য বিধবাবিবাহ আন্দোলন এত বেশি প্রবল হয়েছিল। বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ার পটভূমিকায় এ বিষয়ে নাটক রচিত হ'ল। সমাজে যখন পক্ষ এবং বিপক্ষ দল ছিল তখন নাট্যকারদের মধ্যেও দুদল ছিল। পক্ষের দল আবার দুভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপনা করেছেন। কেউ বা বিধবার বিবাহ দিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন এবং মিলনান্তক পরিণতি দেখিয়েছেন। আবার কেউ বা বিধবার বিবাহ না দিলে তার কুফলস্বরূপ—ব্যভিচার-দোষ, গর্ভ,—কুলত্যাগ বা আত্মহত্যা দেখিয়ে বিষাদময় পরিণতি ঘটিয়েছেন। কেউ বা একই নাটকে বিধবাবিবাহ এবং বিধবার ব্যভিচার এবং তার দোষ দেখিয়েছেন। বিপক্ষদল বিধবাবিবাহের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা ক'রে নাটক রচনা করেছেন। তবে কালের বিচারে এদেব অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। এখনও যে কয়েকটি বিধবাবিবাহ বিষয়ে নাটক এ দেশে পাওয়া যায় তার প্রায় সবগুলিই বিধবাবিবাহ পক্ষের। সামাজিক দলাদলিতে প'ড়ে বিপর্যস্ত হওয়ার ভয়ে অনেক নাট্যকার নাম গোপন রেখেছেন আর যাঁদের দু:সাহস বা সৎসাহস ছিল তাঁরা স্ব স্ব নামেই পুস্তক প্রকাশ করেছেন। যেখানে বিবাহ না হ'য়ে ব্যভিচার দোষ ঘটেছে সেখানে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব আছে। তবে নাপিতানী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি হীরা মালিনীর কাজ করেছে। আবার এমনও দেখা যায় ব্যভিচার দোষ ঘটবার উপক্রম হচ্ছে বা ঘটছে সেই অবস্থায় বিধবার বিবাহ হওয়ায় তা হ'তে নিবৃত্ত করা হয়েছে।

১। বিধবাবিবাহ নাটক :—উমেশচন্দ্র মিত্র। কলিকাতা ১৮৫৬

বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে সব নাটক পাওয়া যায় তাদের মধ্যে হাই-কোর্টের বিচারক রমেশ চন্দ্র মিত্রের অগ্রজ উমেশ চন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটককে প্রথম বলতে হয়। বিধবাবিবাহ আইন পাসের পটভূমিকায় নাটকটি লিখিত। এর কাহিনী—কীর্ত্তিরাম ঘোষের তিন বিধবা কন্যা রেবতী, রাইকিশোরী এবং সুলোচনার মধ্যে সুলোচনা যৌবন জ্বালায় জর্জরিত। কীর্ত্তিরামবাবু নিজে ষষ্ঠ পক্ষে পদ্মাবতীকে বিবাহ করেছেন অথচ যুবতী কন্যা বিধবা ব'লে বিবাহ দিতে চান না। সুতরাং প্রতিবেশী

নাপিতানী রসবতীর সাহায্যে সুলোচনার সঙ্গে প্রতিবেশী রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথর মিলন হয়। ফলে সুলোচনার গর্ভলক্ষণ দেখা দেয়। মন্মথ এবং রসবতী তার গর্ভপাতের কোন ব্যবস্থা না করায় লোকাপবাদ ভয়ে সে ক্ষোভে এবং লজ্জায় মন্মথর দেওয়া হীরকাঙ্গুরীয় সাহায্যে আত্মহত্যা করে।

নাটকটির মূল বিষয় বিধবাবিবাহ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ে পুস্তক রচনার পরে যে সামাজিক আন্দোলন চলে তাকে কেন্দ্র ক'রে এই নাটক। বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকম যুক্তি পাত্রপাত্রীর দ্বারা প্রকাশিত। রামমোহন রায়ও যে বিধবাবিবাহের পক্ষে ছিলেন তার ইঙ্গিত পদ্মাবতীর সংলাপে প্রথম অঙ্কে জানা যায়। আবার তৃতীয় অঙ্কে শাস্ত্রীয় বিচারে বিধবাবিবাহ পক্ষের যে জয় হয়েছে তা হরিহর তর্কবাগীশের উক্তিতে প্রকাশিত। সুলোচনার বিবাহ না দেওয়ায় শোচনীয় পরিণতি ঘটল। অপরদিকে প্রতিবেশী অদ্বৈত দত্তের কন্যা বিধবা প্রসন্নর বিবাহ দেওয়ায় কোন কুকীর্তি ঘটল না। তবে এ বিবাহ নিয়ে দলাদলি চলে। বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র ক'রে দলাদলির বিষয় নিয়ে পরে দলভঞ্জন নামে এক নাটক প্রকাশিত হয়। চতুর্থ অঙ্কে বিশ্বেশ্বর বসুর বাড়ীতে দিগম্বর সেন ও বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দল পাকাতে থাকে। আমরা জানি—যখন বিশ্বনাথের পুত্র গতকাল বিবাহ বাড়ীতে পরিবেষণ করেছিল আর রামদেব তর্কালঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের বিদায় নিয়ে গেছেন তখন এই দল থাকবে না। তবুও দিগম্বর সেন এরূপ আর ঘটতে দিতে চান না।

নাটকটিতে চারটি অঙ্ক আছে। দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের উল্লেখ নাই।* এতে ১ম অঙ্কে ৩টি, ২য় অঙ্কে ৭টি, ৩য় অঙ্কে ৮টি এবং ৪র্থ অঙ্কে ১০টি গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য করা চলত। প্রথম মুদ্রণে ৪র্থ অঙ্কে ১১টি গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য হ'ত। নাট্যকার ১ম অঙ্কে সূচনা, ২য় অঙ্কে অগ্রগতি, ৩য় অঙ্কে চর-মোন্নতি এবং ৪র্থ অঙ্কে তার পরের সব কিছু দেখিয়ে নাটক শেষ করেছেন। তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ না করার কারণ বলেছেন, সংস্কৃত নাটকাদিতে নান্দীপাঠ ইত্যাদি যে সকল প্রণালী

* কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় 'পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল ....' এ রকম লিখেছেন।

আছে তাহা বঙ্গভাষায় সুশ্রাব্য হয় না এজন্য পরিত্যাগ করিলাম।' নাটকটিতে স্থানঐক্য এবং গতিঐক্য বজায় থাকলেও কালঐক্য বিঘ্নিত। কারণ সুলোচনার মন্মথর প্রতি অনুরাগ, তাদের মিলন, তার গর্ভলক্ষণ —এ সব ঘটনা কয়েক মাসের হওয়াই স্বাভাবিক।

মন্মথ এই নাটকের নায়ক; তার নায়কোচিত গাম্ভীর্য ও কার্যকলাপ অপ্রকাশিত। তাকে সাধারণ ভাবে প্রেমিক বলা যায়। সে সুলোচনাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হ'লেও লোকলজ্জায় অগ্রসর হ'তে পারে না। রসবতীর দূতীয়ালিতে কাজ হয়। অদ্বৈত দত্তের বাড়ীতে প্রসন্নর বিবাহ রাত্রিতে তাদের মিলন হ'লে প্রণয়চিহ্ন স্বরূপ অঙ্গুরীয় বিনিময় মন্মথর মতে তাদের 'গন্ধর্ব বিবাহ'। মন্মথ সুলোচনাকে বিবাহ করতে চাইলেও সুলোচনার পিতার অমতের জন্য আপত্তি। মন্মথ সুলোচনার প্রতি এমনই আকৃষ্ট যে তার মান ভাঙ্গাতে সে তার পায়েও ধরে। যখন সুলোচনা তাকে অরুচি ও ঘুম ধরার কথা জানায় তখন সে স্বগত বলে, 'হা বিধাতা আমাকে এ পর্য্যন্ত শাস্তি দিলেন, সুলোচনাকে গর্ব্ভবতী দেখ্‌তে হলো! হা! অগ্রে কেন আমার মৃত্যু হলো না।' (৪র্থ অঙ্ক) এ উক্তি প্রকৃত প্রেমিকের। রসবতীর নিকটেও সে নিজেকে দোষী ব'লে প্রকাশ করে। এই অনুশোচনাই যথেষ্ট। প্রথম মুদ্রণে নাট্যকার মন্মথকে বাতুলাগারে দিয়ে তার কৃত দুষ্কর্মের শাস্তি দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ হ'তে তিনি এই অংশ পরিত্যাগ করেছেন। কারণ সুলোচনার মৃত্যুর পর আর এই অংশ ভাল লাগবে না। দ্বিতীয়তঃ সুলোচনার মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করা ঠিক হবে না।

সুলোচনা এই নাটকের নায়িকা। প্রথম অঙ্কে তার মায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় মনে হয় সে নাবালিকা। পিতামাতার সম্বন্ধে নির্লজ্জ উক্তি তার মর্মবেদনার পরিচায়ক। আবার রসবতীর সঙ্গে সংলাপে, প্রসন্নর বরের সঙ্গে আলাপে, মন্মথর সঙ্গে প্রেম বিনিময়ে এবং সুখময়ীর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসায় বুঝা যায় সে রসিকা। মন্মথর প্রতি মান ক'রে যখন সে নিদ্রার ভান ক'রে শুয়ে থাকে তখন আমরা তার প্রিয় মিলনের নতুন ভাবে মুগ্ধ হই। তার গর্ভলক্ষণ প্রকাশে সেই আনন্দ দুঃখে পরিণত। রসবতী ও মন্মথ তার গর্ভপাতের ব্যবস্থা না করায় সে মহাবিপদে পড়ে।

তবুও সে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। সুখময়ী তার গর্ভের বিষয়ে বললে সে বলেছে, 'যার বে তার মনে নেই পাড়া পড়্সীর ঘুম নেই।' (৪র্থ অঙ্ক) এটি সুলোচনার সজ্ঞান আত্মছলনা মাত্র। সুখময়ীর কথাই ঠিক 'মেয়ে মানুষের অমন রোগ হলে তাকে কথায় কেউ আঁটতে পারে না।' (৪র্থ অঙ্ক) বিষ খাওয়ার পূর্বে সুলোচনা যতই বলুক তার দুর্ভাগ্যের কারণ সে নিজেই—আমরা জানি সমাজের গোঁড়ামিই তার মৃত্যুর কারণ। 'দেশের এই দুর্নীতি রক্ষা করিতে যাঁহারা যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা কি আমাদের এই পাপের ভাগী হইবেন না?' জগদীশ্বরের নিকটে তার এই নালিশের জবাব কি সে পরকালে পাবে? যদি জবাব পায় তা হ'লে আমাদের দেশের বিধবাদের, কীর্ত্তিরামের মত পিতাদের এবং সমাজ চূড়ামণিদের জানালে ভাল হ'ত।

নাপিতানী রসবতী খল কুটনী চরিত্র। সে মেয়েদের পা কামাতে গিয়ে মন জানে। সে সুলোচনা ও মন্মথর মন জানাজানি ক'রে তাদের মিলন ঘটায়। ঐ কাজের জন্য যে রসিকতা, বাক্চাতুরী প্রয়োজন তা তার সমস্তই আছে। এমনকি এ ভাবে সে বেশ কিছু উপায়ও করে। সুলোচনার গর্ভলক্ষণ বুঝেও সে তাকে প্রতারণা করেছে। 'তোমার ভেবে ভেবে অমনতর হয়েছে, ও আপনি ভাল হয়ে যাবে।' (৪র্থ অঙ্ক) এ কথা না ব'লে যদি রসবতী প্রকৃত ব্যাপারটি তাকে বুঝিয়ে বলত এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করত তাহ'লে সুলোচনাকে মরতে হ'ত না। সুলোচনাকে গর্ভের দায় থেকে বাঁচাতে না পারলে 'এই বুড়ো বয়সে আমায় গলায় দড়ী দিয়ে মত্তে হবে।' 'আমি এ রকম অনেক দেখেছি কিন্তু এতদূর পর্যন্ত কখন দেখি নে।' —এই সব উক্তি সজ্ঞান আত্মছলনা মাত্র। বিধবার গর্ভ, আত্মহত্যা যে ঘটত তা কি রসবতীর মত কুটনীর অজানা?

কীর্ত্তিরামবাবু রক্ষণশীল হিন্দুর প্রতিনিধি। নিজে পাঁচবারের পর বিবাহ করলেও যুবতী বিধবা কন্যার বিবাহের বিরোধী। প্রথম অঙ্কেই তাঁর মনোভাব প্রকাশিত। তিনি স্বগত বলেন, 'আজ কোন কর্ম্মই হলো না, ছেলেগুলোর সঙ্গে মিথ্যা গোল করলেম। বলে কি বিধবার বিবাহ হবে, কি সর্ব্বনাশ! কি আশ্চর্য্য!' শ্যামাচরণ মিত্রের

সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ চলে। বিধবার বিবাহ না দিলে যে সব লজ্জাকর ঘটনা ঘটে তার পক্ষ সমর্থনে তিনি যুক্তি দেখান—'লুকুয়ে চুরয়ে কোথায় কে কি করে সে সমুদয় দেখ্‌তে গেলে কি কর্ম্ম চলে? প্রকাশেই সমুদয় দোষ, গোপনে কে না কি করে, কার ঘরে কি না আছে?' তিনি বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রব্যাখ্যা বুঝতে পারেন না—তাঁকে সাক্ষাৎ কলি অবতার বলতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। রামদাস বাবাজীও যখন বিধবাবিবাহের দলে গেল তখন তিনি বাবাজীর পরামর্শে দলাদলির মধ্যে না গিয়ে পরিস্থিতি দেখে বিবেচনা করবেন স্থির করেন। ৪র্থ অঙ্কে শ্যামাচরণ মিত্র বিধবা প্রসন্নর বিবাহ হওয়ার কথা ব'লে তাঁদের রক্ষণশীলতার অভিযোগ করলে কীর্ত্তিরামবাবু নতুনভাবে যুক্তি দেখান, 'আর ও কথা ভাই বলো না, আমাদের শাস্ত্রেই তো আছে শেষ সব একাকার হবে এখন তাই হতে চল্লো। ..... যাদের মানের ভয়, ধর্ম্মের ভয় আছে তারা কি এতে যাবে?' বিধবার বিবাহ দিলেও ব্যভিচার বন্ধ হবে না —এই তাঁর মত। তাঁর ইচ্ছা 'যে কটা দিন বেঁচে আছি এ কর্ম্মগুলা যেন না দেখ্‌তে হয়' —কিন্তু তিনি বেঁচে থেকেই বিধবা প্রসন্নর বিবাহ হওয়ার সংবাদ শুনেছেন এবং নিজের কন্যার প্রতি গোঁড়ামিতে তাঁর পরিবারের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, 'বিধবাদিগের বিবাহ হইলে তাহারাও এই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহাদিগের পিতামাতা আত্মীয় স্বজনেরও তাহাদিগের জন্য বিপদ গ্রস্থ হতে হয় না।' তবুও তিনি মুমূর্ষু সুলোচনাকে তিরস্কার করেন, 'পাপীয়সী, এ দেশে কি আর বিধবা নাই? তুমিই সারাজীবন ক্লেশ পাইয়াছ, আর কেহ কি ক্লেশ পায় নাই?' এখন তিনি আর অবুঝ নন। সুলোচনার 'সকলের প্রবৃত্তি সমান নয়' এ যুক্তি তিনি স্বীকার ক'রে কন্যাকে ক্ষমা করেন। তিনি নিজের ভ্রমের জন্য কন্যার নিকট ক্ষমা চান। তার মৃত্যুর জন্য প্রকারান্তরে নিজেকে দায়ী ক'রে পরমেশ্বরের নিকট তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা স্বাভাবিক।

পদ্মাবতী কীর্ত্তিরামের উপযুক্ত স্ত্রী। হিসাবে তার স্থান ষষ্ঠ হ'লেও আচার আচরণে সে স্বামীর অনুগামিনী। স্বামীর মতই সে বিধবা-বিবাহ বিরোধী। কিন্তু পুরুষে স্ত্রীলোকের মন না জানলেও স্ত্রীলোকে

স্ত্রীলোকের মন জানা উচিত। সুলোচনা যে কীর্তিরামের ভয়েই বিবাহ করতে পারছে না—টা তার অজ্ঞাত নয়। সুলোচনা তার কাছে বলেছে—

'কথায় কি যায় কভু অন্তরের ব্যথা।
বিরহেতে অনুরোধ উপরোধ বৃথা॥' —এর বেশী আর কী মায়ের কাছে বলা যায়? আবার ২য় অঙ্কে আচার্য সুলোচনার হাত দেখে একটি সন্তান—তাও শেষ রক্ষা হবে না এবং অপমৃত্যুর কথা বললেও সে তার কন্যা বিধবা ব'লে অবিশ্বাস করেছে 'পোড়াকপাল আর কি! যেমন কাল্ পড়েছে তেম্নি গণকও হয়েছে।' কিন্তু এমন ঘটনা ঘটতে সে কি দেখে না? 'সুলোচনা তো তেমন মেয়ে নয়' বললেও সে কেমন মেয়ে তা আমরা প্রথম অঙ্কেই জানি। ৩য় অঙ্কে প্রসন্নর বিবাহের কথা রসবতীর মুখে শুনে সে কতকগুলি প্রশ্ন করে। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সে বলে, 'এর কত্তে প্রসন্নকে কেন মেচো বাজারে ঘর করে দিলে না, তাও যে ভাল ছিল।' কিন্তু সুখময়ীর মুখে সুলোচনার গর্ভের সংবাদ শুনে সে বলেছে 'লোকে যে আমার বাড়ী খান্‌কীর বাড়ী বল্‌বে তা আমি শুন্‌তে পারবো না।...... তখন যদি গণকের কথায় সাবধান হতেম, তা হলে আর এ দায় ঘট্‌তো না।' সে শেষে নিজের দোষ স্বামীর উপর চাপালেও আমরা তাকে বেহাই দিতে পারি না। অন্য সময় হ'লে সে রসবতীকে এক হাত দেখে নিত কিন্তু সুলোচনার মরণ সময়ে তা হতে সে বিরত। সে কন্যাস্নেহে স্বামীকে ক্ষমা করতে অনুরোধ ক'রে কন্যার মৃত্যুতে হাহাকার করেছে। সুলোচনার মৃত্যু ও পদ্মাবতীর আক্ষেপের সঙ্গে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু এবং রেবতীর আক্ষেপ তুলনীয়। তবে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর কারণ বহিরাগত আর সুলোচনার অন্তরস্থিত—সেজন্য আরও মর্মস্পর্শী।

গৌণ চরিত্রগুলি স্বল্পপরিসরে সুপরিস্ফুট। গণক সুলোচনার হাত দেখার পূর্বে স্বগত বলেছে, 'মন্দ নয়, এঁর হাতে ধরাটাও ঘটবে।' এতে তার চরিত্রের এক বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত। হরিহর তর্কবাগীশ ও রামদেব তর্কালঙ্কার লোভী অধ্যাপক রূপে চিত্রিত। বিশ্বেশ্বর বসু, দিগম্বর সেন, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিধবাবিবাহের বিরোধী হিসাবে অদ্বৈত দত্তের প্রতিবেশী হিসাবে চিত্রিত। সুলোচনা ও সুখময়ী এই দুই চরিত্রের বৈপরীত্যে নাট্যকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে

পদ্মাবতী ও মোহিনীর বৈচিত্র্য লক্ষনীয়। তবে রামকান্ত বসু, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এই চরিত্রগুলি নাটকে না থাকলে ভাল হ'ত। চরিত্রগুলির অনেকের নাম বেশ ইঙ্গিতবহ। কীর্ত্তিরাম নিজের দলের কীর্তি রাখতে গিয়ে নষ্টকীর্তি হলেন। রসবতী রসিকা হয়ে সমাজে বাস করতে লাগল। সুলোচনা শুধু সু-লোচনাই নয়—সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, যুবতী। সুখময়ী কোন সুখেই সুখী নয়—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত বিধবা সুখময়ী মনের বাসনা মনে রেখে সুখময়ী। মন্মথ মন্মথ হয়ে সুলোচনাকে দেখে প্রেমে প'ড়ে যত অনর্থ ঘটাল।

নাটকটিতে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব স্পষ্ট। আবার সেকালের যাত্রা-রীতিরও এতে প্রভাব রয়েছে। হাস্য, করুণ শৃঙ্গার, বীভৎস প্রভৃতি রসের স্ফূর্তি ঘটলেও নাটকটিতে সুলোচনার মৃত্যুতে করুণ রস প্রধান হয়েছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে কীর্ত্তিবিলাস নাটক প্রথম ট্র্যাজেডি হ'লেও নানাকারণে এটি সার্থক নয়। সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হ'লেও অন্যান্য অনেক নাটকের মত প্রথম মুদ্রণেই বিধবাবিবাহ নাটকের প্রকাশ শেষ হয় নাই। জনপ্রিয়তার জন্য চতুর্থ মুদ্রণও হয়েছিল। প্রথম মুদ্রণে বীভৎস রস অঙ্গীরস কিন্তু চতুর্থ মুদ্রণে করুণ রস অঙ্গীরস। নাটকটির কিছু ত্রুটি লক্ষণীয়। প্রথম অঙ্কে শ্যামাচরণ কীর্ত্তিরাম ঘোষকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনার পুত্রেরা কোথা, এখনও কি স্কুল হতে আসেন নাই?' তাঁর কয় পুত্র? সুখময়ী তাঁর কোন্ পুত্রবধূ? আবার চতুর্থ অঙ্কে সুলোচনা মৃত্যুর পূর্বে 'দিদিরা তোমরা কোথা, তোমাদের হাত দেও।' এ কথা বলেছে। তার দিদিরা কি রেবতী ও রাইকিশোরী? নাটকটিতে মনে হয় সুলোচনাই বড়। প্রথম অঙ্কে পদ্মাবতী কীর্ত্তি-রামবাবুর নিকটে বলেছে 'বৌগুলি মেয়েগুলি সব সমান' কিন্তু তার বৌগুলি কই? আমরা কেবল সুখময়ীকে দেখি। চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে বিশ্বেশ্বর বসুর বাড়ীতে বিশ্বেশ্বর দিগম্বর সেনকে 'সেনজা, এখন হিঁদুয়ানী নে ধুয়ে খাও...' ইত্যাদি বলার পর দিগম্বর সেনও তামাক খেতে খেতে তাকে বলে, 'ওহে সেনজা একটা বে হয়ে গেল বলে কি হিঁদুয়ানী গেল?' বিশ্বেশ্বর বসু ছিল সেন হ'ল কি ক'রে?

নাট্যকার দ্বিতীয় মুদ্রণের আশা না করলেও দ্বিতীয় বার মুদ্রণের

প্রয়োজন হওয়ায় ১২৬৪ সালের ২৫ ভাদ্র বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—'......বিধবাবিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা যত প্রমাণ হউক বা না হউক সকলে যে এই পুস্তক যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তাহাতেই আমাকে সাধারণ সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইয়াছে।' দ্বিতীয় মুদ্রণে কিছু প্রিবর্তন করা হয়েছে। তৃতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রে শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন '......যে কয়খানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটক আছে, বিধবাবিবাহ নাটকখানি তাহার মধ্যে পরিগণিত। বস্তুতঃ ইহার রচনা প্রণালী অতি চমৎকার।'... স্ত্রী চরিত্রের সংলাপকে আরও কথ্য করার জন্য কিছু পরিবর্তন করা—হয়। ব'লে প্রকাশক জানিয়েছেন। অন্য বিষয়ে পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকলেও কেন করেন নাই তার কারণ জানিয়েছেন—'only because the work, as it is, has grown too familiar to the public' বিজ্ঞাপনে comedy এবং tragedyর পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে। 'A comedy can never well attempt to alter popular opinions. A tragedy in most cases can and that for obvious reason.' সুলোচনার শোচনীয় পরিণতি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মর্মস্পর্শ করে। এর পর বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। এই হিসাবে বিধবাবিবাহ নাটকখানির সামাজিক মূল্য এবং নাট্যমূল্য অনেক।

সুলোচনার মৃত্যুকালে দীর্ঘ স্বগতোক্তির ত্রুটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রকাশক লেখকের পক্ষে লিখেছেন, 'The author admits that the style of the passage alluded to it is not in exact keeping with the rest, but as his object chiefly was to make an impresion, he decided on sacrificing dramatic purity to what he conceived would Produce effect.' ১২৮৫ সালে নাটকটি কলকাতা জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেস, ২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট হ'তে পরিশোধিত ও চতুর্থ বার মুদ্রিত। প্রথম ও চতুর্থ মুদ্রণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১ম মুদ্রণে ৩য় অঙ্কে পাঠশালায় রামদাসের উক্তিতে 'অদ্বৈত দত্তের কন্যার বিবাহ'

আছে। আর ৪র্থ মুদ্রণে 'অদ্বৈত দত্তের কন্যার বিবাহ' আছে। ৩য় অঙ্কেই প্রসন্নর বিবাহ প্রসঙ্গে সুলোচনা সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া)— 'ভাই এ বে দেখ্‌তে যেতে হবে।' এ রকম লেখা আছে কিন্তু ৪র্থ মুদ্রণে সুলোচনা ( সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া ) 'ভাই এ বিয়ে দেখতে যেতে হবে।' এ রকম লেখা। চতুর্থ অঙ্কে সুলোচনার মন্মথর সহিত মিলনের ব্যগ্রতায় প্রথম মুদ্রণে—

তাঁহারি বচন সুধা সুখে করি পান।
বিরহ পিপাসা হতে পাব পরিত্রাণ॥ —এই দুই পঙ্‌ক্তি

পয়ার দুবার থাকায় মোট ৩০ পঙ্‌ক্তি পয়ার হয়েছে কিন্তু ৪র্থ মুদ্রণে এই অংশ একবার ব্যবহৃত হওয়ায় মোট ২৮ পঙ্‌ক্তি পয়ার হয়েছে। ১ম মুদ্রণে ৪র্থ অঙ্কে সুলোচনার 'হাঁ অসুখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছি, আমি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী নহি, পতিভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারিব না, এই বিষয় প্রকাশ হইলে লোকে আমাকে ব্যভিচারিণী বলিবে, এইজন্য অন্তঃকরণে সন্দেহ হইতেছে।' এ রকম উক্তি আছে। চতুর্থ মুদ্রণে এই উক্তি 'হাঁ অসুখের কারণ বুঝ্‌তে পারছি। আমি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী নহি. পতিভাবে তাঁকে চিন্তা করতে পার্‌ব না, এই বিষয় প্রকাশ হলে লোকে আমাকে ব্যভিচারিণী বল্‌বে, এই জন্য অন্তঃকরণে সন্দেহের উদয় হচ্ছে।' চতুর্থ অঙ্কে সুলোচনার গর্ভ হওয়ার কথায় সুলোচনা সুখময়ীকে বলেছে 'আমার পেট হলো আমি জান্‌তে পাল্লেম না, আর কেউ জান্‌তে পাল্লে না, কেবল তুই জান্‌তে পাল্লি?' ( ১ম মুদ্রণ ) চতুর্থ মুদ্রণে এ কথা বলার পর বিস্ময় সূচক চিহ্ন আছে। এর পরই সুখময়ী প্রথম মুদ্রণে বলেছে 'তুই তো কম মেয়ে নয়, আবার চোপা করিস?……মেয়ে মানুষের অমন দশা হলে তাকে কথায় কেউ আটতে পারে না।' চতুর্থ মুদ্রণে সুখময়ী বলেছে 'তুই তো কম মেয়ে নস, আবার কথা কচ্চিস্‌!…… মেয়ে মানুষের অমন রোগ হলে তাকে কথায় কেউ আঁটতে পারে না।' বলাই বাহুল্য এ সব ক্ষেত্রে ১ম মুদ্রণ অপেক্ষা ৪র্থ মুদ্রণ প্রশংসার দাবী করে।

নাটকটি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হ'লেও এর অভিনয় হয় বেশ কিছুদিন পরে। অনুমান এ রকম এক সামাজিক নাটক অভিনয়ের

দায়িত্ব নিতে কেউ সম্মত হতে চায় না ব'লেই এই বিলম্ব। প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল শনিবার—কলকাতার চীৎপুরে সিঁদুরিয়াপটিতে রামগোপাল মল্লিকের বাড়ীতে। নাট্যশালার নাম মেট্রোপলিটন থিয়েটার। এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন 'In fact there was scarcely a dry eye in the great audience. Undoubtedly the most wholesome effect was produced.'[১৬] মজুমদার নিজেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'পরবর্তীকালের বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে নায়িকার ভূমিকা লইয়াছিলেন।'[১৭] কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্যের যথেষ্ট যশলাভ সত্ত্বেও নীতিতে মিল না হওয়ায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন 'He and his companions were often thrown into heterogenous company; some of the parts played were undoubtedly harmful in their moral tendency, there was intentable disposition, frivolity, and a dangerous love of public applause'[১৮] পরবর্তীকালে (১৮৭৭ খৃঃ) গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে এই নাটকের পুনরায় অভিনয় হয়। 'সে সময়ে কর্তার ভূমিকা অভিনয় করিতেন—রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর। কর্তা dispeptic, ক্ষুধা হয় না, আহারে অরুচি। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন, দিন দিন রকমারি করিয়া আহার করিতে পারিলে, একটু একটু ক্ষুধাও বাড়বে—আহারে রুচিও হবে।

একদিন অভিনয়কালে—আহারে বসিয়া, কর্তাবেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু গিন্নীকে বলিতেছেন, "দিন দিন এক ঘেয়ে খাবার না ক'রে পাঁচদিন পাঁচ

---

১৬। The life and teachings of keshub Chunder Sen—
P. C. Mozoomdar, P. 67

১৭। দৃশ্য কাব্য পরিচয়—শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। পৃ-৩১।

১৮। The life and teachings of keshub Chunder Sen—
P. C. Mozoomdar. P. 68

রকম কবতে পার না ?" অবশ্যই একথা নাটকে নাই। গিন্নীও বানাইয়া বলিলেন, "কি রকম ক'র্‌বো বল ?" "কর্ত্তা"-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, "হলো পরমান্নে একদিন একটা কই মাছ ছেড়ে দিলে !" [১৯]

২। বিধবা বিষম বিপদ—অজ্ঞাত। ১৮৫৬

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় অজ্ঞাতনামার বিধবা বিষম বিপদ নাটকটিকে উক্ত বিষয়ে আইন পাস হওয়ার পরবর্তী নাটকগুলির প্রথম ব'লে মনে কবেছেন।[২০] নাটকটির প্রকাশ কাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট। এতে মুখোপাধ্যায় এবং চট্টোপাধ্যায় এই দুই কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা বিবাহ নিয়ে দুই ভিন্ন মনোভাব প্রকাশিত। চট্টোপাধ্যায় এক কুলীন পাত্রের সঙ্গে তাঁর তিন কন্যার বিবাহ দিলে বৎসরের মধ্যেই ঐ পাত্রেব মৃত্যু হওযায় তিন কন্যাই বিধবা হয়। বিধবাবিবাহ যখন শাস্ত্র সম্মত তখন তিনি তাঁব কন্যাদের আবার বিবাহ দিতে চান। একই অবস্থায মুখোপাধ্যায়েব দুই কন্যাও বিধবা। কিন্তু তিনি বিধবাবিবাহের বিরোধী। ফলে কন্যা প্রসন্নময়ীর অবৈধ প্রণয়ের দরুণ গর্ভসঞ্চার হওয়ায় তাঁব সামাজিক সম্মান ধূলিসাৎ হয়।

উমেশ চন্দ্র মিত্রেব বিধবাবিবাহ নাটকে কুলীন কায়স্থকুলের বিধবা-বিবাহের বিষয় চিত্রিত। কাবণ কায়স্থকুলে ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিনটি কুলীন ব'লে পরিচিত। পূর্ব অঞ্চলে গুহও কুলীন ব'লে চলত। সুতরাং কীর্ত্তিরাম ঘোষকে কুলীন মনে করা অসঙ্গত নয়। বিধবা বিষম বিপদ নাটকে কুলীন ব্রাহ্মণের বিষয় বলা হয়েছে।

৩। বিধবা মনোরঞ্জন ( দুই ভাগ ) শ্রীরাধামাধব মিত্র।

(ক) প্রথমভাগ কলি. সন ১২৬৩, ৮ পৌষ (খ) দ্বিতীয় ভাগ কলি শকাব্দা ১৭৭৯। বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ার আগে ও পরের নাটকের বিষয় বলা হয়েছে। প্রথম বিধবাবিবাহ ঘটে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। প্রথম বিধবাবিবাহের পটভূমিকায় শ্রীরাধা-মাধব মিত্র বিধবা মনোরঞ্জন নাটক রচনা করেন। নাটকটির দুটি ভাগ। এর কাহিনী—রামনিধি ন্যায়রত্নের বিধবা কন্যা কুমুদিনী, দুঃখহর ঘোষের

---

১৯। রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথা—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পৃ ৮০

২০। অমৃত পত্রিকা। ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা।

বিধবা ভগিনী বিনোদিনী যৌবন জ্বালায় অস্থির হ'লেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়ায় বিবাহ করতে পারছে না। কুমুদিনীর পিতা কলকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবাবিবাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে সেখানে দান নিয়ে বাড়ী এসে কন্যার বিবাহ দিতে চান। বিলাসিনী নামে বৈষ্ণবী ঘটকীর কাজ করে। পাত্র নিশ্চিন্তপুরের রামেশ্বর তর্কবাগীশের পুত্র চন্দ্রকান্ত। ঐ পাত্র ন্যায়রত্নের মনোমত হওয়ায় নির্দিষ্ট দিনে কুমুদিনীর সঙ্গে চন্দ্রকান্তের বিবাহ হয়।

মঙ্গলাচরণে জগদীশের জয়গান গাওয়ার পর 'শ্রীঈশ্বরোজয়তি'তে ঈশ্বরকে (ঈশ্বরচন্দ্রকে?) ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ায়—

মুখে জয় জয় রব, নবীন বিধবা সব,
ঈশ্বরে দিতেছে ধন্যবাদ।

বিধবারা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে 'বিধবাতারণ' বললেও অন্যপক্ষ নীরব ছিল না। তারা একে কলিকালের লক্ষণ বলেছে। সুতরাং তারা আক্ষেপে বলে—

পাপেতে মজিল ধরা, জীবন না যায় ধরা,
মরিলেই বাঁচি মানে মানে ॥

কিন্তু মরতে কেউ সহজে চায় না। ফলে—'দলাদলি মহাঝড়, কতস্থানে বয় রে ॥' প্রথম বিধবাবিবাহ ঘটতে কিছু বিপত্তি ঘটেছিল ব'লে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশত্যাগী হয়েছেন—এ রকম লোকাপবাদ রটে। কিন্তু কুমুদিনী তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার উল্লেখ করে। ন্যায়রত্ন কলকাতা ফিরে এসে কন্যার বিবাহ দিতে চান। নীলরতন মুখোপাধ্যায়ও দুই বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁর খুল্লতাত বিধবাবিবাহের বিরোধী। তিনি ন্যায়রত্নের কাছে যে শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় দেন তা শুধু হাস্যকরই নয়—তাতে বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষগণকে হেয় করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়—যুবতীবিধবা কন্যা অন্যাসক্তা হয়ে গর্ভবতী হবে—ভ্রূণহত্যা করবে কিংবা কুলত্যাগিনী হবে তাতেও তারা স্বর্গসুখের কল্পনা ক'রে বিধবাবিবাহ দিবে না। প্রথম বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নমুনা এই নাটকে পেলেও এখানে বর, কন্যা প্রভৃতির নাম গোপন ক'রে অন্যভাবে বলা হয়েছে।

বিধবা নবৌ বিপত্নীক দুঃখহরকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেও উচ্চ হিন্দু সমাজে ঐ বিবাহ প্রচলিত নয়। কুলীন কন্যাব সংলাপে তাদের দুঃখের কথা প্রকাশিত। কুলীন কন্যাগণ সধবা হ'য়েও বিধবার মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ভাগে বিনোদিনীকে দুঃখহবেব বিষয় নিয়ে নবৌ যে রসিকতা করে তা নীতিবিরুদ্ধ হ'লেও রীতিবিরুদ্ধ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেন বিংশ শতাব্দীতেও এ ধরণের রসিকতা শোনা যায়। বিশ্বজয়ী ও বিশ্বঠক এই ঘটক দুজনের ভণ্ডামি ও কলহে সেকালেব ঘটকেব কীর্তিকলাপ জানা যায়। বিলাসিনী ঘটকী ন্যায়রত্ন পত্নীর কাছে সমাজের অনেক কিছু বলে—'মেয়ে সস্তা হোয়েছে, বর মাগ্যি, যাব মেয়ে আছে তার সর্ব্বনাশ, আর যাব ব্যাটা আচে তার পৌষ মাস্।' 'এখন তো আর কুলীন মৌলিকের বিবেচনা নেই, যার টাকা আচে সেই কুলীন, যার টাকা নেই মা সেই মৌলিক। বেটার বে দিলে জিনিষ পত্রে ঘরকন্না পূরে যায়, আর মেয়ের বে দিতে গেলে ফকীর হোতে হয়।' বিদ্বান না হ'লে বিধবা-বিবাহ করতে চায় না। উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর বিবাহে উভয়পক্ষ হ'তেই তার পাওনার আশা। সে ব্রাহ্মণকন্যা—অকালে বিধবা হ'য়ে বারনারী হয়। পরে উদরান্নের জন্য বৈষ্ণবের সেবাদাসী হয়েছিল। সে ত্যাগ করলে সে ভিক্ষা করতে আরম্ভ করে। এখন সে ঘটকালি করছে। অসবর্ণ বিবাহের ইঙ্গিত এ নাটকে পাওয়া যায়। ন্যায়রত্ন বিলাসিনীকে বলেছে, 'বলে রাঢ়ের বে তার আর জেতের বিচার কি? ......যে জেতে ইচ্ছে সেই জেতে বে হবে সেদিন এখনো হয়নি, ওটা যদি আপাতত চলিত থাক্‌তো তাতেই বা কি হানি ছিল?' পাত্র দেখতে গিয়ে কানাইলালের পাত্রের বিদ্যাপরীক্ষা বেশ সুন্দর। কানাইলাল—

Who takes a widow for his wife.
Will lead a very happy life.

এই দুলাইন ইংরেজী কবিতা ব'লে পাত্রকে বাংলা পদ্যে অনুবাদ করতে বললে চন্দ্রকান্ত ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—

বিধবা নারীকে জায়া করেন যে জন।
করিবেন সুখে তিনি জীবন যাপন॥

বিলাসিনীর মারফত কুমুদিনী ও চন্দ্রকান্তের পত্র বিনিময়ের দ্বারা তাদের পরস্পর অনুরাগ সৃষ্টি ক'রে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ বিবাহ শুধু বিধবাবিবাহ নয়—রোমাণ্টিক বিবাহও বটে।

মহালোভ ভট্টাচার্য এবং পরদ্বেষী গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহে বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করলেও ন্যায়রত্ন গ্রামের বাসিন্দা ব'লে গ্রামের লোকের চরিত্র জানেন। তিনি তাঁর ভাগিনেয় মারফতে মহালোভকে কুড়ি টাকা দিলে মহালোভ বিধবাবিবাহের পক্ষে আসেন। পরদ্বেষী তাঁর এই মত পরিবর্তনের জন্য তিরস্কার ক'রে নিজের কৌলীন্য নিয়ে গর্ব করলে মহালোভ কুলীনদের কুলের কথা বলতে থাকে।

বিধবাবিবাহের আচার প্রথম বিবাহের মত। সুতরাং বিধবার বিবাহে বিধবাদের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না; পাছে কন্যা আবার বিধবা হয়। পদ্মিনী শ্রীশুদ্ধ বরণ ডালা আনতে আনতে পড়ে গেলে শ্রী বেঁকে যায়। বড় গিন্নিকে তা সোজা করতে বলায় সে ঐ কারণে আপত্তি জানায়। বিশ্বনিন্দক মিশ্রি নামে জনৈক বরযাত্র এবং মিশ্রিদমন নামে জনৈক কন্যাপক্ষের বিবাদ ও এক সামাজিক বিষয়। বাসরঘরে বড় গিন্নি, রসিকা, পদ্মিনী, হেমলতা প্রভৃতির রসিকতা সেকালের এক বিশেষ সমাজচিত্র।

নাটকটির দুটি ভাগ। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের কোন উল্লেখ নাই। প্রথমভাগে কুমুদিনীর বিবাহের উদ্যোগ; দ্বিতীয়ভাগে বিবাহ। প্রথম ভাগে উপকাহিনীতে বিনোদিনী ও নবৌয়ের বিবাহের উদ্যোগের উপস্থাপনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে নবৌকে বিবাহ করতে দুঃখহর অস্বীকার করলে সে হতাশ হয়। কিন্তু উপযুক্ত বরের আশ্বাসে সে আশ্বস্ত। নবৌকে কেন্দ্র ক'রে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু নাট্যকার মিলনান্তক নাটক রচনা করতে ব'সে তা পরিহার করেছেন। সংস্কৃত নাটক ও প্রাচীন যাত্রা রীতির প্রভাব এতে লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলাচরণ, পূর্বে গদ্য সংলাপ পরে পদ্য বা তার বিপরীত-ক্রমে একই ভাব বা বিষয় প্রকাশিত। গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের উল্লেখ না থাকলেও কলকাতার সন্নিকটস্থ কোন *পল্লীগ্রাম*—রামনিধি ন্যায়রত্নের বাটী, অন্য পাড়ার ঘোষেদের বাটী এবং নিশ্চিন্ত পুরে রামেশ্বর তর্কবাগীশের বাটী সংযোগস্থল বা ঘটনাস্থল

ব'লে উল্লেখ আছে। নাটকটিতে স্থান ঐক্য বজায় আছে। বিশ্বঠক এবং বিশ্বজয়ী এ দুজনের আগমন না ঘটালে ঘটনার দিকেও কোন ত্রুটি থাকত না। জগদীশের বন্দনার পর আমরাও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জয়ধ্বনি দিতে পারি।

কুমুদিনীকে নায়িকা এবং চন্দ্রকান্তকে নায়ক বলতে হয়। তবে নায়িকা যে ভাবে সক্রিয় নায়ক সেভাবে সক্রিয় নয়। সে রোমান্টিক নাটকের নায়ক রূপে চিত্রিত। নাটকটির প্রথম ভাগের একেবারে প্রথমে কুমুদিনী ঘোষেদের বাড়ী বেড়াতে যেতে চায় ব'লে তার মায়ের তিরস্কার স্বাভাবিক। কারণ 'একে রাঁড়, তায় সমত্তো বয়েস্ (গালে হাত দিয়া) ছি! ছি! ব্যাড়াতে যেতে লজ্জা করে না, লোকে দেক্‌লে বল্‌বে কি?' মুখ ফুটে সে বলেও ফেলে,

'কি ভাবে ব্যাড়াতে চাস্, কি ভেবে বাহিরে যাস্,
বুঝিতে না পারি কিছু, বুঝি শেষে ঢলাবি।'

এই অংশ ড্রামাটিক আয়রনি রূপে ব্যবহৃত হ'য়ে বিধবাবিবাহ নাটকে সুলোচনার মত করুণ পরিণতি ঘটাতে পারত। নবৌ, বিনোদিনী, ব্রাহ্মণী, বিলাসিনী, বড়গিন্নি প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ। মণি দাসী, ভৃত্য রামধন, কানাইলাল, বনমালা, বিশ্বজয়ী, রসিকা, হেমলতা, নলিনী, পদ্মিনী, মহালোভ, পরদ্বেষী, নম্রস্বভাব, বিশ্বনিন্দক মিশ্রি, মিশ্রিদমন ও নরসুন্দর সুচতুর তাদের অংশ নিয়ে নাটকটির মূল বিষয়ে আলোকপাত করেছে। দুঃখহরের বিপত্নীক জীবনের দুঃখ অনুদ্‌ঘাটিত থাকায় তার চরিত্রের সামগ্রিক রূপ আমরা দেখতে পেলাম না। সহোদরারও নবৌয়ের বিবাহ দিতেই সে এখন ব্যস্ত।

নাটকটিতে গদ্য এবং পদ্য সংলাপ আছে। গদ্য সংলাপে চলিত ভাষা এবং পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত। প্রথম ভাগের ৩৩ পৃষ্ঠায় ন্যায়রত্নের গদ্য সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষায় মিশ্রণ ঘটেছে। ন্যায়রত্ন, কুমুদিনী, বিনোদিনী, পদ্মমুখী, নবৌ, দুঃখহর, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি অনেকের মুখেই গদ্য এবং পদ্য সংলাপ শোনা যায়। প্রথম ভাগের ১২ পৃষ্ঠায় কুমুদিনীর পয়ারে, দ্বিতীয় ভাগের ৪৫ পৃষ্ঠায়

মহালোভের ত্রিপদীতে আলঙ্কারিক ভাষার নিদর্শন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা স্মরণ করায়। নাটকটির ৬ পৃষ্ঠা হ'তে ২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধবা মনোরঞ্জন স্থলে ভুলক্রমে বিধবা মনোরঞ্জিনী হ'য়ে গেছে ব'লে লেখক বিজ্ঞাপনে স্বীকার করেছেন। নাটকটির প্রথমভাগে ২৬ পৃষ্ঠায় ন্যায়রত্ন মুখোপাধ্যায়কে প্রথম বিধবাবিবাহের প্রমাণ দিতে কুমুদিনীকে 'বাসকো' আনতে বললে কুমুদিনী আনন্দিত হয়। সে হাস্যবদনে বাক্স আনল ন্যায়রত্ন বলেন 'কুমুদিনী আজ এত হাস্‌চিস্ কেন গা? কিসের আহ্লাদ হোয়েচে।' কুমুদিনী '(লজ্জা প্রযুক্ত দ্রুত গমনে ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে) না—না, কৈ বাবা, না—না, হি—হি হি হি হি।' এ রকম লেখা আছে। এতে কুমুদিনীর নির্লজ্জতা প্রকাশিত। উনিশ শতকে কেন বিশ শতকেও এ রকম কুমুদিনী আছে কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণীও বাস্তবতার গণ্ডী লঙ্ঘন করেছে। তার '(কপাটের অন্তরাল হইতে) হাস্‌বে না কেন? হাসির কতাইত বল্‌চ, বের নাম শুন্‌লে কার না আহ্লাদ হয়?' —এ ভাবে মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পিতার নিকটে কন্যার আনন্দের কারণ ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভব? প্রথম ভাগের প্রথমে পাত্রপাত্রীর পরিচয় না থাকার অসুবিধা দ্বিতীয় ভাগের প্রথমে পরিচয় লিপিতে দূর করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের ৩৬ পৃষ্ঠায় বিলাসিনী কুমুদিনীর পিতাকে আগামীকাল বর দেখাতে নিয়ে যাবে ব'লে প্রস্থান করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিলাসিনীর তাঁকে নিয়ে প্রবেশ এবং তার উক্তি '(প্রাতঃকালে) ওটোগো, ন্যায়রত্ন মশাই ওটো, অনেকক্ষণ রাত পুই-য়েচে, রোদে কাই ফাট্‌চে।' —এতে একটু দোষ লক্ষ্য করা যায়। কুমুদিনীকে শিক্ষিতা প্রতিপন্ন করতে তাকে দিয়ে পাত্রকে চিঠি লিখিয়ে বিলাসিনীর সাহায্যে তা পাঠানো এবং চন্দ্রকান্তের তার উত্তর দেওয়া সম্ভব কি? দ্বিতীয় ভাগের ৪১ পৃষ্ঠায় চন্দ্রকান্ত কুমুদিনীর সম্বন্ধে আরও জানতে চাইলে বিলাসিনী ত্রিপদীতে দীর্ঘ বিবরণ (পৃ ৪১-৪২) দেয়। কিন্তু এই বিবরণ যে বিলাসিনীর উক্তি তা লেখা না থাকায় চন্দ্রকান্তের উক্তি ব'লে মনে হবে। এ রকম আরও ত্রুটি আছে তবে নাট্যকারের দ্বিতীয় ভাগের শেষে বিজ্ঞাপনের অনুরোধক্রমে এবং মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ এই সাধুবাক্য মনে রেখে দোষত্রুটি আর না ধ'রে কিছু গুণের কথা উল্লেখ

করি। এই নাটকটির প্রথম ভাগ সন ১২৬৩ সালের ৮ই পৌষ এবং দ্বিতীয় ভাগ শকাব্দাঃ ১৭৭৯ তে প্রকাশিত। এই নাটকটিতে পূর্বে আলোচিত বিধবাবিবাহ নাটক এবং বিধবা বিষম বিপদ নাটক হ'তে বিষয়বস্তুতে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত। প্রথমটিতে ঘোষ ও দত্ত পরিবারে বিধবাবিবাহ বিষয়, দ্বিতীয়টিতে মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় পরিবারে বিধবাবিবাহ বিষয় স্থান পেয়েছে। এই নাটকটিতে একই সঙ্গে ঘোষ এবং ন্যায়রত্ন পবিবারের বিধবাবিবাহ বিষয়বস্তু। এতে পৌরাণিক নাটকের লক্ষণে স্বভাব অনুসারে চরিত্রের নাম আছে। বিশ্বঠক, বিশ্বজয়ী, মহালোভ, পরদ্বেষী, নম্রস্বভাব, বিশ্বনিন্দক মিশ্রি, মিশ্রিদমন প্রভৃতি নাম এর প্রমাণ। কুমুদিনী চন্দ্রালোকে প্রস্ফুটিত হয়। নায়িকা কুমুদিনীও চন্দ্রকান্তের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সুখী হোক এই কামনা। নাট্যকার বিধবা কুমুদিনীর মনোরঞ্জন ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছেন। বিধবা নবৌ এবং বিনোদিনীব মনোবঞ্জন না করতে পারলেও নামকরণ বিধবা মনোরঞ্জন সার্থক। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দি পার্সিকিউটেড নাটকের অনুবাদ—উৎপাড়িত নাটকের ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে মহাদেব বাবু তাঁর পুত্র বাণীলালকে বহিষ্কার করতে সম্মত না হ'য়ে ঘুষ স্বরূপ তর্কালঙ্কারকে কিছু টাকা দেন। ঐ টাকার ভাগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাবাগীশের বচসা হয়।

'বিদ্যা। ...বদমাস, আমি তোর সব চালাকি প্রকাশ করে দেব। যত শিষ্য যজমান তোর আছে—সবার কাছে তোর স্বভাব চরিত্তির ফাঁস করে দেব।

তর্কা। যা যা, বেইমান জানোয়ার—বলগে যা। যা ইচ্ছে কর—আমি গ্রাহ্য করি না।' ২১

এই অংশের সঙ্গে এই নাটকের অংশ বিশেষের সাদৃশ্য আছে। বিধবা বিবাহও ন্যায়রত্নের প্রতি মহালোভের বিরূপ মনোভাব ছিল কিন্তু কুড়ি টাকা পাওয়ার পর তার মনোভাব পরিবর্তনের ফলে পরদ্বেষী তাকে—

'ফলারে নিপুণ, ফলারে বামুন,
হেথা বোসে কেন আর।

২১। গণনাট্য—আশ্বিন ১৩৮০

নিলে যার ধন, ত্বরায় এখন,
গিয়া গাও যশ তার ।।' —এই ব'লে তিরস্কার
করে। পবদ্বেষী নিজের কৌলীন্য নিয়ে গর্ব কবলে মহালোভ বলে, 'তার রাঁড় মেয়ের বে দেবে শুনে চম্‌কে উট্‌চো, তোমাদের মেয়েদের কি হয়, তা জাননা বুঝি? কারো রোজ রোজ যে বে হয়…?' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুসমাজ দ্বারা উৎপীড়িত হ'য়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভণ্ডামি, অর্থলাভ হাডে হাড়ে বুঝেছিলেন আর রাধামাধব মিত্র—হিন্দু সমাজেই থেকে একই বিষয় মর্মে মর্মে অনুভব কবেছিলেন। নাটকটির কোথাও অভিনয হয়েছিল বলে জানা নাই। এটি জনপ্রিয় হয়েছিল ব'লেও মনে হয় না। কারণ এর আর কোন সংস্করণ হয়েছিল এ রকম বিবরণ ও পাওয়া যায না।

৪। চপলা চিত্ত চাপল্য—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা, সম্বৎ ১৯১৪

পদ্যপাঠের কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ১৯১৪ সংবৎ ১০ ভাদ্র ( ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ) চপলা চিত্ত চাপল্য নামে একখানি নাটক প্রকাশ কবেন। এর কাহিনী—একমাত্র কন্যা চপলার বৈধব্যে সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী বাসব রায় এবং তাঁর স্ত্রী পার্ব্বতী শোককাতর। বাসববাবু তাঁর গোমস্তার বিধবা স্ত্রী তারামণির দুববস্থা জেনে এবং তিলক বিশ্বাসের কন্যার গর্ভপাতের কথা দেওয়ান রাঘব মজুমদারের মুখে শুনে বিশেষ চিন্তিত। তর্কালঙ্কার তাঁকে শাস্ত্র সম্মত কাজ করতে উপদেশ দেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থাদিও তিনি পাঠ করেছেন। এ জন্য তিনি সুদেবকে ভূদেব ব্যানার্জীর পুত্রকে পাত্র হিসাবে স্থির করতে এবং গোপনে ভূদেবের সম্মতি নিতে বলেন।

অন্যদিকে চপলার যাতে চিত্তচাপল্য না ঘটে সেজন্য তার মনকে পুণ্যকর্মে নিয়োগ করা হ'লেও কৃষ্ণকথায় তার মন বসছে না। গোপনে চপলা চারুচন্দ্রকে ভালবেসে মালিনীর সাহায্য নিয়েছে। তাদের বিষয়টি আর বেশী দূর অগ্রসর হ'ল না; সুদেব ভূদেবের পুত্র ঐ চারুচন্দ্রের সঙ্গেই তার বিবাহের স্থির করায় তাদের বিবাহ হয়।

বিজ্ঞাপনে এই নাটক লেখার সময়ে নাটকের প্রতি বঙ্গভাষী ব্যক্তি-

গণের অনুরাগ ছিল, বিধবাবিবাহ নির্বাহ হওয়ার পূর্বে এটি লিখিত, মুদ্রণের বিলম্বেও প্রথমে যে রূপ সেরূপেই প্রচারিত, বিধবাবিবাহের পক্ষে রচিত এবং নাট্যকার এর অভিনয় সাফল্যের আশা না ক'রে কেবল সকলে এক এক বার পাঠ ক'রলে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হবে—এ কথা লিখেছেন। চপলার চিত্তচাপল্য ঘটলেও শেষ পর্যন্ত নাট্যকার তা'র সঙ্গে পূর্বরাগাসক্ত চারুচন্দ্রের বিবাহে বাসববাবুর মান এবং তাদের মন রাখলেন। যদি তাদের বিবাহ না হ'ত তা হলে সামাজিক ব্যভিচার এবং অন্যান্য দোষ ঘটত। এ দিক বিচারে নাটকটির নামকরণ সার্থক। '......ইহার প্রচারে মুদ্রাকর ভিন্ন কোন ব্যক্তির উপকার হইবে এ মত বোধ হয় না।' ২২ —এই মত স্বীকার করা যায় না। যুবতী বিধবাকে ধর্মকথায় না ভুলিয়ে তার বিবাহ দিলে সুফল ফলে—এই সত্য নাটকটিতে উদ্‌ঘাটিত। উচ্চ হিন্দুসমাজে বাসব রায় ও ভূদেব ব্যানার্জীর মত ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য।

বাসব রায়ের পুরোহিত চপলার ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ দিলেও তিনি জানেন ঐ ভাবে কন্যার চরিত্র ঠিক রাখা যায় না। আবার অনাগতের এক পাত্রে তার তিন কন্যা সম্প্রদান করতে চাওয়ায় বাসববাবু পরিণতির কথা বলেন-'একটি জামাতার যদি কাল হয়, তবে তিনটি কন্যা বিধবা হবে। আমি এক কন্যা বিধবা হওয়াতে যেরূপ মনোদুঃখ পেতেছি আপনি তা হোলে তার ত তিনগুণ দুঃখ পাবেন।' বিধবা তারামণির দুর্দশায় তিনি বিচলিত। তিলক বিশ্বাসের বিধবা কন্যার গর্ভপাতের কথায় তিনি কন্যার বিবাহ দিতে সংকল্প করেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব'লে তিনি দেশাচারের দাস হ'তে চান না। সুদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অমতের কথা বললে তাঁর—'অধিক টাকা ব্যয় করিলে সকল সম্পন্ন হতে পারিবে' —উক্তি সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচায়ক। তিনি আরও জানেন মুখে অনেকে বললেও কাজের বেলা হঠে যায়। সে জন্য তিনি সুদেবকে গোপনে সব ঠিক করতে বলেন।

একমাত্র কন্যা চপলার বৈধব্যে পার্ব্বতী সহচরীর সান্ত্বনা মানে না। চপলা অলঙ্কার, ভাল কাপড় পরতে পারবে না, তাকে একাদশী করতে

২২। বিবিধার্থ সংগ্রহ—৪র্থ পর্ব্ব, ১৭৭৯ শকাব্দা। পৃ ১৯২

হবে—এ সব পার্ব্বতীর অসহ্য। চপলা ছোট ব'লে অলঙ্কার পরলে কোন দোষ হবে না—এ কথা সহচরী বললে পার্ব্বতী বলেন, 'তুমি যেন একথা বললে। জানত পাড়ার সকলকে, তা হোলে কি আর নিন্দেয় কান পাতা যাবে।' লোকচরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে বাসববাবুর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী পার্ব্বতী। কিন্তু তিনিও—চপলাকে তার বৈধব্যের সংবাদ না জানিয়ে ভুল করেন। পার্ব্বতী যুবতী বিধবা কন্যা চপলাকে একাকিনী কোথাও যেতে দেন না। এ জন্য সহচরী এত কড়া হ'তে নিষেধ করে। কারণ চপলা সে রকম মেয়ে নয়। আর যদি কুপথে যায় তা হ'লে রাখা যাবে না। পার্ব্বতী তাতে সম্মতি জানান। চপলাকে কথা শুনিয়ে রাখা যায় না—বিবাহ দিতে দেরী হ'লে সে কুলত্যাগ করত এবং অন্য কিছু নিন্দনীয় কাজ ক'রে বসত।

চপলা এই নাটকের নায়িকা। তার মন কৃষ্ণকথায় বাঁধা পড়ে না। ৪র্থ অঙ্কে চপলা স্পষ্ট বলেছে 'আমার ত কথা শুন্তে গেলে কান্না পায়। কেষ্ণ গোপিনীগণের বস্ত্রহরণ কোরে, কদমগাছে উঠলেন, রাধিকের মান ভঞ্জন কল্লেন, নিকুঞ্জে বেহারে গেলেন, এসব রসের কথা কি আর ভাল লাগে। বিকেলবেলা কথা শুনে সমস্ত রাত অসুখে যায়।' চপলা ও চারুচন্দ্রের পরস্পর দেখাদেখি হয়েছে। চারুচন্দ্র তাকে কেন দেখে তা সে মালিনীকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এ দেখার অর্থ যুবতী চপলা নিশ্চয়ই জানে। তাদের মিলনে মালিনীর ভূমিকার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। চপলা দুঃখে দিন কাটালেও তার মুখে রসের কথা শুনি। কামিনীর বর আসার খবর দেয় না ব'লে সে রসিকতা করে, 'এমন নয় যে আমার নেই বোলে, তাকে আজ রাত্তিরে ছেড়ে দিতেম না।' স্বামী-সহবাস-ইচ্ছা যে তার মিটে না তা একটু পরেই তার স্বগত ভাষণে প্রকাশিত। সে বলেছে, 'এখন মনে হয় যে একবার যদি তার দেখা পাই, তা হলে চোকের জলে পা ধুইয়ে, এলো চুল দে পা পুছিয়ে সেই সব দোষ মার্জ্জনা কত্তে বলি।' বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে চপলা পয়ারে স্বগত বলে—

এমন অদ্ভুত কভু হইবে কি ফের।
বিধি বিনা কে ঘুচাবে কপালের ফের॥

বিধবাবিবাহ বৈধ হ'লে চপলার আপত্তি হবে না— বুঝা যায়। চারু-চন্দ্রকে নাটকের নায়ক বলতে হয়। সে-ইযে ভূদেব বাবুর পুত্র তা আমরা প্রথমে বুঝতে পারি না। চতুর্থ অঙ্কে মালিনীর সঙ্গে রসালাপে সে একটি রসিক পুরুষ। তার স্বগত ভাষণ 'ওটিকে দেখিলে মনে করুণার সঞ্চার হয়।' এই করুণা হ'তেই প্রেমের উৎপত্তি। পঞ্চম অঙ্কে চারু-চন্দ্র বারবার চপলাকে দেখে তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ। আবার সে জানে নারীর স্বভাব সর্পিণীর স্বভাবের মত। সে জানল কিভাবে? বই প'ড়ে না অভিজ্ঞতায়? শেষেরটি হ'লে তাকে ভাল লোক বলা যায় না। আবার সে ভাবে চপলার 'পাষাণ প্রাণ' নয়। সে চপলার সঙ্গে আলাপের জন্য লালায়িত। পুরাণকথা শুনতে যাওয়া তার ছলনা মাত্র। শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহে সব ছলনার শেষ।

মালিনী কুটনী জাতীয়া। ফুল বিক্রি করতে তার অন্দরে যাতায়াত। ৪র্থ অঙ্কে তার উপস্থিতি এবং পয়ারের উক্তিতে বুঝি কুলবতীর কুল মজাতে সে সিদ্ধহস্ত। তার রসিকতায় চারু সহাস্যে বলে-'বলি আদ-বুড়ো হলে এখনও—' কিন্তু তাতে কি আসে যায়? অল্পবয়সী বিধবা-দের মনোমত ব্যবস্থা করলে পাওনা তার ভালই হয়। আবার গর্ভবতী হ'লে তো কথাই নাই। সুতরাং তার বিধবাবিবাহ-বিরোধ স্বাভাবিক। তার নিজের মুখেই শুনি 'তা যদি বিধবার বে চলিত হয়, তবে লুকিয়ে আর এ কম্ম কর্ব্বে কেন, পেট বাঁধলে ওষুধ খাবেই বা কেন। তা যদ্দিন না হয় আমার পক্ষেই ভাল।' কুলীনদের বহুবিবাহ উঠে যাচ্ছে এবং তারা সহজে গর্ভপাত করে না ব'লে তার উপায় আশানুরূপ হচ্ছে না। সে দুঃখিত ভাবে বলে, 'শুনচি কুলীনের বের ব্যবসা উটে যাবে, আর কুলীনেরা বড় ও কায করে না। এখন হয়েচে কি বেঁধে গেলে পরি-বারেরা একদিন রাত দুপুরের সময় ধুমধাম করে, বলে তেল নিয়ায়, নুন নিয়ায়, সন্দেশ নিয়ায়, কেন গো, না জামাই এসেচে গো জামাই এসেচে, পরদিন দেখি কেউ কোথায়ও নেই। কই লো তোদের জামাই কৈ? না গেচে। ......এইত গোড়া বাঁধুনি হলো, তারপর, দিনকতক বই একটি মুখুজ্জে কুলীন জন্মালেন, তা তারা ওষুধ খাবেই বা কেন, কড়ি দেবেই বা কেন।' অর্থলোভ তার খুব বেশী। সে চপলা ও চারুচন্দ্রের

মনোভাব জেনে তাদের দুজনের নিকট হ'তেই কিছু আদায় করতে থাকে। সে অনেক সাবধানী গৃহস্থ ঘরে সিঁদ দিলেও এবারে ঠেকে গেল কিভাবে? কামিনী তার চরিত্র ভালভাবে জানে ব'লে চপলাকে সাবধান করে-'ভাগ্‌গিস চপলা তোমার তার সঙ্গে বে হোলো। নৈলে কি গঞ্জনার ঢাকই তুমি বাজাতে। জানত মালিনী মানুষ ভাল নয়।' কিন্তু চপলার কথায় কি মালিনী বিশ্বাস করবে? মালিনী কি অন্দরে অন্দরে চপলা ও চারুচন্দ্রের বিষয়টি বেশ রং ফলিয়ে বলবে না?

ধনী-দরিদ্রভেদে সমাজের নিয়ম বিভিন্ন। তর্কালঙ্কারের সম্বন্ধে আমরা প্রথম অঙ্কে শুনি—

'বিনদা। বোন তর্কলঙ্কার পুরুতের কর্ম্ম দেখ। তিনি স্বচ্ছন্দে চপলার মার কথায় চপলাকে বল্লেন, মা এ তুমি খাও, যা পাপ তা আমার হবে। মোক্ষদা। ওলো রায়েদের যে ঢের টাকা আছে, তারা তাঁকে টাকা দেবে, আর তিনি সেই টাকা নিয়ে দান ধ্যান করে আপনার পাপ ক্ষেয় কর্ব্বেন।' আর গরীব বিনদার মা একাদশীর দিনে বিনদাকে ভাত খেতে দিয়েছিল ব'লে তারপর দিন পাড়ার লোক তাদের 'একঘরে' করতে চেয়েছিল।

বিনদার মতে বিধবাবিবাহ সুখের হয় না। কারণ—

কুম্ভকার নব নব পাত্র গড়ে কত।
ভাঙ্গিলে যুড়িতে কিন্তু নারে পূর্ব্বমত।।

আবার হিন্দুবিবাহে দেখা যায় স্ত্রীর মতামত মূল্যহীন। সে বাড়ীতে দাসীর মত থাকে। হিন্দু বিধবার উপর নির্যাতনের কাহিনী ৩য় অঙ্কে তারামণির উক্তিতে স্পষ্ট। আমরা তার কথা শুনে বাসববাবুর মত ব'লে উঠি, 'এ দেশের বিধবারা না জানি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছে।' বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হ'লে কত তিলক বিশ্বাসের কন্যা অনর্থ ঘটাবে এবং কত মালিনী পয়সা উপায় করবে। সুদেব চপলার বৈধব্যে দুঃখিত ব'লে সুবর্ণ্ম চপলা ও তার সম্বন্ধে রসিকতা করে। আবার কামিনীর স্বামীর কথা কামিনী বলেছে, 'পোড়া কি এক সাগর, তার জ্বালায় আর মাগ নে নিশ্চিন্ত হয়ে সোবার যো নাই। যে বিধবা বের বিধি দিয়েছে। এখন আবার মেয়েগুলোর মন যুগিয়ে চলতে হবে, তা না-কল্লে বিষ খাইয়ে

কি আর কোন রকমে মেরে ফেলে, আবার একটা বে কর্ব্বে।' এ রকম স্বার্থপরতা-পূর্ণ হীন মনোভাব সাধারণ ভাবে স্ত্রীলোকের নাই। পুরুষের যখন বহুবিবাহ সমাজ-প্রচলিত তখন এ রকম আক্ষেপ করা যুক্তিহীন।

তর্কালঙ্কার, চারুচন্দ্র প্রভৃতির মুখে একই ভাবের গদ্য সংলাপের পর পদ্য সংলাপ দেওয়া আছে। এমনকি এ দোষ থেকে বাসববাবুও রেহাই পান নাই। 'স্থানে অস্থানে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কবিতার প্রয়োগে নাটকটি ভারাক্রান্ত হইয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল।' ২৩ ৩য় অঙ্কে বিধবাবিবাহ চলিত হ'লে চপলার বিবাহ হবে বিনদার এ রকম কথায় ড্রামাটিক আয়রনি প্রকাশিত। আবার চারুচন্দ্রই যে ভূদেববাবুর পুত্র প্রথম দিকে জানতে না পারায় আমরা যথেষ্ট কৌতূহলী হই। একেবারে ৬ষ্ঠ অঙ্কে আমরা এটা জানতে পাবি। এতক্ষণ নাটকীয় ঔৎসুক্য রাখার প্রশংসা করতে হয়।

নাটকটির ৫ম অঙ্কে সহচরী এবং পার্ব্বতীর প্রবেশের পূর্বে মালিনীও চপলা উভয়ের প্রস্থান লেখা উচিত ছিল। আবার ঐ অঙ্কেই একটু পরে সহচরী ও পার্ব্বতীর প্রস্থানের পর চারুচন্দ্রের খেদ আছে। পূর্বে চারুচন্দ্রের প্রস্থান ছিল। এখানে প্রবেশ নাই—অথচ সংলাপ আছে। সে কোথায় ছিল? অনুমাম মুদ্রণের ত্রুটি বশতঃ এ সব ঘটেছে। নাটকটিতে ৬টি অঙ্ক আছে। গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের উল্লেখ নাই। এমনকি ঘটনাস্থলেরও কোন উল্লেখ নাই। তবে বুঝা যায় যে বাসববাবুর বাড়ী এবং তার পাশাপাশি স্থানই নাটকটির ঘটনাস্থল। সুতরাং স্থানঐক্য অক্ষুণ্ণ। সময়ঐক্যও রক্ষিত। তবে গতিঐক্য মাঝে মাঝে প্রাচীন যাত্রারীতির প্রভাবে বিঘ্নিত। ১ম অঙ্কে চপলার বৈধব্য, ২য় অঙ্কে চপলার বৈধব্যর বিষয় আলোচনায় ঘটনার অগ্রগতি, ৩য় অঙ্কে ঐ বিষয়ে আরও আলোচনা এবং বাসববাবুর বিধবাদের প্রতি করুণাপ্রকাশ, ৪র্থ অঙ্কে মালিনীর সঙ্গে চারুচন্দ্রের রসিকতা, বাসববাবুর কন্যার জন্য গোপনে পাত্র স্থির, চপলা ও চারুচন্দ্রের পরস্পর দর্শন ও বিরহ, ৫ম অঙ্কে উভয়ের প্রবল মিলন-ইচ্ছা এবং ৬ষ্ঠ অঙ্কে তাদের বিবাহ—এ ভাবে নাটকীয় ঘটনা সজ্জিত।

২৩। দৃশ্যকাব্য পরিচয়—শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। পৃ ৩২

নাটকটি মিলনান্তক। বিধবাবিবাহের সমর্থনে লিখিত হওয়ায় উদ্দেশ্যমূলক রচনা হ'লেও বক্তৃতাধর্মী বা প্রচারধর্মী হয় নাই। হাস্য, করুণ, প্রভৃতি রসের পরিবেষণ করলেও নাট্যকার শান্ত রসকে শেষ পর্যন্ত প্রধান করেছেন। নাটকটির গদ্য সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষায় মিশ্রণ দোষ ঘটেছে। সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক রচনা ব'লে এ বিষয়ে অন্যান্য নাটকের মত এর আর কোন সংস্করণও হয় নাই। সুতরাং নাটকটি যে জনপ্রিয় হয়েছিল তা বলা যায় না।

৫। বিধবা বিরহ নাটক—শ্রীশিমূয়েল পিবরক্স। কলিকাতা, ১৮৬০

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীশিমূয়েল পিবরক্স রচিত বিধবা বিরহ নাটকের নাম করতে হয়। লেখক এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর আদেশে গ্রন্থ রচনা করেন ব'লে ভূমিকায় জানিয়েছেন। অনুমান—ঐ ব্রাহ্মণ সমাজের ভয়ে নিজের নাম প্রকাশ করতে তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। মুসলমান লেখক হিন্দু সমাজের ত্রুটি ধ'রে নাটক রচনার ইতিহাসে এইটি প্রথম ব'লে এর স্বতন্ত্র মূল্য আছে। নাটকটির কাহিনী—মনোমোহিনী বাল-বিধবা। তার মাসতুত বোন মনোহরীও বালবিধবা। তারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী কিন্তু মনোমোহিনীর বাবা ও তারাচাঁদ এর বিরুদ্ধে। মনোমোহিনী বামার সাহায্যে নঙ্গরা নামে এক হাড়ির ছেলের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়। ফলে মনোমোহিনী গর্ভবতী হয় এবং এই ঘটনা জানাজানি হওয়ায় সে নঙ্গরার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। এ ব্যাপার জেনে দুঃখে ও লজ্জায় তার বাবা ও মা ছোট ছোট দুটি ছেলে নিয়ে সংসার ত্যাগ করে।

সমাজে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবতীরা পায়ে হেঁটে বা একা স্থানান্তরে যেত না। তারা পাল্কিতে যেত এবং সঙ্গে যেত দাসী। মনোমোহিনী পাল্কিতে ক'রে এবং সঙ্গে চাঁপা দাসীকে নিয়ে মাসী বাড়ী যায়। যে সংসারে ভাই ঝিয়ের প্রতি, মা বর্তমানে বাবা দাসীর প্রতি এবং আরও দুটি স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত এ কথা মেয়ে জানে সেখানে তাকে ব্রহ্মচারিণী হ'তে যত উপদেশই দেওয়া যাক সব বৃথা। যে কুলধর্ম রক্ষার জন্য বিধবার ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা—সেই কুলধর্ম নীচ জাতির সঙ্গে অবৈধ মিলনে নষ্ট হয়। অথচ বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে

এ সব হয় না এবং অনেক বাবামাকে দুঃখে গৃহত্যাগ করতে হয় না। মনোমোহিনীর বাবা সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়ার সময় লিখেছিলেন 'হে দেব বংশ হিন্দু লোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক এই জন্যে তোমাদের নিকটে আমার নিবেদন এই যদি কুলশীল জাতি মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।'

এই নাটকের নায়িকা মনোমোহিনী। ভাল গহনাও ভাল কাপড় পরার সাধ তার মিটে নাই। সে বাইরে বিধবা অন্তরে সধবা। এখানেই তার চরিত্রের মূলসূত্র। মনোহরীর সঙ্গে কথায় তার মনোভাব স্পষ্ট 'সে যা হক দুঃখের বিষয় এই যে বাবা এত বুড় হলেও এতটা কচ্ছেন তবে আমি যে তাঁর যুব মেয়ে আমারী বা কত দুঃখ হতেছে তা ত তিনি স্মরণ করেন না' —এ কথাতে আমরা তার প্রতি সহানুভূতি জানাই। তার মা তার সাক্ষাতেই বামার কুটনী স্বভাবের কথা বলায় সে পথ খুঁজে পায়। তারপরের সব ঘটনা স্বাভাবিক। অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে হাড়ির সঙ্গে তাকে মিলিত হ'তে হয় ব'লে প্রথমে সে দুঃখিত। কিন্তু 'যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম।' শেক্ষপীয়রের ট্র্যাজেডিতে দেখা যায় চরিত্রের মধ্যেই তার পতনের কারণ নিহিত।

মনোমোহিনীর বাবা মেয়ে সম্বন্ধে খুব সতর্ক কিন্তু নিজে শুদ্ধ চরিত্র নন। তাঁর মন্দ চরিত্রের কথা সংসারের সকলেই জানে। এতে তিনি লজ্জিত নন। বিনা প্রতিবাদে তিনি সুন্দরীর প্রতি তাঁর আসক্তির কথা মনোমোহিনীর মায়ের কাছে স্বীকার করেন। কালিঘাটের মাধব চ্যাটার্জীর বড় মেয়ের বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী হওয়া, গর্ভপাতের কথা, থানা পুলিশ এবং চ্যাটার্জীর গলায় দড়ি নেওয়ার কথা যখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জানান তখন তিনি ঐ সব প্রসঙ্গ ছেড়ে তাঁকে ঘুমাতে বলেন। যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগানো যায় না। চণ্ডীমণ্ডপে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা বসলে একমাত্র খৃষ্টান শ্যামাচরণ এবং বৈষ্ণব কানাই দাস ছাড়া সকলেই বিপক্ষে মত দিলেন। এরই পরিণতিতে তাঁকে ভুল স্বীকার ক'রে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল। মনোহরী বালবিধবা হ'লেও

বাড়ীতে ব'সে সে ঘরকুনো হয়ে পড়েছে। মনোমোহিনী তাকে কাব্য ক'রে কামপীড়ার কথা বললে সে আশ্চর্য হয়—কি করে মনোমোহিনী এ সব জানে। কিন্তু সে কি কাম-পীড়ায় পীড়িত হয় না? সে বিধবা-বিবাহের পক্ষে। বিধবাবিবাহ বেশী প্রচারিত না হওয়ায় সে উদ্বিগ্ন। মনোমোহিনী বাইরে রক্ষণশীল ভিতরে প্রগতিবাদী। নঙ্গরা জাতিতে হাড়ি। সে ভাল বাঁশি বাজাতে পারে। এই গুণেই সে মনোমোহিনীর মন জয় করেছে। মনোমোহনী তাকে দেখেই পাওয়ার জন্য যেমন আকুল নঙ্গরা তেমন নয়। এমন কি বামনের 'মেয়ে' এবং বয়স ১৩ ১৪ বৎসর বামার কাছে জেনেও সে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। মনে হয় নীচ জাতি ব'লে তার সঙ্কোচ। বামা সব ব্যবস্থা ক'রে দিবে বলায় সে রাজী হয়। নঙ্গরার মত নীচ জাতির ছেলেরা তখন লেখাপড়া শিখত না। অথচ তার মুখে আলঙ্কারিক ভাষা দোষযুক্ত। নঙ্গরা এবং মনো-মোহিনীর সংলাপে কৃষ্ণযাত্রার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

নঙ্গরা। শুন ২ সুবদনি ধরি তব পায়।
কর ক্ষমা অপরাধ মম প্রাণ যায়॥

মনোমোহিনী। উঠ ২ প্রাণপ্রিয় ধরি তব পায় হে।
অঙ্গে ২ অঙ্গ দিয়া প্রাণ মোর জুড়াও হে॥

ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন 'এতদ্দেশীয় সামান্য ও ভদ্র স্ত্রীলোকেরা পরস্পর' যে ভাষায় 'কথোপকথন করিয়া থাকেন,' সেই ভাষায় গ্রন্থ-খানি রচিত। এই দৃষ্টিতে মনোমোহিনী, তার মা, চাঁপা দাসী, পদি, বামা, মনোহরী, সুখদা, মনোমোহিনীর মাসী, আই প্রভৃতির ভাষা কথ্য। অন্যান্যের ভাষা ঠিক কথ্য নয়। ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে সুখদা ও মায়ের সংলাপে কুরুচিপূর্ণ। ৪র্থ অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে তারক ও শ্যামা-চরণের সংলাপে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করত তা জানতে পারি—

তারক। গুড্ মরনিঙ্গ বাবু, প্রে ওয়াট ইজ ইউর নেম, ওয়ের ডু ইউ লিব?

শ্যামাচরণ। মাই নেম শামাচরণ রায়, আই লিব এট কৃষ্ণনগর, দিস মরনিঙ্গ আই কেম টু সি মাই ইস্কুল হিয়ের, কাইণ্ডলি টেল মি ওয়ের ডু ইউ লিব।

'গায়ে কুড় মেখে চালকি নাম' এর অর্থ 'যদি কোন মহান ও বিদ্বান তেজস্বী পুরুষ কোন কর্ম্ম করিতে উদ্‌যোগী হন তবে তিনি প্রাণপণে তাহা সিদ্ধ করিতে যত্নশীল হন।' একথা বুঝাতে মনোমোহিনী মনো-হরীর কাছে রামমোহনের তেজস্বিতার কথা উল্লেখ করে এবং তিনি সহ-মরণ নিবারণ করতে ইচ্ছা ক'রে কেমন উদ্‌যোগী হয়েছিলেন সে কথাও বলে।

নাটকটির নাম বিধবা বিরহ নাটক। বিধবা মনোমোহিনী বিরহে কাল কাটাতে না পেরে নঙ্গরা হাড়ির সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে তার নিজের এবং পরিবারের বিপর্যয় ঘটে। নাট্যকার বিয়োগান্ত নাটকের পরিণতি দেখাতে চাইলেও মনোমোহিনীর বাবার প্রতি আমাদের করুণা এবং সহানুভূতি জাগে না। তাঁর প্রতি প্রবল ঘৃণা বশতঃ বীভৎস রসের স্ফুরণ ঘটে। বিধবা-বিরহ বিষয়বস্তু অনুসারে নামকরণ হ'লেও 'মনো-মোহিনী' নামকরণ নায়িকার নাম অনুসারে হ'তে পারত। কিন্তু নাট্য-কার তা চান নাই। বিধবা বিরহ নাম দিলে সে যুগে যে চমক লাগবে মনোমোহিনী দিলে তা লাগবে না। নাটকটিতে ৬টি অঙ্ক আছে। এতে দৃশ্যের পরিবর্তে গর্ভাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১ম হতে ৪র্থ অঙ্ক পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে ২টি ক'রে এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ অঙ্কে ৩টি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। প্রত্যেক অঙ্কের প্রথমে অঙ্ক নির্দেশ, পাত্রপাত্রী এবং স্থানের উল্লেখ আছে। যেমন প্রথমাঙ্ক মনোমোহিনী, তাহার মাতা এবং চাঁপা দাসী নিজালয়। দ্বিতীয়াঙ্ক মনোমোহিনী, তাহার মাসী, সুখদা এবং মনোহরী মাতৃস্বসালয়।
এ রকম উল্লেখ থাকায় অভিনয় কালে মঞ্চ পরিচালনার সুবিধা হয়।
৪র্থ অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে উড়ে কালিয়ার একটি গান আছে—

বন্ধু সঙ্গে মান কল্লি কালি রাত্রিরে।
সেই ত কাঁদিলে মতে কাঁদাইলে পথর না দিলি মো জাতিরে॥

অনেক নাটকে রাগও তালের উল্লেখ থাকে—এ নাটকে তা নাই। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র সম্মত এবং আইনসিদ্ধ হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আরম্ভ হ'লেও সাধারণ ভাবে সমাজ একে স্বীকার করে নাই। এই নাটকে খৃষ্টান ধর্মান্তরিত শ্যামাচরণ এবং বৈষ্ণব কানাই

দাসের বিধবাবিবাহের সমর্থন পাওয়া যায়। এর পূর্বে বিধবাবিবাহ নাটকে রামদাস বাবাজী বিধবাবিবাহে সমর্থন জানিয়েছিল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—মনোমোহিনীর নঙ্গরার প্রতি আসক্তি। খৃষ্টান ধর্মান্তরিত মাইকেল মধুসূদনের বুড় সালিকের ঘাড়ে রেঁা প্রহসনে ভক্ত প্রসাদের মুসলমানীর প্রতি আসক্তিতে যে দুঃসাহসিকতা দেখা যায় এই নাটকে শ্রীশিমূয়েল পিববক্স ও প্রায় সেই রকম দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। মাইকেলের প্রতি ধর্মধ্বজীরা চটে গিয়েছিলেন কিন্তু পিরবক্সের প্রতি হিন্দু বা মুসলমানের কি মনোভাব হয়েছিল তা আমরা জানি না। মাইকেলের প্রহসন বিলম্বে হ'লেও অভিনীত হয়েছিল কিন্তু বিধবাবিরহ নাটকের অভিনয় সংবাদ জানা নাই।

৬। কাদম্বিনী নাটক (২য় খণ্ড) কুশদেব পাল। কলিকাতা ১২৬৯

১২৬৯ সালে প্রকাশিত কুশদেব পালের কাদম্বিনী নাটকে বিধবা কাদম্বিনীর বিষয়ে স্বতন্ত্র এক চিত্র উদ্‌ঘাটিত। এর কাহিনী—সদানন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে রমণীমোহন ও কাদম্বিনী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। এই আকর্ষণ মিলনে দাঁড়ায়। নানা উপায়ে গোপনে তাদের মিলন চলার ফলে কাদম্বিনী রমণীমোহনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করতে চায়। রমণীমোহনের আসার পূর্বেই কাদম্বিনী অস্থির হ'য়ে জিনিসপত্র নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে নাপ্তিনীর বাড়ী চ'লে আসে। এর পর নূতনগঞ্জে খুদী বৈষ্ণবীর ঘরে ও অন্যান্যের ঘরে তাকে আশ্রয় নিতে হয়। রমণীমোহন তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং সে তাকে এখানে সেখানে রেখে রসিকগঞ্জে বেচু চ্যাটার্জীর ষ্ট্রীটের ভগী ময়রাণীর বাড়ীতে রেখে আসতে চায়। প্রতিবাসিনী জগদম্বা তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করে। সে রমণীমোহনকে গহনা, কাপড়, বাসনপত্র প্রভৃতি চায় ব'লে সে সব বুঝতে পারে। সে আর আসে না। কাদম্বিনী তার বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য জগদম্বার সঙ্গে উকীলের কাছে যায়। উকীল নানা অজুহাতে নালিশ করতে বিলম্ব করে এবং রমণীমোহনের বিরহে অতিদুঃখে কাদম্বিনীর দিন কাটতে থাকে।

রমণীমোহন এই নাটকের নায়ক। তার লাম্পট্যের সীমা নাই। সে প্যারীকে অবিশ্বাস করে। কাদম্বিনী বংশ মর্যাদার জন্য চিন্তিত

এবং গর্ভবতী হওয়ার ভয়ে ভীত হ'লে সে গর্ভ না হওয়ার জন্য যে সব ওষুধ জানে তাদের মধ্যে একটি বলে, 'অফুলো কদমের বিচি সওয়া ছ গণ্ডা, আর নির্ম্মূল করবীর শিকর, আর খাসী ছাগলের দুদ দিয়ে বেটে চারি দিনের দিন খেলে এ জন্মে আর সে ভোগ ভুগ্‌তে হবে না।' রমণীমোহন যে কত শয়তান তা এখানে বুঝা যায়। চপলাচিত্ত চাপল্য নাটকে মালিনী বারফট্‌কা পুরুষকে বশ করতে যে ওষুধের কথা বলে তাতে ফল না হ'লেও শোনামাত্র তার চাতুরি ধরা যায় না। রমণীমোহন নামকরণ সত্যই সার্থক। শ্রাবণের বাদলের মধ্যে অন্ধকারে কাদম্বিনীর নিকটে এসে রমণীমোহন তাকে ধর্মরক্ষা করতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করে। সে কিরূপ ধর্মরক্ষার কথা বলতে চায়? কামগন্ধহীন নিকষিত হেম সমান প্রেম কি সে উপভোগ করতে চায়? তা হ'লে সে গর্ভ না হওয়ার ওষুধের কথা বলে কেন? আর কথা শুনে পটল তুলবার ইচ্ছা কি দেহ সম্ভোগে কাদম্বিনীর অনিচ্ছাকে কেন্দ্র করে নয়? নিজে কাদম্বিনীকে রতিমিলনে আসক্ত ক'রে ধর্মরক্ষার দায়িত্ব তারই উপর দিয়ে সে নিজে দায়মুক্ত হতে চেয়েছে। কাদম্বিনী তার জন্য কুলত্যাগ করেছে। তার প্রতি ঠাট্টাতামাসা তার অনুচিত। 'সঙ্গি না পেলে কি মেয়ে মানুষের এত সাহস হয়······এর মধ্যে টাকা পেলে কোথায়, রোজগার হচ্ছে কেমন? যেমন আসলে লোক্‌সান হয় না।' সে ভগী ময়রাণীর বাড়ীতে তাকে রেখে আসতে চায় কেন? লোকাপবাদের আর বাকি কি? ভগী ময়রাণী কি প্রকৃতির? রমণীমোহন কি কাদম্বিনীকে বার-বনিতা করতে চায়? কাদম্বিনী কাপড়, গহনা চাইলে সে আত্মধিক্কার দিয়ে রেগে বলে, 'মেয়ে মানুষের পায় দণ্ডবৎ তোমার সঙ্গে যা হবার তা হয়েছে এই পর্য্যন্ত।' আমরা জানতাম তার মত স্বার্থপর ইন্দ্রিয়লোলুপ পুরুষ কাদম্বিনীর বাড়ীতে পাঁচ বৎসর এবং বাসা বাড়ীতে এক বৎসরের অধিককাল কাদম্বিনীকে ভোগ ক'রে এখন সে তাকে ত্যাগ করতে ব্যস্ত। সে গর্ভবতী হ'লে তাকে সে পূর্বেই ত্যাগ করত। কাদম্বিনীর খোরাক পোষাকের জন্য মাসিক ৩ টাকা হিসাবে দিয়ে সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। উকীলবাবু বলেন, 'বিশেষ ভদ্রলোকের অখ্যাতির সূচনা করা উচিত হয় না'—কিন্তু আমাদের মতে রমণীমোহন ভদ্রলোক নয়।

উকীলের দেওয়ানী নালিশের আরজীর মুসাবিদায় 'এক্ষণে নিবৃত্তি অবলম্বন।' 'পরগণা কুসঙ্গ বর্জ্জন।' 'জিলা হরিভক্তি দ্বারমনন।' প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও আমরা এগুলি স্বীকার করি না। শেষাংশে পয়ারে

কুশদেব বলে ধন্য পুরুষের প্রাণে।
জিতেন্দ্রিয় বলা যায় রমণীমোহনে॥

কিন্তু তার ইন্দ্রিয় জয়ের কোন প্রমাণ পেলাম না।

কাদম্বিনী এই নাটকের নায়িকা। কুশল সংবাদ দিতে সে রমণীমোহনের নিকটে দুঃখভাব প্রকাশ করে। পরে তাদের ভালবাসা দেহ মিলনে পরিণত। তাদের আমোদ আহ্লাদ যে দেহদান এবং কুলত্যাগে পৌঁছাবে তা প্যারী চিন্তাও করে নাই। কাদম্বিনী গঞ্জনার জন্য কুলত্যাগ করতে চায়। সে বলে, 'আবার সেই যে পোড়ারমুখো গোপালে, ঈশ্‌নে কৈলিশে তাদের মা তাদের মাথা খেয়ে আমার সঙ্গে মলো, তার জন্যে নালিশ ফরেদ হয়ে গেল, এখন ছেলে বুড় এণ্ডা বাচ্ছা বাপ মা পর্য্যন্ত সেই গঞ্জনা দেয়, ঘরে থাক্‌লেও জ্বালা বেরলেও জ্বালা, সুতরাং আমি আর সহ্য কবিতে পারি নে, এখন একটু ঠাঁই দেও গে তোমার নিকট থাকি।' কিন্তু গোপাল, ঈশান ও কৈলাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘটল কিভাবে? যদি তাকে নিয়ে এত কাণ্ড হ'য়ে থাকে তবে তা প্যারীর অজানার কথা নয়। তবুও প্যারী তাকে ভাল সার্টিফিকেট দিয়েছে। কিন্তু রমণীমোহন তাকে অন্যাসক্তা ভেবে কি নিয়ে যেতে মৌখিক সম্মতি দিলেও অন্তরে অন্যরকম চিন্তা করেছিল? উকীলবাবু পরামর্শ দেন যে রমণীমোহন ছেড়ে দিলেও সে অন্য ব্যবস্থা করতে পারে। জগদম্বা বলে যে সে এ প্রস্তাবে সম্মত নয়। ফলে উকীল দেওয়ানী নালিশের আর্জির যে মুসাবিদা ক.র তাতে কাদম্বিনী স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করেছে এবং সে রমণীমোহন ছাড়া আরও অন্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে অথচ তার ভরণপোষণের জন্য রমণীমোহন ৩ টাকা ক'রে দিতে চাইলে সে ১০ টাকা দাবী করে। —এ রকম প্রকাশ পায়। আর ফৌজদারী মামলার মুসাবিদায় প্রকাশ যে কাদম্বিনী রমণীমোহনকে বশীভূত করেছে। তার সঙ্গে সে রসিকগঞ্জে যেতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু জগদম্বার নিষেধে সে যাচ্ছে

না। সেজন্য রমণীমোহন আর তার নিকটে আসে না। তার ভরণ-পোষণের খরচ দিলেও তার বিরহ সে সহ্য করতে পারছে না। সে যাতে প্রতি রাত্রে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয় তার ব্যবস্থা করতে প্রার্থনা করা হয়। বলাই বাহুল্য এই দুই দরখাস্তের ফল কাদম্বিনীর পক্ষে শুভ হবে না। যে কাদম্বিনীকে দেখে উকীল তার 'বেশ বয়েস আছে' বলেছিল সে-ই মুসাবিদায় বয়ঃক্রম প্রায় 'ঝোলাযৌবনী' বলে উল্লেখ করলে কেন? এ সব ক্ষেত্রে জগদম্বার গোপন কারসাজি থাকতে পারে। কাদম্বিনীর এখন— কর্ম্মদোষে জন্মভূমি, কি ক্ষণে এলাম রে।
খলের হাতেতে পড়ে, ভাবিয়া গেলাম রে।।

এই ভাবে আক্ষেপ করতে করতে তার দিন কাটবে। উকীলের খরচ যোগাতে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে অথবা রাসিকগঞ্জে গিয়ে অন্য রসিকের সঙ্গে মিলিত হবে। কাদম্বিনী ককারাদিতে ৩৬ লাইন খেদ প্রকাশ করেছে, ৩৬ লাইন কেন ৭২ লাইন খেদোক্তি করলেও সে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না। যেমন কর্ম তেমন ফল —সে বুঝে না কেন? স্বল্প পরিসরে নাপ্তিনী, বৈষ্ণবী, জগদম্বা, প্যারী প্রভৃতি চরিত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

নাটকটি পয়ারে আরম্ভ। কাদম্বিনীর মনোভাব পয়ার ও ত্রিপদীতে প্রকাশিত। তারকেশ্বরের পথের বর্ণনা ও স্থান মাহাত্ম্য পয়ারে লিখিত। রমণীমোহনের কাদম্বিনীর রূপ বর্ণনা এবং তাদের মিলন পয়ারে বর্ণিত। দু এক স্থানে পয়ার বা ত্রিপদীর পর গান আছে। রমণীমোহনের প্রথম গানে তার পূর্বরাগ প্রকাশিত। সে রাগিণী গারা ভৈরবী তাল ঠেকায় গানটি গায়। অন্যদিকে কাদম্বিনীও রাগিণী আলিয়া তাল একতালায়

'করি কি উপায় করি কি উপায়। যারে মন সদা চায়······।।'

এই গান গেয়ে তার পূর্বরাগ প্রকাশ করে। দুটি গানেই 'ধ্রু' উল্লেখ আছে। তারকেশ্বরে তাল আড়খেমটায়, ঢিমে তেতালায় ও তেলেনায় কয়েকটি গান আছে। কোন গানে রমণীমোহনের প্রার্থনা, কোনটিতে স্থান মাহাত্ম্য বর্ণিত। নাটকটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে। নাট্যকার ঔপন্যাসিকের মত রমণীমোহনের চিন্তার বর্ণনা করেছেন 'রমণীমোহন সে দিবস অবস্থিতি করিল বটে, কিন্তু আশার সুসার কিছুই

হইল না, তবে কতরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ......ফলতঃ মন অত্যন্ত উচ্চাটন হইল তাহা প্রকাশ করিবার নয়।'

নাটকটিতে পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও মাথুর এই চারটি স্তর দেখা যায়। পূর্বরাগ সৃষ্টি হ'লে রমণীমোহন পয়ারে কাদম্বিনীর রূপ বর্ণনা ক'রে চাঞ্চল্য, আবেগ, ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব সৃষ্টি ক'রে রতি এই স্থায়ীভাবকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে।

আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের সাহায্যে স্থায়ীভাব রতি শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়— অতঃপর রমণীমোহন কাদম্বিনী।
তিনঘণ্টা কাটাইল প্রমোদে রজনী॥

নাটকটির শেষাংশে উকীলের যে মুসাবিদা আছে তাকে অগ্রীল বলতে হয়। উক্ত অংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলাই ভাল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রতিক্রিয়ারও বর্ণনা আছে কিন্তু গদ্যে যে কাব্যিক ভাষা প্রকাশ করা হয়েছে তা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও নিম্নরুচির।

গ্রন্থটিতে অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের উল্লেখ নাই। কাদম্বিনী এই নাটকের নায়িকা এবং তারই নামানুসারে নাটকটির নাম কাদম্বিনী নাটক। এর শেষদিকে কতকগুলি আইনের উল্লেখ আছে। সেজন্য নাটকটির নাম 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক।' গ্রন্থটিতে দ্বিতীয় খণ্ড বলে উল্লেখ আছে। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় এক 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক' এর বিষয় বলেছেন।[২৪] যে আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক আলোচনা করছি তা কথোপকথনচ্ছলে সমস্ত পিনালকোড নয়। তবে 'Dialogue এ কিছু লেখা হইলেই তাহা নাটক হইল এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া' অনেকেই নাটক লিখেছেন। আদি পর্বের নাটক ও প্রহসনগুলি বিচার করলে যে উক্ত নাম দেওয়া চলে না তা বলা বাহুল্য। সদর আমীন মুন্সেফ আদালতের ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত উকীল শ্রীযুক্ত কুশদেব পাল সংগৃহীত ব'লে গ্রন্থটিতে উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায়—উকীলবাবুর নিকটে ঐ রকম এক কেস আসে এবং তখন তিনি নাটক লিখতে মনস্থ করেন। ভণিতায় তিনি নিজের নাম

---

২৪। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিন বিহারী গুপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায়। পৃ ২০৪

উল্লেখ করলেও তাঁর দ্বারা রচিত বা প্রণীত বলে লিখেন নাই।

নাটকটিতে যখন রমণীমোহন কাদম্বিনীর বাড়ীতে শ্রাবণ মাসে বাদলের মধ্যে রাত্রিতে গিয়ে উপস্থিত এবং পিঁড়ি ফেলার শব্দ করে তখন নেপথ্যে 'উত্তর ঘরের ভিতর—ওরে কিসের শব্দ হয় রে? বুঝি কোন পোড়া কপালেরদের গরু এসে চালায় ঢুকে ভিজান ধান খাচ্চে।' একথা বলার পর কাদম্বিনী '(সত্বর হইয়া রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দ্রুতগতি) দূর হবে সর্ব্বনেশেদের গরু দূর হ, রেতের বেলাও পোড়া লোকেরা গরু বাঁধে না।' —এ কথা বলেছিল। রমণীমোহনের ভাগ্য ভাল যে কাদম্বিনী জেনে শুনে তাকে গরু বলে নাই; কিন্তু বিধবাবিলাস নাটকে জেনে শুনেই কুকুর ছাগল বলা হয়েছে। এ রকম বিষয়ের অবতারণা হাস্যরস সৃষ্টি করে।

নাটকটিতে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে কোন অভিমত প্রকাশিত না হ'লেও সাধারণ ভাবে বিধবা সমস্যা এতে স্থান পেয়েছে। কাদম্বিনী কোর্ট কাছারি না ক'রে যদি রমণীমোহনকে বিবাহ করতে পারত তা হলে কোন সমস্যাই ছিল না। নাটকটির অভিনয়ের কোন সংবাদ জানা যায় না। এর প্রথম খণ্ডও পাওয়া যায় না। এই নাটক জনপ্রিয় না হওয়ায় এর অন্য কোন সংস্করণও হয় নাই।

৭। দলভঞ্জন নাটক—শ্রীহারাণ চন্দ্র শর্ম্মা। ১লা মাঘ ১২৬৮।

শ্রীহারাণ চন্দ্র শর্ম্মা ১২৬৮ সালে দলভঞ্জন নাটক প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার এর বিজ্ঞাপনে দেশের কুপ্রথা দূরীকরণের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে দলাদলি প্রথার অনিষ্ট দেখিয়ে দলভঞ্জন নাটক রচনা করেছেন ব'লে জানিয়েছেন। এর কাহিনীতে আমরা পাই—উত্তরপাড়ার লোকেরা এক বিধবার বিবাহ দেওয়ায় দক্ষিণ পাড়ার হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুসূদন, যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কান্তিচন্দ্র, হরদয়াল লাহিড়ীর মধ্যমপুত্র ভূতনাথ এবং নীলকণ্ঠ রায়, অম্বিকাচরণ প্রভৃতি কতিপয় নেশাখোর যুবক ব্যক্তি দলাদলিতে মন দেয়। উত্তরপাড়ার রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাতৃবিয়োগের পর আদ্যশ্রাদ্ধ নিয়ে এই দলাদলি চলতে থাকে। দক্ষিণপাড়ার ব্রাহ্মণেরা ঐ শ্রাদ্ধে উপস্থিত না হ'য়ে দল পাকাতে থাকে। শুধু মধু, কান্তি, ভূতনাথই দলাদলি করে না—

রামবল্লভ চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী, পার্ব্বতী চরণ রায়, মহেশচন্দ্র মজুমদার, রামরতন লাহিড়ী প্রভৃতি বয়স্ক ব্যক্তিরাও এ নিয়ে মাতামাতি করেন। উত্তর পাড়ার ভগবান বাবু এই দলাদলি মিটাতে যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হন। সেজন্য তিনি অন্য দেশ হ'তে চার পাঁচ শ লোক আনিয়ে রাখালবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করালেন। অন্যদিকে নেশাখোর কুক্রিয়াসক্ত যুবকদের দারোগা থানায় নিয়ে গেলে ভগবান-বাবুকেই জামিন হ'তে অনুরোধ করায় তিনি তাদের খালাসের ব্যবস্থা করেন।

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের উল্লেখ না থাকলেও সংযোগস্থলের উল্লেখ থাকায় প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে দুটি ক'রে দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের উল্লেখ করা চলত। ১ম অঙ্কে দলাদলির সূত্রপাত, ২য় অঙ্কে এ বিষয়ে অগ্রগতি এবং ভগবানবাবুর ব্যর্থতা, ৩য় অঙ্কে দক্ষিণ পাড়া বাদেও রাখালবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন এবং দক্ষিণপাড়ার নেশাখোর ঘটিচোর নিয়ে পেয়াদার টানাটানি ও গণ্ডগোল, ৪র্থ অঙ্কে কান্তিচন্দ্র ও মধুসূদনের নিরীহ অন্ধ ভিক্ষুকের প্রতি নির্যাতন, এবং ৫ম অঙ্কে তাদের শাস্তি এবং ভগবানবাবুর দ্বারা তাদের মুক্তি। কালঐক্য, স্থানঐক্য এবং গতিঐক্য বজায় আছে।

নাটকটিতে গদ্য সংলাপ বেশী। পয়ার এবং ত্রিপদীতেও সংলাপ আছে। প্রথম অঙ্কে ভবশঙ্কর ন্যায়রত্নের মধুসূদনের দুরবস্থায় আক্ষেপ পয়ারে, দ্বিতীয় অঙ্কে ছোটবধূ তার ঠাকুরঝিকে রসিকতা করে পয়ারে, আবার পঞ্চম অঙ্কে ভগবানবাবু কদাচার সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তিও করেন পয়ারে। এতে প্রাচীন যাত্রারীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটক-টিতে মাত্র ৪র্থ অঙ্কে অন্ধ ভিক্ষুকের দুটি গান আছে। রাগিণী ইমন্ তাল একতালাতে ভিক্ষুক—আমি রাতি ভিকারী কানা।' —এই গান গায়। দ্বিতীয় গানের রাগিণী ললিত-তাল জৎ। দুটি গানেই সে নিজের দুঃখ জানিয়ে মৃত্যু কামনা করে। — অন্ধ ভিক্ষুকের ভিক্ষার চাল বিক্রি ক'রে নেশার চাটের যোগাড় করার মত নীচ মনোবৃত্তিও কান্তিচন্দ্র এবং মধুসূদনের ছিল। এদের নীচতার পরিচয় দিতে নাট্যকার অন্ধ ভিক্ষুকের পরিকল্পনা করেছেন। নাটকের নামকরণ বিষয়ে বিজ্ঞাপনে নাট্যকার

'দলাদলি প্রিয় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকদিগকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াই দলাদলি ব্যাপার উল্লেখ করিয়াছি' স্বীকার ক'রলেও গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল প্রভৃতির বিষয় বলতে গিয়ে দলাদলির ব্যাপার গৌণ হ'য়ে গেছে।

ভগবানবাবু একজন শিক্ষক, জ্ঞানী, সৎ, বিবেচক ও পরোপকারী। যারা তাঁকে অপমান করে তাদের উপকার করতেও তিনি বিরত নন। ৫ম অঙ্কে তাঁর স্বগত আক্ষেপ স্মরণীয়—'কবে এরা চিরবর্দ্ধিত দলাদলি প্রভৃতি কুপ্রথা সকল পরিত্যাগ করে্যে সুপ্রথা সকল অবলম্বন কোরবে, কবে এরা নেসা ত্যাগ করে্যে, লোকের সহিত সদ্ব্যবহার কোরবে, কবে এরা লোকের নিকট কৃতজ্ঞ হতে শিখবে। নাট্যকার ভগবানবাবুকে আদর্শের পুতুল সৃষ্টি করেছেন। মধুসূদন, কান্তিচন্দ্র, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নেশাখোর চরিত্রগুলি একাকার হয়ে যায় না। 'কেবল মধু নাম মাত্র রহিয়াছে,' ব'লে মধুসূদনের মামা ভবশঙ্কর ন্যায়রত্ন আক্ষেপ করেছেন। কান্তির মা স্বগত ভাষণে 'এমন পোড়ার মুখো ছেলেকেও পোড়াপেটে ধরে্যেছিলুম' ব'লে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কান্তি তার বোনের বিষয়ে মাকে সাবধান হ'তে বলেছে। নেশাখোর ব্যক্তি নেশার খরচ যোগাড় করতে দলাদলি করে। বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র ক'রে যখন পণ্ডিতদের মধ্যে দলাদলি তখন 'কাণ্ডজ্ঞানশূন্য' ব্যক্তিদের এনিয়ে দলাদিল হবে—এতে আশ্চর্য কি। ভবশঙ্করের মত সুবুদ্ধি সম্পন্ন লোক মধুসূদনকে 'এরূপ অল্প বয়স্কা বিধবা অবলার বিবাহ হইলেই তো দেশের মঙ্গল।' —এই ব'লে বিধবাবিবাহ সমর্থন করলেও মধুসূদন যুক্তি দেখায়, 'বলি কি একি কখন হয়ে থাকে, না কখন ব্যাভার আছে?' বিধবাবিবাহ 'আমাদের দেশেই নূতন বোধ হইতেছে, কিন্তু বহুকালাবধি অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে।' —এই ব'লে ভবশঙ্কর মধুসূদনের যুক্তি খণ্ডন করলে সে রুষ্ট হয়। ভূতনাথের মত নেশাখোর লোকই বলতে পারে—'বাবারে। একি লোকের ঘট্যে বাট্যে চুরি করা, না লোকের বৌ ঝী বার করা যে, লোকে হেসে উড়িয়ে দেবে। একেবারে জাত্যন্তর! আমাদের এতে আস্‌কারা দেয়া হবে না?'

দ্বিতীয় অঙ্কে বকুলতলার পুষ্করিণীতে বিমলা, মালতী, রাধামণি, তারামণি এবং ছোটবধূর উপস্থিতিতে রঙ্গ রসিকাতার সূত্র ধ'রে আমরা

উত্তরপাড়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণপাড়ার দল পাকানোর কথা জানতে পারি। এই নারীচরিত্রগুলি ও একাকার হয় নাই।

দলাদলি নিয়ে চেঁচামেচি চলে ব'লে গোপালবাবু বলেন, 'যাবৎ এই অনিষ্টকারী দলাদলি আমাদের দেশে প্রচলিত থাকবে, তাবৎ কিছুতেই আমাদের দেশোপকারক বিদ্যালয়, ব্রহ্মসমাজ প্রভৃতি শুভকর ব্যাপারের শ্রীবৃদ্ধি হবে না।' বিধবাবিবাহে অগ্রণী ব্যক্তিদের নানারকম সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হ'ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের বিপদে সাহায্য করতেন। ভগবানবাবু রাখালবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে দলাদলির জন্য বলেন, 'এমন কি মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনার এই কর্ম্মে আনবো।'

নাটকটির স্থায়ী রস হাস্যরস। নেশাখোর ও দলাদলিপ্রিয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের ঘৃণার ভাব জাগে। সময়ে সময়ে হাস্য ও অদ্ভুত রস পরিবেষণে নাট্যকার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ দলাদলি বিষয়ক নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এই নাটকটি তারই জন্য রচিত কিনা বলা যায় না। বিজ্ঞাপনে লেখক তাঁর বন্ধু গোপালচন্দ্র দত্ত এবং সাতকড়ি দত্তের এই গ্রন্থ রচনার সাহায্যের কথা স্বীকার করেছেন। তৃতীয় অঙ্কে রাখালচন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের বিবরণে শুধু ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায়ের কেন অনেকেরই লালা নিঃসরণ হবে। এ রকম খাদ্য তালিকা রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকের উত্তম ফলারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরিশেষে কিছু ত্রুটির কথা ব'লে আলোচনা শেষ করব। চতুর্থ অঙ্কে অন্ধ ভিক্ষুকের দ্বিতীয় গানের শেষে 'মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এবং কান্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুনঃপ্রবেশ' লেখা আছে; কিন্তু এই অঙ্কে তাদের পূর্বে প্রবেশের উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে ভগবানবাবু দলাদলির ব্যাপারে যা বলেন তা তাঁর নিজের কথা না হ'লেও সুরুচির পরিচায়ক নয়। তিনি বলেন, 'এক মহাপুরুষ হাতের জাবের পাতা দূরে ছুড়ে ফেল্যে দিয়ে আঙুল নেড়্যে চেঁচিয়ে বল্লেন, "আমি অমন ফলারে মুতে দেই", আবার তিনি বল্লেন, 'পার্ব্বতী চরণ রায় আমার কথায় অত্যন্ত রেগ্যে বল্লেন,

"হবে তুই বাড়ী যা, আপনার গোবের ঠিকানা করগে? বড় কল্লে পেটের ভূত—যার মার শ্রাদ্ধ সে বড় কত্তে পাল্লে, তা উনি এসেছেন আবার মদ্দুলি কত্তে।" এই নাটক জনপ্রিয় না হওয়ায় অভিনীত হয় নাই এবং অন্য কোন সংস্করণও এর হয় নাই।

২। অশুভ পরিহারক—অজ্ঞাত। ঢাকা, ১৭৮৪ শক।

বিধবাবিবাহ বিষয়ক অভ্যুত্থানের অশুভ পরিহারক ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র তাঁর 'ম্যাও ধরবে কে?' এই প্রহসনের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন 'শুভস্য শীঘ্রং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাও যুক্তিবত্তা সংস্কৃত রচিত হইয়া প্রচারিত হইলে তদ্বিরুদ্ধে 'অশুভস্য কালহরণং" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ হয়, তাহাতে বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক কতিপয় আপত্তি লিখিত হইয়াছিল। আমি তৎতাবৎ খণ্ডনোদ্দেশে "সবুরের গাছে মেওয়া ফলে" নামে একখান প্রহসন প্রচারণে প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎ প্রতিপালনে সচেষ্ট হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে এতন্নগরীয় কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি 'অশুভ পরিহারক' নামে এক পুস্তক প্রচার পূর্ব্বক অশুভস্য কালহরণং এর আপত্তি সমূহ খণ্ডন করিয়া আমাকে সংকল্পিত পুস্তক প্রণয়নের পরিশ্রম হইতে মুক্তি প্রদান করেন।' সুতরাং অশুভ পরিহারক কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির রচনা এবং তাঁরা সমাজের ভয়েই হোক বা কোন বিশেষ জনের নাম দিতে অনিচ্ছার জন্যই হোক এতে গ্রন্থকারের নাম দেন নাই। এর কাহিনী এই—উপেন্দ্র, মহেন্দ্র ও মহিম তথাকথিত ভক্তদের চরিত্রদোষ সম্বন্ধে আলোচনা করে। প্রসঙ্গ ক্রমে শ্যামচাঁদের বিধবা কন্যার গর্ভপাতের বিষয় উঠে। তাদের আলোচনার সময় বিসখা নামে এক বিধবা এক মুসলমানের সঙ্গে বের হয়ে যাওয়ায় চৌকিদাররা তাকে তাড়া করে। বিসখা উপেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতির সাহায্য চাইলে মহিমের প্রস্তাবে সে চৌকিদারদের কাঁকন দিয়ে বিদায় করে। বিধবার বিবাহ না দেওয়ার এই ফল ব'লে উপেন্দ্র, মহেন্দ্র ও মহিম জানায়। চূড়ামণি এসে উপস্থিত হ'লে তাঁকে নিয়ে তারা ভুবনবাবুর, বৈঠকখানার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে। বিদ্যাভূষণ বিধবাবিবাহের বিপক্ষে একখানি পুস্তক লেখায় ভুবনবাবুর বৈঠকখানায় উপেন্দ্র, মহেন্দ্র, মহিম, ভুবন প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে

শাস্ত্র আলোচনায় রত হয়। বিদ্যাভূষণ পরাজিত হ'লেও কার্যক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ না করায় সমাজে নানা রকম কুক্রিয়া ঘটছে ব'লে উপেন্দ্র, ভুবন প্রভৃতি আক্ষেপ করতে থাকে।

গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন হ'তে আমরা জানি এতে ব্যবহার বিরুদ্ধ শাস্ত্র সম্মত কার্য অনুষ্ঠানে' আমাদের ব্রতী হ'তে বলা হয়েছে এবং এটি 'বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে অশুভস্য কালহরণং নামে' গ্রন্থের 'উত্তরস্বরূপ' রচিত। শাস্ত্রসম্মত কার্যকে ব্যবহারে আনা কষ্টকর এবং কাহিনীর দিকে এটি নাটকীয় হতে পারে। কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে অশুভস্য কালহরণং নামে পুস্তকের উত্তরস্বরূপ এইগ্রন্থ রচিত হওয়ায় বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মহেন্দ্র, উপেন্দ্র, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির শাস্ত্র আলোচনায় যতই পাণ্ডিত্য থাকুক তা নাটকের অগ্রগতিতে বাধা দিয়েছে। ভুবন, মহেন্দ্র, মহিম প্রভৃতি ছাঁচে ঢালা টাইপ চরিত্র। নাটকটিতে ৩টি চক্র আছে। ১ম চক্রে বিধবাবিবাহ না দেওয়ার জন্য শ্যামচাঁদের কন্যার গর্ভের বিষয়ে আলোচনায় নাটকের আরম্ভ, ঐ চক্রেই বিসখার মুসলমানের সঙ্গে পলায়নে ঘটনার চরম উন্নতি এবং দ্বিতীয় চক্রে বিদ্যাভূষণও চূড়ামণির সঙ্গে তর্ক এবং তাঁদেব পরাজয়ে নাটকের পরিণতি। তৃতীয় চক্র নিষ্প্রয়োজন। কেবল ঢাকা প্রকাশের ও সভাসমিতির ব্যর্থতার কথা জানিয়ে আক্ষেপের মধ্য দিয়ে এই চক্র শেষ। নাটকটিতে অঙ্কের পরিবর্তে চক্র ব্যবহার বিচিত্র। ঘটনাস্থল ১ম চক্র রাজপথ, ২য় ও ৩য় চক্র ভুবনবাবুর বৈঠকখানা। স্থানঐক্য এবং কালঐক্য বজায় থাকলেও ২য় চক্রে মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞ বল্ক্য সংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতির উল্লেখে এবং তর্কের দীর্ঘ অবতারণায় গতিঐক্য ক্ষুণ্ণ। স্বল্প পরিসরে বিসখা, চৌকিদারগণ, বিদ্যাভূষণ ও চূড়ামণি স্ব স্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ঢাকা প্রকাশ এবং সভাসমিতি যখন কিছু করতে পারল না তখন ভুবন 'হা দগ্ধ দেশাচার! তোমার কি করাল কুটিলানন, তোমার মুখচ্ছবি দৃষ্টে অসহায়া বিধবা কুলবালারা যৎপরোনাস্তি সন্তাপ ভোগ করিতেছে এবং লোকভয়ে গোপনে ২ যে কত প্রাণী নষ্ট করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে। .........হা বঙ্গভূমি, তুমি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া

শীঘ্রই তোমার 'অশুভ সমূহ পরিহার কর।' —ব'লে আক্ষেপ করেছে। এই নাটক অভিনীত হ'লে লাভ হ'ত। কিন্তু এই নাটকের অভিনয়ের কোন বিবরণ জানা নাই। বিধবার সঙ্গে ব্যভিচারকারী যারা তারাই বিধবাবিবাহে এ নাটকে আপত্তি জানিয়েছে। মহেন্দ্র বলে 'এ কথায় সায় দিবে কেন? তা হ'লে যে অনেকের রাসলীলা সম্বরণ হয়।' এই নাটকে এক হিন্দু বিধবার মুসলমানের সঙ্গে প্রণয়ের অবতারণায় নাট্যকার নতুন পথ দেখিয়েছেন। বিধবাবিরহ নাটকে, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে হাড়ি ও যবনীর প্রতি আসক্তি প্রকাশিত।

এত কাণ্ডের পর আমরা চৌকিদারদের ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে উপেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতির উপর অসন্তুষ্ট। এই কি তাদের সমাজ সংস্কারের প্রথম ধাপ? রাজপথে এদের আলোচনা কেউ শুনে নাই। যদিও বিসখা এবং চৌকিদাররা শুনে থাকে তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। কারণ এর পর বিসখা দেহ দান করবে এবং চৌকিদাররা ঘুষ নিয়ে সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রস্থান করবে। বিদ্যাভূষণ চূড়ামণির মত গোঁড়া হিন্দুকে পরাজিত ক'রে দেশাচারের অশুভ পরিহার করা যায় না। গ্রন্থকার বিধবাবিবাহের পক্ষে নাটক রচনা না ক'রে উপন্যাস রচনা করলে ভাল হত। এতে নাটকীয় কাহিনীর গাঁথুনি নাই। বীর, শৃঙ্গার, বীভৎস, হাস্য প্রভৃতি রসের অবতারণা থাকলেও কোন রসই প্রাধান্য লাভ করে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের পর বিধবাবিবাহের পক্ষে প্রবন্ধ রচনা করলে কেউ সমাদর করবে না—এই ভেবে গ্রন্থকার নাটক রচনা ক'রে 'এই এক নূতন' ব'লে চালাতে চান।

৯। ম্যাও ধর্‌বে কে? শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র। ঢাকা। সন ১২৬৯।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র 'সবুরের গাছে মেওয়া ফলে' নামে একখানি প্রহসন রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 'অশুভ পরিহারক' রচিত হওয়ায় উক্ত প্রহসন রচনা না ক'রে তিনি ১২৬৯ সালে 'ম্যাও ধর্‌বে কে?' প্রহসন প্রকাশ করেন। এর কাহিনী এই—বিধবা কুমুদিনীর বিবাহ দিতে প্রভাতবাবু, ঈশ্বরবাবু প্রভৃতি নব্য সম্প্রদায় গোষ্ঠী ইচ্ছুক। বিদ্যাভূষণ, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন এতে অসম্মত। কুমুদিনী, কামিনী, সরলা প্রভৃতি বিধবা বিবাহ করতে চাইলেও সমাজ তা স্বীকার না করায়

তারা সমাজকে দোষ দেয়। প্রভাতবাবু গোপনে কুমুদিনী ও সরলার মন জেনেছে। সে আশা করে শশাঙ্কমোহন কুমুদিনীকে বিবাহ করবে। শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কমোহনের পত্রে জানা যায় অভিভাবক, স্বদেশ ও স্বজনদের ভয়ে সে বিধবাবিবাহ করতে অসম্মত। অন্য কেউ ক'রে দৃষ্টান্ত দেখালে সে তা অনুসরণ করতে পারে।

নাট্যকার বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন 'এ দেশীয় বিধবাবিবাহ প্রচলনোদ্যোগি স্বাক্ষরকারিদিগকে উত্তেজনা করণাশয়ে বিগত বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে মৎকর্ত্তৃক "শুভস্য শীঘ্রং" নামে একখানী ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। আমি যে সময়ে এই পুস্তক প্রচারিত করি, তখন ভরসা করিয়াছিলাম, স্বাক্ষরকারীগণ অনতিবিলম্বে আপনাদিগের স্থির প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শাইনা এ প্রদেশে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া তুলিবেন। এক্ষণে সে আশা অন্তঃকরণ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ যেরূপ দীর্ঘ সুপ্তিতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয়, তাঁহারা কৃতার্থতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ঘটনোপলক্ষে এ প্রদেশে সাধারণে যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইল।' নাটকটি যে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক তা এই বিজ্ঞাপনের অংশে স্পষ্ট।

গ্রন্থটিতে নব্যসম্প্রদায় এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের পুরুষ চরিত্র চিত্রণে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু স্ত্রী চরিত্রের সবগুলিই বিধবাবিবাহের পক্ষে হওয়ায় তাদের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। উপস্থাপনা, অগ্রগতি, চরম অবস্থা, পরিণতি প্রভৃতি যথাযথ ভাবে পালিত না হ'লেও নাটকের লক্ষণ এতে কিছু কিছু আছে। দুটি অঙ্ক থাকায় প্রহসন ব'লে গ্রন্থটি গণ্য হ'তে পারে। দৃঢ় সংহতির অভাব এতে লক্ষ্য করা যায়। দুটি অঙ্কেই দুটি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে কমলিনী, কুমুদিনী, সরলা, কামিনী প্রভৃতির সংলাপের মধ্যে বিধবাবিবাহের উপস্থাপনা, ২য় গর্ভাঙ্কে কুমুদিনীর মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ, ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে কুমুদিনীকে বিবাহে শশাঙ্কমোহনের অসম্মতি এবং ২য় গর্ভাঙ্কে বিধবাবিবাহ না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। স্ত্রী চরিত্রগুলি ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে যা প্রকাশ করেছে ২য় গর্ভাঙ্কে তা-ই প্রকাশ করায় ঔৎসুক্য নষ্ট হয়। ২য় গর্ভাঙ্ক বাদ দিলেও মূল বিষয়ে কোন ক্ষতি হ'ত না। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কের

# “ম্যাও ধরবে কে?”

শ্রীহরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।

বিরাট পর্ব্ব।

সন ১২৬৯ সাল

ঢাকা নূতনযন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ।৵০ আনা।

ম্যাও ধরবে কে? নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ

ঘটনাস্থল কোথায় তা জানা যায় না অনুমান—কমলিনীর শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ প্রভাতবাবুর বাড়ী। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল পল্লিগ্রাম—প্রভাতবাবুর শ্বশুরালয়। দ্বিতীয় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল হরদয়াল ঘোষের বাহির বাড়ী—বৈঠকখানা। কিন্তু এখানে 'প্রভাতবাবুর শ্বশুরালয় বাহির বাড়ী বৈঠকখানা' লিখলে ভাল হ'ত। আমাদের সন্দেহ হ'ত না হরদয়াল ঘোষ প্রভাতবাবুর শ্বশুর কি না। ২য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল শ্রীনাথদের বাটী। সুতরাং স্থানঐক্য এবং কালঐক্য মোটামুটি রক্ষিত হ'লেও ১ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে এবং ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে অহেতুক একই বিষয়ে অধিকক্ষণ সংলাপ চলায় গতির ত্রুটি ঘটেছে।

বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় ব'লে প্রথমে যা অপ্রচলিত পরে শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন হ'লে দেশাচার বিরুদ্ধ ব'লে ব্যাহত। সমাজ ও স্বজনের ভয়ে কেউ প্রথমে বিধবাবিবাহ করতে সম্মত নয় ব'লে কবিকঙ্কণ বিড়ালের 'ম্যাও ধরবে কে? এই গল্পে এই বিষয় আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দেই বিধবাবিবাহ ঘটেছে। তার অনেক পরে ১২৬৯ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত। তখনও প্রথম বিধবাবিবাহে বাধা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? এ সময়ের মধ্যে অনেক বিধবাবিবাহ হয়ে গেছে সুতরাং মনে করা স্বাভাবিক যে গ্রন্থটি পূর্বে রচিত কিন্তু পরে প্রকাশিত।

প্রভাতবাবু নব্যসম্প্রদায়ের প্রধান। তিনি কুমুদিনীর মত বিধবার বিবাহ দিতে চান এবং বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত জেনেই তিনি শশাঙ্কমোহনকে পাত্র স্থির করেন। ১ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে বাগানে লুকিয়ে থেকে কুমুদিনীর মনের অভিপ্রায় জানবার ইচ্ছা সমর্থন করা যায় না। এই অবস্থায় অন্য কেউ দেখলে তাঁকে লম্পট মনে করতে পারে। তবে তিনি এ বিষয়ে সচেতন। 'হা অবিবেকি বিধাতঃ! তুমি কি নিদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণানলে নিয়ত দগ্ধ করবে বলে এদিকে এরূপ সদ্‌গুণ সম্পন্না করে সৃষ্টি করেছিলে?' —এই আক্ষেপে তাঁর সমবেদনা প্রকাশিত। ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে শশাঙ্কবাবু বিধবা কুমুদিনীকে বিবাহ করতে অমত করলে প্রভাতবাবুর মুখ হ'তে ইংরেজী শব্দ বের হ'তে

লাগল। পূর্বের ভাষার সঙ্গে এর পার্থক্যে আমাদের মনে হয় নব্যসম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হ'লে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন। সুতরাং কবিকঙ্কণের উক্তি দোষের নয়।

ঈশ্বরবাবুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাকে প্রভাতবাবুর চেলা বলা যায়। শ্রীনাথদের পুত্র রসিক দে স্কুলের হেড মাষ্টারী করে। সে ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক। অনেক দিন পরে তার বাড়ী আসা উপলক্ষে বাড়ীতে শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান হয়। এতে বাই ও খেমটাওয়ালীর আগমনে রসিকবাবুর নব্যভাবে ত্রুটি ঘটেছে। ঈশ্বরবাবু তার চরিত্র সম্পর্কে যখন বলে, 'ও যখন ব্রাহ্মসমাজে ঢোকে তখন হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতস্বরে "সত্যজ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্মং" পাঠ করে, আবার যখন চর্চ্চে প্রবেশ করে তখন "ও লড মাই গড!" বলে চিৎকার করে, আবার যখন পৌত্তলিক দলে মেশে তখন হয় "বম্ বম্ হরে হরে" নয় "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলে মালা ঠকঠকায়। ওর কাছে উইলসনের হোটেল যেমন পবিত্র মহাপ্রভুর আখড়াও তেম্‌নি ওর মতন কি হিপক্রীট দুটী আছে।' —তখন আমাদের প্রতিবাদ করতে মন যায় না।

এই প্রহসনের নায়ক শশাঙ্কমোহন যেমন ভীরু এবং দুর্বলচিত্ত গ্রন্থকারও তেমন তাকে নেপথ্যেই রেখে গ্রন্থ শেষ করেছেন। নায়িকা কুমুদিনী বিধবা, যুবতী ও বিদুষী। তার ভগিনী মোহিনীর বিবাহে বিধবা ব'লে সে যেতে চায় না। শুভ কাজে বিধবারা অশুচি। তাদের এ জন্য দুঃখের অন্ত নাই। কুমুদিনী নব্যপন্থীদের বিধবাবিবাহে কাল-বিলম্বে কঠোর সমালোচনা করে। ঠান্‌দিদির উপস্থিতিতে যে হাস্যরসের ছড়াছড়ি চলে কুমুদিনী তাতে প্রায় অংশ গ্রহণ করে না কিন্তু সরলা ও কামিনী ঠান্‌দিদির সঙ্গে নিকৃষ্ট ধরণের রসিকতায় মেতে উঠে। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে কুমুদিনীর শুধু গদ্য সংলাপ কিন্তু ২য় গর্ভাঙ্কে সে পদ্যে সরলার সঙ্গে মনোভাব ব্যক্ত করে। সরলা ও কম যায় না। এখানে পদ্যের ছড়াছড়ি। বিধবা মনোরঞ্জনের কুমুদিনী ও চন্দ্রকান্তের সঙ্গে এর কুমুদিনী ও শশাঙ্কমোহনের নামের মিল থাকলেও চন্দ্রকান্তের মত সাহস শশাঙ্কমোহনের নাই।

কমলিনী কুমুদিনীর অগ্রজা ও প্রভাতবাবুর স্ত্রী। স্বামীর মতই সেও

বিধবাবিবাহে আগ্রহী। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের সুফল দেখিয়ে দিলেও গোঁড়ারা দেখে না ব'লে তার আক্ষেপের অন্ত নাই। কিন্তু 'যতদিন স্বাক্ষরকারীদের আড়ম্বর শুনতে পাই নাই; ততদিন একপ্রকার কপাল খেয়িয়ে আপনা আপনি প্রবোধ মেনে থাকতেম, এখন আর তা পারিনে।' —বলা যুক্তিহীন। কারণ তার কপাল খারাপ কিসে? স্বামীর জন্য তার বরং গর্ব করা উচিত। কুমুদিনীর কপাল খেয়িয়ে থাকার কথা বলা দরকার ছিল। সে ঠাকুরুণদিদির সঙ্গে স্থূল রসিকতা করেছে। আবার তার আদরের দুলাল শরদের উপস্থিতিতে পুত্র গৌরবে গৌরবিনী মাতা —রূপে সে আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু 'প্রাণনাথ প্রভাত কবে আসবেন, ......ইত্যাদি কথা হিন্দুরীতি বিরোধী। যদি এটি তার সংস্কার মুক্ত মনের ভাষা হয় তা হ'লে সমালোচনার অতীত; কিন্তু সে পুরাণ শুনে ব'লে তাকে আধুনিকাও বলা চলে না।

ঠাকুরুণদিদি বর্ষীয়সী অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা। রসিকতার সময়ে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে কমলিনীকে উদ্দেশ্য করে ব'লে, 'দশজন রাড়ির মধ্যে একজন এয়ো থাকলে কি বলে তা ত জানিস? তা এদের বাতাস লাগলে কি হয়—' এতে কমলিনী রাগ করতে পারত। সে পাল্টা রসিকতা ক'রে শোধ নেয় -( উঠিয়া অঞ্চলের বাতাস দিয়া ) 'ঠান্দিদি, এই তোমার গায়ে ভাই আমার বাতাস লাগিয়ে দিলাম, এখন শীগ্রী ২ সধবার দলে মেশ।' এই গ্রন্থের ঠাকুরুণ দিদি বিধবা মনোরঞ্জন নাটকের ঠাকুরুণ দিদির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ঠান্দিদি "পুরুষের জাত টিয়ের জাত" বলে। ঠান্দিদির সব সুখই ছিল। আমরাও তার মত 'কতদিনে এদেশে বিধবাবিবাহের চলন হবে? কতদিনে এ দেশের বিধবারা বৈধব্যযন্ত্রণা হতে নিস্তার পাবে?' ব'লে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি।

১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে গদ্য সংলাপ ভাল হওয়ায় ২য় গর্ভাঙ্কে দীর্ঘ ৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রকৃতি বর্ণনায় প্রভাতবাবুর মুখে ত্রিপদী ব্যবহৃত। কুমুদিনীও ২ পৃষ্ঠাব্যাপী ত্রিপদী ব্যবহার করেছে। এরপর কুমুদিনীও সরলার সংলাপকে তরজা বা কবিগানের নূতন সংস্করণ বলা চলে। মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপে প্রাচীন যাত্রারীতি অনুসৃত। এত বলার পরও

প্রভাতবাবু যাতে কুমুদিনীর অভিপ্রায় বুঝতে পারেন তার জন্য কুমুদিনীকে বিশেষ বিশেষ রাগিণী ও তালে দুটি গান গাইতে হয়। নেপথ্যে রাগিণী আলিয়া তাল কাওয়ালিতে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় ব'লে গোঁড়ারা যে মত বের করেছে তার কথা আছে। 'শুভস্য শীঘ্রং' এবং 'অশুভস্য কালহরণং' এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের ইঙ্গিত ও নেপথ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশাচারই যে বিধবাবিবাহের বাধা তা রাগিণী আলিয়া তাল কাওয়ালিতে নেপথ্যের 'দূর দূর দূর অরে দেশাচার.' এই গানটিতে প্রকাশিত। শ্রীনাথ দের বাড়ীতে শ্যামাপূজা উপলক্ষে বাইয়ের দুটি গানে এবং খেমটাওয়ালীর একটি গানে তৎকাল—প্রচলিত রীতি অক্ষুণ্ণ। গ্রন্থকার প্রত্যেকটি গানে রাগিণীও তাল উল্লেখ করায় তাঁর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা স্বীকার্য।

২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে রামদয়াল ঘোষ, উমেশ রায়, মজুমদারও তর্কবাগীশের প্রবেশ ঘটে। নামের তালিকায় রামদয়াল ঘোষ নাই। দেবীসিংহ 'যো হোকম্ মহারাজ.' বলার জন্য এতে উপস্থিত। তাকে বাদ দিলে ভাল হ'ত।

কবিকঙ্কণের 'একটী অতিবৃদ্ধ দূরদর্শী মূষিক কহিল সকলে ত চির-শত্রু বিড়াল বধ করিবে বলিয়া মাতিয়া পড়িয়াছে। সকলে এ প্রত্যঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ ধরিতে প্রতিজ্ঞাও করিতেছে কিন্তু বল দেখি তোমাদের মধ্যে-সেই বিড়ালের "ম্যাও ধরবে কে?" এই কথায় সকলের হাস্যে যবনিকা পতন ঘটে। এই হাস্যের অন্তরালে বিধবাবিবাহে আপত্তি ও অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সুতরাং 'ম্যাও ধর্‌বে কে?' গ্রন্থটি একটি উচ্চাঙ্গের প্রহসন।

১০। বিধবাবিলাস নাটক—শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর
১৮৬৪ বাংলা ১২৭১

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বিধবাবিলাস নাটক প্রকাশ করেন। এর কাহিনী এই :—সুমতি, সুনীতি প্রভৃতি বিধবাগণ মদনের বাণে জর্জরিত হ'য়ে দেশাচার—রাজার কাছে মদনের বিরুদ্ধে নালিশ করে। তাদের উকীল হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেশাচার রাজাকে যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য্য মন্ত্রী বশে রাখেন এবং উকীলের সঙ্গে তর্কে পরাজিত

হয়েও বিধবাবিবাহ প্রচলিত নয় ব'লে মন্ত্রী তা স্বীকার করেন না। বিলাসিনী, রঙ্গিণী, রসবতী প্রভৃতি গর্ভবতী বিধবাগণ বিধবাবিবাহে আপত্তি জানায়। দেশাচার—রাজা মদনকে কোন শাস্তি না দিয়ে বিধবাবিবাহ অনুচিত কিন্তু বিধবারা গোপনে পুরুষ সংসর্গ করতে পারবে কিন্তু প্রকাশ হ'লে রীতিমত দণ্ড পাবে—এ রকম রায় দেন। রাজা সতীকে, মন্ত্রী সাবিত্রীকে এবং অন্যান্য পুরুষ সুমতি, সুশীলা, বুলবালা প্রভৃতি বিধবাকে নিয়ে প্রস্থান করলে কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কন্যাদের উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। সতী দেশাচার রাজাকে অনুরোধ করে তাকে বিবাহ ক'রে তার সঙ্গে মিলিত হ'তে কিন্তু রাজা তার অনুরোধ রক্ষা করতে চান না। অন্যদিকে প্রজারা সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়ে সসৈন্যে উপস্থিত হ'লে রাজ-সেনাপতি মূর্খতা পলায়ন করতে চেষ্টা করে। তাকে ধ'রে এনে শিরশ্ছেদ ক'রে তার রক্তধারায় ধরাতল পবিত্র ক'রে বিধবাদের বিবাহ দেওয়া হয় এবং সেই বিবাহে যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য্যকে শাস্তিস্বরূপ পৌরোহিত্য করতে হয়।

বিধবাবিলাস নাটকে 'বিধবা ললনাগণের বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে এতদ্দেশে যে সমস্ত দুরদৃষ্ট ঘটিতেছে তাহার যুক্তি-সঙ্গত নানাবিধ কারণ প্রদর্শন পুর্ব্বক অতি গোপনীয় সংবাদ-সহ এতৎ প্রস্তাব'—এ রকম লিখিত থাকায় এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কৌলীন্যপ্রথাই যে বিধবা সৃষ্টির হেতু তা আমরা সাবিত্রীর মুখে শুনি।

বিদ্যাসাগর চেষ্টা ক'রে বিধবার বিবাহ দিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। এ দেশে ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজী হন নাই ব'লে উল্লেখ আছে। যুক্তি তর্কের স্থান নাই। অজ্ঞানতা, দলাদলি দেশ-পরিব্যাপ্ত। কুলত্যাগ, গোপনে দ্বিচারিণী, পুরুষের স্ত্রী বিয়োগের পর স্ত্রী গ্রহণ, বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষমতা, প্রজাবৃদ্ধি বন্ধ, অন্যদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, পরাশরবিধি, বরপণ ইত্যাদি বিধবাবিবাহের পক্ষে যুক্তি হ'লেও কেউ মানে না। আবার বারেন্দ্রও বংশজের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা। তাদের কুলগৌরব না থাকায় অনেক টাকা কন্যাপণ দিতে হয় ব'লে অনেকের বিবাহ হয় না। সেজন্য মিছেরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিদাস ভট্টাচার্য্য বিধবাবিবাহ করতে ইচ্ছুক।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিলাসিনী, রঙ্গিণী, কাঞ্চনী ও রসবতীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নাট্যকার সামাজিক অধঃপতনের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা রসবতীর উপপতি করিম সেখ! ভগীর উপপতির উপস্থিতিতে তাকে কুকুর, বোকা ছাগল করা হয়েছে। সমাজের নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হাস্যরস পরিবেষিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পূর্বে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য আন্দোলন করেন। সতীদাহ বন্ধের ফলে বহু বিধবার সৃষ্টি। তাদের বিবাহ না দিলে নতুন সমস্যা। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সতী ও সুমতির সংলাপে এ বিষয়ে তাদের মনোভাব জানি—

সুমতি। আগে তো বিনি অপরাধে পুড়িয়ে মারিত।

সতী। সাহেবদের কি দয়ার শরীর। দেখ ভাই আজো আমরা বেঁচে আছি।

সুমতি। সেটা বড় দয়াব কর্ম্ম হয় নিলো! আমাদের দেশের পুরুষদের গুণে সে যেমন মোল্লাদের মুর্গি পোষা হয়েছে।

নাটকটিতে ছটি অঙ্ক। ১ম অঙ্কে কোন গর্ভাঙ্ক নাই। ২য় অঙ্কের প্রথমে কোন গর্ভাঙ্কের পবিচয় নাই, একেবারে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের উল্লেখ আছে। ৩য় ও ৪র্থ অঙ্কে ছুটি ক'বে, ৫ম অঙ্কে তিনটি এবং ৬ষ্ঠ অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে প্রস্তাবনায় প্রজাপতি বন্দনার শেষে সূত্রধারের বসন্ত সমাগমে যুবতী বিধবাগণের বিরহের বিষয় আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণনার পর সঙ্গীতরসে সভ্যগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রেয়সীর ডাক পড়ে। নটী এসে অসময়ে তাকে ডাকার জন্য অনুযোগ এবং নিজের দীনতা প্রকাশ করলেও নট গুণিগণের নিকট বিধবাবিলাস নাটকের অভিনয় করতে প্রস্তুত হ'তে বলে। প্রথম অঙ্কে যুবতী বিধবাগণের মদনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং এই উদ্দেশ্যে দেশাচার—রাজার নিকটে বিদ্যাসাগর-উকীলের মারফতে দরখাস্ত পেশ, দ্বিতীয়াঙ্কে ঘটনার অগ্রগতি রাজা বিধবাদের দুঃখে দুঃখিত কিন্তু মন্ত্রী তার বিপরীত। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে রাজসভায় বিধবাদের উপস্থিতি, পঞ্চম অঙ্কে উকীলের কাছে মন্ত্রীর পরাজয় ঘটলেও রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে প্রথার পক্ষপাতী

হয়ে মদনকে শাস্তি দেন না পক্ষান্তরে বিধবাগণকে গোপনে অবৈধভাবে পুরুষ সংসর্গ করতে বলেন। এই ভাবে ঘটনার চরম অবস্থা ঘটে। বিধবাগণ বাড়ীতে না ফেরার জন্য তাদের আত্মীয়বর্গ অসন্তুষ্ট হ'য়ে রাজবাড়ী আক্রমণ ক'রে রাজার শিরশ্ছেদ করে এবং বিধবাবিবাহ ঘটায়। এই ভাবে অবনতি ও পরিণতি দেখান হয়েছে। স্থানঐক্য এবং কাল-ঐক্য মোটামুটি বজায় আছে। অঙ্কের দিকে ঘটনার গতি ঠিক থাকলেও পঞ্চমাঙ্কের প্রথম ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কের বিষয়বস্তু এক হওয়ায় গতিঐক্য ক্ষুণ্ণ। ষষ্ঠাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক নাটকের মুখ্য বিষয়ের সঙ্গে ঠিক সম্পর্কযুক্ত না হওয়ায় একটু দোষদুষ্ট। নাটকটিতে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস প্রভৃতি রস পরিবেষিত হ'লেও কোন রস প্রধান্য লাভ করে নাই। শেষ দিকে ভয়ানক রস আকস্মিকভাবে এসে পড়ায় রস উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

চরিত্র প্রসঙ্গে দেশাচার রাজা, রাজপক্ষে সৈন্যাধ্যক্ষ মূর্খতা, মদন, প্রজাপক্ষে সৈন্যাধ্যক্ষ জ্ঞান প্রভৃতি চরিত্র পৌরাণিক নাটকের চরিত্রের কথা স্মরণ করায়। পক্ষান্তরে সুমতি, সুনীতি ও সুশীলা যথাযথ। এই হিসাবে সতী ও পতিব্রতার নামকরণ ঠিক হয় নাই। অপরপক্ষে গর্ভবতী বিধবাগণ রঙ্গরস ও বিলাসিতায় সমাজের এক নগ্নরূপ পরিস্ফুট করায় তাদের রঙ্গিণী, রসবতী, বিলাসিনী প্রভৃতি নাম সার্থক। যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য্যের নাম তার চরিত্রের অনুগামী। এ রকম নাম কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটকে পাওয়া যায়। কুলপ্রিয়, কুলপ্রদীপ এবং কুলতীলক প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। তবে কুলতীলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় থাকলেও নাটকটির মধ্যে তার কোন ক্রিয়া পাওয়া যায় না। সুমতি, সুনীতি, সাবিত্রী প্রভৃতি কুলীন কন্যার দুঃখের অন্ত নাই। সুনীতি বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী কুলীন ঘরে নারী হয়ে জন্ম যেন না হয়—এ রকম কামনা করে। সুমতি দুঃখে আত্মহত্যা করতে চায় কিন্তু এত দুঃখের মাঝেও তারা হাসি ভুলে যায় না—

সতী। আজ যে বকুলফুল বড় অনুকূল।

সুনীতি। কে জানে হয়েছ তুমি ডুমুরের ফুল।

সুনীতি। হাঁলো কুলবালা! তোর মনটা আজ যে বড় ভারি ভারি দেখছি কেন। সত্তি করে বলিস।

কুলবালা। সকল দিন মন কি সমান থাকে, আজ সের ৫।৬ বেড়েছে লো।

হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা সুনীতি বেশ বলে—'পুরুষদের একটা থাকতে ২ যে দশ পোনেরটা বিয়ে হয় তাতে তো স্বর্গের দ্বাবে কাটা পড়ে না'। আর আমাদের যদি মরে গেলেও আব একটা বিয়ে হয় তা হলেই সর্ব্বনাশ। এ বড় চমৎকার বিচার। যেমন কথায় বলে—

দেবতার বেলা নীলে খেলা
পাপ লিখেছে মানুসেরবেলা'।

সতী, সাবিত্রী ও কুলবালার মধ্যে নারীর কোমলতা, রঙ্গ রসিকতা, বুদ্ধিপ্রয়োগ প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। সতী মদনের কুসুম-বাণে জর্জরিত হ'লেও অবৈধ ব'লে দেশাচারের প্রস্তাবে সম্মত নয়। নাট্যকার তার চরিত্রে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে বিলাসিনী, রঙ্গিণী প্রভৃতি গর্ভবতী বিধবাগণ বিধবাবিবাহে অসম্মত। রসবতী মুসলমান করিম সেখের সঙ্গে নিযুক্ত। সে এমনই নির্লজ্জ যে অপরকেও সে ঐ রকম নীচ পথে নিয়ে যেতে চায়। দেশাচার রাজার রায় হাস্য-কর। তাঁর মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁরই উপযুক্ত। তাঁর রাজত্বে বিধবা-বিবাহ নিষেধ কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে তার বিপরীত। বাংলাদেশের নারী-দের তিনি অশিক্ষার অন্ধকারে রাখেন ব'লে তারা গৃহকর্মের অবসরে বিবাদে কালহরণ করে। সুতরাং তিনি যে আম আচার বা কুলাচারের মতও নন তা বুঝা যায়। মন্ত্রী উকীলের নিকটে পরাজিত হ'য়ে তাঁকে প্রহার করেন। এটি তাঁর মত উপযুক্ত মন্ত্রীরই উপযুক্ত কাজ। তাঁকে দিয়ে পুরোহিতের কাজ করিয়ে প্রজারা ঠিক কাজই করেছে। মদন নাটকের ভিলেন চরিত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিধবাদের পক্ষে উকীল কল্পনা এবং বিধবাদের হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে তাঁর প্রহার লাভ অভিনব। অশুভ পরিহারক নাটকেও বিধবাবিবাহ বিরোধী মনো-ভাব তর্কে প্রকাশ করলে বিদ্যাভূষণের প্রায় প্রহার লাভের মত অবস্থা হয়।

এই নাটকে গদ্য পদ্য ( পয়ার ও ত্রিপদী ) সংলাপ আছে। ২য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে রাজা মিছেরামকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে পয়ারে ইঙ্গ বঙ্গ ভাষায় যে ভাবে উত্তর দেয় তা উনবিংশ শতাব্দীর অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির ভাষা।

শাস্ত্র টাস্ত্র জানি নাকে, পড়েছি ইংরাজী।
রূপি বিনে হইয়াছি বিধবাতে রাজি॥
পুয়োর সেলারী পাই লার্জ পরিবার।
আশা আছে এইবার, হব কৃতদার॥

৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে উকীল গদ্যে তিন পৃষ্ঠা এবং পদ্যে ( পয়ারে ) প্রায় সাত পৃষ্ঠা বক্তব্য জানান। এত দীর্ঘ বক্তৃতা অভিনয় কালে অসম্ভব। ৫ম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে উকীল ও মন্ত্রীর তর্ক শাস্ত্রসম্পর্কিত হওয়ায় সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের সারাংশ এই পুস্তকে উদ্ধৃত ব'লে নাট্যকার স্বীকার করেছেন। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে একই বিষয়ে পয়ার এবং ত্রিপদীতে তর্ক ভাল লাগে না। নাট্যকারের গদ্য, পয়ার এবং ত্রিপদী রচনার প্রশংসা করা চলে কিন্তু এটি নাটকীয় ত্রুটি।

নাটকটির সব গানেই রাগিণী এবং তাল উল্লেখ নাট্যকারের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রায় শেষদিকে রাগিণী বাহার তাল জৎ এ এবং রাগিণী বেহাগ তাল আড়খেমটায় যে দুটি গান আছে তাতে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটালে ভাল হ'ত। বিধবাবিবাহ সংঘটিত হল— সতী উদ্ধার হ'ল—নাটকও শেষ হ'ল। তা না ক'রে দেশাচার রাজার শিরশ্ছেদ করার পর তিনি বেঁচে আছেন এবং তাঁর ভয়ে সকলের পলায়ন দেখিয়ে নাট্যকার বিধবাবিবাহ দেশাচার-স্বীকৃত নয় বুঝাতে নাটকীয় মূল বিষয় ক্ষুণ্ণ করেছেন।

মুদ্রিত পুস্তকটির প্রথমে

**Consolation to the Hindu widows**

**by**

**Jadoo Nath Chatterjee**

**বিধবা বিলাস নাটক**

এই রকম লেখা আছে। কিন্তু Consolation to the Hindu widows. এর বাংলা বিধবাবিলাস করা যায় কি? বরং বিধবা আশ্বাস নাম দিলে ভাল হ'ত। আবার শুধু বাংলা নাম 'বিধবা বিলাস'কে বিধবা নিয়ে বিলাস অথবা বিধবার বিলাস এ রকম অর্থ করলে নাঃ করণের সার্থকতা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয় প্রবন্ধের নাট্যরূপ লিখলেও মন্দ হ'ত না। নাটকটির শেষে 'ইতি বিধবা বিলাস নাটকে প্রথম খণ্ডে সতী উদ্ধার নামক ষষ্ঠাঙ্ক সমাপ্ত' এ রকম লেখা আছে। অন্য কোন খণ্ড পাওয়া যায় না। তবে কি নাট্যকারের 'ইতি বিধবাবিলাস নাটকে দ্বিতীয় খণ্ডে সাবিত্রী উদ্ধার নামক·········সমাপ্ত' এ রকম লেখা কোন নাটক আছে?

নাট্যকার 'দেশস্থ বিধবাবন্ধু মহোদয়গণ সমীপে বিনয়পুর্ব্বক নিবেদন' ক'রে বলেছেন 'বিধবাবিলাস প্রস্তাব কোন নাটক নয়। কেবল নাটক ছলে এ দেশের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন মাত্র।' নাটক ব'লে মুদ্রিত অথচ নাটক বলতে চাইছেন না? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করতে অনেকেই নাটকের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ইনিও তাঁদের একজন। তবে দেশাচার রাজা এবং তাঁর পাত্রমিত্রগণ যখন তাঁর এই 'নাটক ছলে এ দেশের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন মাত্র' বিষয়ে জানতে পারবেন তখন তাঁকে রক্ষা করবে কে? মন্ত্রী বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের প্রহারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গতায়ু না হ'লে তিনি লেখককে সব রকম বিপদে রক্ষা করবেন। এমন কি তাঁর ওকালতি বুদ্ধি দেশাচার রাজার বিরুদ্ধে বিলাতে নালিশ জানাতে পরামর্শ দিবে।

# সপ্তম অধ্যায়

## বাল্যবিবাহ বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

বাল্যবিবাহের কথায় প্রথমে বিবাহের বিষয় আলোচনা করতে হয়। বি—বহ্+ঘঞ্=বিবাহ। বিশেষরূপে বহন করার অর্থ বিবাহ। সাধারণভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সুখদুঃখের ভার স্বামীর। তবে এর বিপরীত সমাজব্যবস্থাও উপস্থিত। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, ভালবাসা ও মৈত্রী পরস্পরের। অপ্রাপ্তবয়স্কের নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে ঠিক ধারনা না থাকায় অপরের দায়িত্ব সে কি নিতে পারে? বিবাহ একটি সংস্কার ব'লে অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় এরও বয়ঃসীমা থাকা উচিত।

কেউ কেউ শাস্ত্রের নির্দেশ দেখিয়ে বাল্যকালেই এই ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী। তারা স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও সুখশান্তি লাভের জন্য বাল্যবিবাহ সমর্থক। কিন্তু যে শাস্ত্র গৌরীদানের পক্ষপাতী সেই শাস্ত্রই আবার উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদানের উপদেশে বাল্যবিবাহের বিরোধী। প্রাচীনকালের স্বয়ংবরার বিবরণ নিশ্চয়ই বাল্যবিবাহ বিরুদ্ধ। আর্যদের ব্রহ্মচর্যের শেষে গার্হস্থ্য জীবনে অধিকার জন্মাত। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসা বাল্যবিবাহে সম্ভব হ'লে বয়স্ক বিবাহে অসম্ভব কেন? তখন তো উভয়ে উভয়ের জানা। বালিকাবধূ অপেক্ষা যুবতী বধূ সংসারে অশান্তি ঘটায়—এ মত এখন অচল। কেউ কেউ বলেন বাল্যবিবাহের মহৎ উপকার চরিত্র রক্ষা। বেশী বয়সে বিবাহ দিলে পুরুষ ও নারীর চরিত্র দোষের আশঙ্কা। এর উত্তরে বলতে হয়—চরিত্র এমনই জিনিস যা বয়সের দ্বারা নির্ণীত নয়। অল্প বয়সে বিবাহিত দম্পতীর মধ্যেও চারিত্রিক স্খলন ঘটতে পারে আবার বেশী বয়সের দম্পতীর ক্ষেত্রে তা না ও ঘটতে পারে।

তাহলে আসল কথা কি? বাল্যবিবাহে পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা বন্ধ হয়, তারা ইন্দ্রিয় পরায়ণ হ'য়ে পড়ে। যে বয়সে বিদ্যার্জন, চরিত্রগঠন ও স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে সেই বয়সে বিবাহে সমস্ত নষ্ট হয়। অল্প সময়ের মধ্যে সংসারের প্রয়োজনে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয় কিন্তু উপযুক্ত বিদ্যা-

বুদ্ধি না থাকায় আশানুরূপ উপার্জন হয় না। ফলে সংসারের দারিদ্র্য পীড়া দেয়। পুরুষ-প্রধান সমাজে এর মুখ্য চাপ পুরুষের উপর। অনেক সময় অসহায় অবস্থায় পুরুষ চুরি করে—ধরা প'ড়ে সামাজিক নিন্দা লাভ করে এমন কি রাজদণ্ডে দণ্ডিত ও হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ চরম অবস্থায় প'ড়ে আত্মহত্যা ক'রে এর জ্বালা জুড়ায়।

স্ত্রীলোকের কথায় চোখের জল রাখা যায় না। যোল সতের বৎসরের এক বালকের সঙ্গে দশ এগার বৎসরের বালিকার বিবাহ এবং সহবাসে ঐ বালিকার বিষম বিপদ। অসময়ে গর্ভধারণ, দুর্বল ও রুগ্ণ শরীরে গৃহচর্চা, ভগ্নস্বাস্থ্য চিররোগী শিশুসন্তান লালনপালনের দায়িত্ব তাকে জীবন্মৃত অবস্থায় সংসারে থাকতে বাধ্য করে। একদিকে স্বামি-ভক্তি অন্যদিকে সন্তানস্নেহ তাকে মরতেও দেয় না। নিজের জ্ঞানের অভাবে সে সন্তান সন্ততির শিক্ষাদান, চরিত্র গঠন, এমন কি সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ। সংসার জীবনে সন্তান পালনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সে অক্ষম।

হিন্দু যৌথ পরিবারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সে বরবধূকে একত্র সহবাস করতে দেওয়া হ'ত না। 'কিছুকাল পূর্বে, এইরূপ সংঘটন গৃহিণীরা পুত্রের অল্পায়ুষ্কর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে দ্বিরাগমন হইত না; ······এবং দ্বিরাগমন না হইলে কখনও বরবধূর মিলন হয় না।'[১] এই একান্নবর্তী পরিবারে সন্তান সন্ততির লালনপালন, শিক্ষাদান, বিবাহ প্রভৃতির দায়িত্ব সমগ্র পরিবারের। ফলে অনেক পুত্রকন্যাতে কোন চিন্তার কারণ নাই। কোনক্রমে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেলে যার অনেক নাবালক সন্তানসন্ততি তার কষ্ট; কিন্তু পূর্বে বিবাহকারীর পুত্রদের অনেকে শিক্ষিত হয়েছে এবং অনেক কন্যার বিবাহও হ'য়ে গেছে। আজকাল হিন্দুযৌথ পরিবার প্রায় নাই। সুতরাং বিবাহের পর সংসারের অনেকখানি ভার ঐ স্বামীস্ত্রীর উপর। গৃহস্থালী ব্যাপারে স্ত্রীর অনেক দায়িত্ব। এই অবস্থায় দশ বৎসরের খুকিতে কাজ চলে না। ফলে এখন বাল্যবিবাহ অপ্রচলিত।

তবে একদিন বাল্যবিবাহ এবং সহবাস বিষয়ে সমাজ ও সরকার

১। অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার—অক্ষয় চন্দ্র সরকার। শেষার্ধ। পৃ ৪০৫

বতিব্যস্ত হয়। 'ঋতুর প্রাক্কালে কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রায় সকলের মনোগত ইচ্ছা এবং অনেকস্থলে কার্য্যেও তাহাই ঘটে; কেবল কৌলিন্যাচারের বশবর্ত্তিতা কিম্বা প্রয়োজনীয় অর্থের অসংগতি অথবা স্বকীয় জাতি বা সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত কোথাও কোথাও রমণীর অধিক বয়সে অর্থাৎ ঋতুপ্রবৃত্তির পরে বিবাহ ঘটিয়া থাকে।'[২] প্রথম রজোদর্শনের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে বালিকার বিবাহ যুক্তি যুক্ত নয়। 'যেমন শিশুদের দন্তোদ্গম হইবামাত্র, সে দন্ত কঠিন খাদ্য চর্ব্বণের উপযোগী হয় না, তেমনি কন্যার প্রথম ঋতুর আবির্ভাবেই সে কন্যা সন্তান জননী হইবার যোগ্যা হয় না।'[৩] কেউ কেউ সমস্যাটিকে অন্যভাবে বিচার করেছেন। যখন বাল্যবিবাহ অপেক্ষা বাল্যমিলনেই ক্ষতি তখন বাল্যবিবাহ দিলেও সহবাস যাতে না ঘটে তা করতে চান। কিন্তু একই সংসারে যদি বালক স্বামী এবং বালিক বধূ থাকে তবে তাদের সহবাস-ইচ্ছা প্রবল হয় এবং অনেক সময় তাদের গোপন মিলনে বালিকাবধূ গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখন হাস্যকর ও লজ্জাকর পরিস্থিতি হয়। আবার ঐ রকম বালিকাবধূর চরিত্রে অনেকের সন্দেহ। অনেক সংসারে এই বিষয়ে অশান্তি ঘটায়। বধূর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা লাভ হয়। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ এবং সহবাস সম্মতি বিষয়ে আন্দোলন হয়েছিল। 'The direction to marry a girl while she is still an infant, seems to be in the nature of a moral injunction, and the disobedience of this precept does not render the marriage either void or voidable.'[৪] তবুও একথা বলা যায় সম্মতির বয়স বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এণ্ড্রু স্কোবল, রাজপ্রতিনিধি, শ্রীকৃষ্ণজী লক্ষ্মণ, হকিন্স সাহেব প্রভৃতি বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপির 'বালিকাদিগকে অপরিণতাবস্থায় বেশ্যাবৃত্তি হইতে রক্ষা করা এক উদ্দেশ্য এবং উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে

২। হিন্দুকন্যার বিবাহ সংস্কার কোন্ সময়ে হওয়া শাস্ত্রসম্মত—শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক আলোচিত। প্রার্থনা পৃ /.

৩। সমাজ সংস্কার—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন। পৃ ৬

৪। The Position of women in Hindu Law—Dwarakanath Mitter. P. 243

সহবাস হইতে রক্ষা করা আর এক উদ্দেশ্য।' ১০ হ'তে ১২ বৎসর সম্মতির বয়সের প্রস্তাব করা হয়। হিন্দু আইনে ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে সহবাস নিষিদ্ধ। মুসলমান আইনে ঋতুমতী হওয়া এবং বিবাহের ফলাফল বুঝতে পারা বিবাহের চুক্তিতে প্রয়োজনীয়।

ধর্মে হস্তক্ষেপ, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ প্রভৃতির ধূয়া উঠেছিল। ভারতীয় পঞ্চাশজন মহিলা চিকিৎসক সম্মতির বয়স ১৪ বৎসর করার জন্য দরখাস্ত করেন। ঐ বিষয়ে সমর্থন ক'রে ১৬০০ নাম স্বাক্ষরিত ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদের একখানি আবেদন পত্র মহারাণীর নিকট প্রেরিত হয়। হরি মাইতি তার ১০ বৎসরের স্ত্রীর উপর বল প্রয়োগ করলে বালিকাটি মারা যায়। ফলে ইংরাজ সরকার সম্মতির বয়স নিয়ে বিব্রত হ'য়ে উক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হন। হিন্দু সমাজের এক পক্ষ বাল্যবিবাহের বিরোধী; অন্যপক্ষ সহযোগী। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ১২ বৎসরে বালিকাদের বিবাহ সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে বিবাহের ক্ষেত্রে বালকদের ২২ এবং বালিকাদের ১৬ বৎসরের কম হওয়া উচিত নয়। মুসলমান নেতা এম. এ. জিন্না ১৪ বৎসরের নিম্নে কন্যার বিবাহ দেওয়া ধর্মবর্হিভূত মনে করেন। মহাত্মা গান্ধী পুরুষের ক্ষেত্রে ২৪ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৮ বৎসর বিবাহের বয়স ব'লে মনে করেন। কিন্তু সহবাস সম্মতি নিয়ে বিরূপ মনোভাবও আমরা পাই।

'নারদ। .........ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে যে আদ্য ঋতুতে গর্ভাধান বন্ধ করিয়া দিলেই দেশের লোক আর দুর্ব্বল থাকিবে না। তাহার পর যত ছেলে হইবে, সব হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ কাবুলী পালোয়ানের মত ঢাল তরওয়াল হাতে করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবে।' [৫]

'বার বছুরে স্ত্রীলোক যদি বড় ও সবল সন্তান দিতে পারে, তা হোলে চল্লিশ বছরের মেয়ে দাড়ি গোঁফ চশমা ও ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলংয়ের পতাকাযুক্ত বড় বড় বীরপুরুষ একেবারে প্রসব করিয়া ফেলিতে পারিত।' [৬] হিন্দুসমাজ পুত্রকন্যার চরিত্র রক্ষা করতে বিবাহের এক

৫। সহবাস বিভ্রাট বা দেবগণের দ্বিতীয়বার মর্ত্ত্যে আগমন—
শ্রীহরিকুমার চৌধুরী। পৃ-৫

৬। ঐ। পৃ—৩৯—৪০

সুনির্দিষ্ট বয়স নির্ণয় করতে চেয়েছিল। একদিকে বাল্যবিবাহ যেমন অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিকারক তেমনি অধিক বয়স পর্যন্ত পুত্রকন্যাকে অবিবাহিত রাখাও বিপজ্জনক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অন্যভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহায়ক। বাল্যবিবাহের ফলে স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা ঘটত আর অধিক বয়সে বিবাহের ফলে চরিত্রদোষ এবং গর্ভপাত ঘটে থাকে। বাল্যবিবাহের ফলে বিধবার সৃষ্টি হ'ত। বিধবাবিবাহ বৈধ হ'লেও হিন্দু সমাজে প্রচলনের অভাবে অধিক বয়সে বিবাহ সমর্থন না ক'রে পারা যায় না। অর্থনৈতিক অবস্থাও এর অনুকূলে। সুতরাং কুমারীর গর্ভপাত আইনত সিদ্ধ করতে আপত্তি হ'ল না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ নং আইনে বাল্য বা শিশুবিবাহ নিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল (বাংলা ১৮ই চৈত্র ১৩৩৬) হ'তে সমগ্র ব্রিটিশ ভারত বেলুচিস্থান এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রযুক্ত হয়। 'এই আইনে শিশু অর্থাৎ ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে এবং ১৪ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাকে বুঝাইবে। যাহাদের বিবাহ হইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ শিশু থাকিলে, ঐ বিবাহ শিশু বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে।' [৭] কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে কেউই আজকাল বাল্যবিবাহ সমর্থন করে না। 'The ill pervading perilous custom has effectually restrained and curbed the improvement of the Indians.' [৮]

নাটক সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি। বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকায় যা ঘটত তা ঐ বিষয়ের নাটকগুলিতে প্রতিফলিত। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়নের পর ঐ বিষয়ে সমাজ-সচেতনতা প্রবল হয়। পূর্বেই এই দূষণীয় রীতি বর্জনীয় হ'তে বসেছিল। আইন তাতে ইন্ধন জোগায়। বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পর উক্ত বিষয়ে নাটক লেখার প্রবণতা প্রবলতর হয় অথচ হিন্দু সমাজের স্বীকৃতির ফলে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের পর ঐ বিষয়ে নাটক রচনার প্রবণতা প্রায়

---

৭। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন। সঙ্কলয়িতা বিনয় সেন।

৮। **Speeches on Early Marriage in India. Mr. S. Sarbadhicary. P. 3**

দেখা যায় না। এখন কয়েকটি নাটক পাওয়া যায়। এ বিষয়ে নাটক-গুলির তালিকায় প্রথমে ১৭৮২ শকাব্দাতে ( ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ) প্রকাশিত শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' এর বিষয় আলোচনা করতে হয়।

১। বাল্যোদ্বাহ নাটক—শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি। কলিকাতা।
১৭৮২ শকাব্দ।

এর কাহিনী এই ঃ—বলহীন ধনাঢ্যের পুত্র গোপালের নয় বৎসর বয়সেই বিবাহ দিতে বলহীনের স্ত্রী মায়াবতী তাকে চাপ দেয়। সেজন্য সে রামা চাকরকে দিয়ে স্বার্থপর ঢোল ঘটককে ডাকে। পুত্রের উদরের দোষ থাকায় বিবাহ দেওয়া ভাল নয়—ধনহীন মহদাশয়ের এই মতকে উপেক্ষা ক'রে বলহীন ঘটককে পাত্রী স্থির করতে বলে। ঘটক বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্নের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা অবলার সহিত গোপালের বিবাহ স্থির করে। বিবাহ হওয়ায় গোপালের অসুখ বাড়ে। কবিরাজ রায়ের চিকিৎসায় কিছু ফল পাওয়া গেল না। গোপাল মারা যায়।

বলহীন ধনাঢ্যের পুত্র গোপালের বাল্যবিবাহের ফলে অকালমৃত্যু —নাটকের মূল বিষয়। এর সঙ্গে দুটি শাখা কাহিনী আছে। বিদ্যা-হীন দাম্ভিক বাল্যবিবাহের ফলে অল্পবয়সে দুটি সন্তানের পিতা। সে সংসারের ভরণপোষণে অসমর্থ হওয়ায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় শাখা কাহিনী লজ্জাহীন ও বিলাসিনীর। বাল্যবিবাহিত লজ্জা-হীন স্ত্রীর মন জোগাতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে; ফলে তার কারাবাস ও বিলাসিনীর বারবনিতারূপে দিনাতিপাত। পুরুষ চরিত্রগুলির নাম তাদের চরিত্রের দ্যোতক; যথা—বলহীন ধনাঢ্য, ধনহীন মহদাশয়, স্বার্থপর ঢোল, সুধীর সদাশয়, অর্জ্জনস্পৃহ ভট্টাচার্য্য, বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্ন, লজ্জাহীন স্ত্রৈণ প্রভৃতি। স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে চতুরা, বিলাসিনী, অবলারও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রস্তাবনায় 'মেয়ের বোলে সাধুবাদ' দেওয়ার জন্য নেপথ্যে অশুভ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মায়াবতীর কথায় বলহীন পুত্রের বাল্যবিবাহ

* শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের নাম 'বাল্যোদ্বিবাহ নাটক' লিখেছেন।

দিয়ে অকালে শমন সদনে পাঠাল; লজ্জাহীন স্ত্রৈণ বিলাসিনীকে তুষ্ট করতে কারাবাস বরণ করল এবং বিদ্যাহীন দাম্ভিক দুঃখে আত্মহত্যা করল। সুতরাং নেপথ্য ভাষণটিকে ড্রামাটিক আয়রনি বলা যায়।

গ্রন্থটিতে দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের পরিবর্তে সন্ধিস্থল লেখা আছে। সংস্কৃত নাটকানুযায়ী প্রস্তাবনা সূত্রধার নটনটী সমস্তই আছে। প্রস্তাবনাতেই নাট্যকার মূল বিষয় উপস্থাপনা করেছেন। চারটি অঙ্কেব প্রত্যেকটিতে তিনটি সন্ধিস্থল আছে। প্রথম অঙ্কে মূল বিষয়ের আরম্ভ, দ্বিতীয় অঙ্ক তাব অগ্রগতি, তৃতীয় অঙ্কে চরম অবস্থা ও চতুর্থাঙ্কে পরিণতি। প্রস্তাবনায় নটীর গীতে বাল্যবিবাহের দোষ কীর্তিত। কিন্তু গীতের রাগিণী ও তাল লেখা নাই। এর পর প্রথম অঙ্কের প্রথম সন্ধিস্থলে মাযাবতী, ১ ৩ এ ধনহীন, ২/১ এ ভাবিনী পয়ারে এবং ২/৩ এ ধনহীন, ৩/১ এ রঙ্গিণী ত্রিপদীতে মনোভাব প্রকাশ করেছে। তবে গদ্য সংলাপ বেশী। ৪/১ এ বিদ্যাহীন ও ৪/৩ এ বুদ্ধিহীন গদ্যে দীর্ঘ সংলাপে মনোবেদনা প্রকাশে সহানুভূতি আকর্ষণ করে। পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্রের স লাপ স্বাভাবিক। ১/১ এ অন্তঃপুরে এবং ১/২ এ জলাশয় নিকটস্থ নিভৃত পথে তারা যখন মিলিত হয় তখন তাদের ভাষা খুব স্বাভাবিক। ৩/১ এ উদ্যানে সরলা, রঙ্গিণী ও ভাবিনীর রসিকতা সেকালের এক বিশেষ দিক।

বাল বিবাহের বিভিন্ন দোষ এই নাটকে উদ্‌ঘাটিত। বলহীন ধনাঢ্য এবং বিদ্যাহীন দাম্ভিক বাল্যবিবাহ সমর্থনকারী। বলহীনের যুক্তি এটি দেশাচার ও ধর্মসঙ্গত এবং বিদ্যাহীনের যুক্তি বাল্যকালে নারী-সঙ্গ সুখকর। আবার বাল্যবিবাহ যে রাজনৈতিক দুর্দশার কারণ তাও বুদ্ধিহীন বলেছে। এ প্রথা দূর হ'লে 'বীর্যবান হইয়া পরাধীন শৃঙ্খল ভগ্ন করত মহাসুখে সঞ্চরণ করিবে।' তার এই উক্তি স্মরণীয়।

মায়াবতী অবলাকে গোপালের মৃত্যুর কারণ মনে ক'রে তাকে গঞ্জনা দিতে থাকে। আর অবলা নিতান্ত অবলার মত চোখের জলে দিন কাটাতে লাগল। সে হয়ত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হ'য়ে গর্ভপাত করাবে—অথবা কলঙ্কময় জীবনে ধিক্কার দিয়ে আত্মহত্যা করবে। এতে কিভাবে ধর্মরক্ষা হয় তা চিন্তাসাপেক্ষ। দেশাচারের কথা বলতে

রামমণির রঙ্গিণীর প্রতি উক্তি উদ্ধারযোগ্য। সে বলেছে, 'আমরা তোদের মত ছেলেবেলা ভাতার নিয়ে শুতে শিখিনি, পোনের ষোল বচরের না হলে সে কেমন তা জানতেম্ই না, তোদের এই বয়সে ছেলে হোলো মাগো!' বাল্যবিবাহের দোষ দেখিয়ে দিলেও অনেকে বুঝে না। এজন্য শিক্ষা ও আইনের প্রয়োজন। ধনহীন বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছে। সুধীরের সঙ্গে অর্জ্জনস্পৃহ ভট্টাচার্য্যের বাল্যবিবাহের বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু তাদের কথা কে শুনে? এমন কি রামমণির কথাই বা কে শুনেছে? বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশিত। হাস্য ও করুণ এই দুটি রস মুখ্য। 'গ্রন্থ রচনার প্রথম উদ্যম,' ব'লে গ্রন্থকার যে সঙ্কোচ প্রকাশ করেছেন তার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না।

২। সম্বন্ধ সমাধি—কেনচিৎ সম্বন্ধ শক্রুণা প্রণীতম্। ২৪ আষাঢ় ১২৭৪

বৈদিক কুলীনদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কেনচিৎ সম্বন্ধ শক্রুণা প্রণীতম্ সম্বন্ধ সমাধি নাটক ২৪ আষাঢ় ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত। সমাজের দোষক্রটি দেখিয়ে যে সব নাটক প্রকাশিত তাদের অনেকগুলিতেই লেখক নিজের নাম গোপন করেছেন। এই নাটকেও এরূপ ঘটেছে। তবে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন এর আভ্যন্তরীণ বিচারে এটি রামনারায়ণ তর্করত্ন বা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রচনা ব'লে অনুমান করেছেন।[১] এর কাহিনীতে আমরা জানি—বৈদিক কুলীন আশুতোষের কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ায় সে কুলরক্ষার জন্য তার বিবাহ সম্বন্ধ করতে যায়। বহুস্থান ঘুরেও সে সম্বন্ধ স্থির করতে না পারায় নিজের ভদ্রাসনের বিনিময়েও কুলরক্ষা করতে তার ভ্রাতা কাশীনাথ তাকে পরামর্শ দেয়। সে সম্বন্ধ স্থির হওয়ার ছলনা করতেও উপদেশ দেয়। আশুতোষের মন তাতে সায় দেয় না। আশুতোষের মামা ন্যায়ভূষণ দুর্গাপদর পুত্রের সঙ্গে ঐ কন্যার বিবাহ স্থির করে কিন্তু আশুতোষ ঐ পাত্র গরীব হওয়ায় অন্য বরে কন্যার বিবাহ দেয়। ফলে দুর্গাপদ জমীদার, বাচস্পতি প্রভৃতির পরামর্শে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আশুতোষের বিরুদ্ধে কুলভঙ্গের দরুণ ক্ষতিপূরণের জন্য মোকর্দমা রুজু করে।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীসুকুমার সেন। পৃ ৩৪-৪১

বিচারে নিম্ন এবং উচ্চ আদালতে আশুতোষের জয় হয় এবং তাতে সম্বন্ধের সমাধি হয়।

নাটকটিতে ৭টি অঙ্ক আছে—গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের উল্লেখ নাই। প্রথমাঙ্কে আশুতোষের কন্যার জন্য ও তার বিবাহের জন্য ব্যস্ততা, দ্বিতীয়াঙ্কে তার হতাশা, তৃতীয়াঙ্কে কন্যার বিবাহ স্থির কিন্তু তাতে অসম্মতি, চতুর্থাঙ্কে অন্য পাত্রে তার কন্যার বিবাহ এবং মোকর্দমা বাধ-বার কথা, পঞ্চমাঙ্কে মোকর্দমার বিষয়ে আরও অগ্রগতি, ষষ্ঠাঙ্কে মোকর্দমা আরম্ভ এবং আশুতোষেব জয় এবং সপ্তমাঙ্কে উচ্চ আদালতেও তার জয়। এই ভাবে ঘটনার সূচনা, অগ্রগতি, চরমোন্নতি, গতির পতন এবং পরিণতি। ৪র্থ অঙ্ক পর্যন্ত ঘটনাস্থল আশুতোষ ও কাশীনাথের বাটী, ৫ম অঙ্কের জমীদারের বাটী, ৬ষ্ঠ অঙ্কের মুনসেফী আদালত এবং ৭ম অঙ্কের জমীদারের বাটীর সম্মুখ হওয়ায় স্থান ঐক্য বিঘ্নিত নয়। ১২৬২ সালের বৈশাখ মাসের পর হ'তে ১২৭৩ সালের ২৪ শে অগ্র-হায়ণের পর পর্যন্ত নাটকটির ঘটনাকাল। এই দিক বিচারে কাল ঐক্য কিছু ক্ষুণ্ণ। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণে নান্দী, সূত্রধার ও নটীর উল্লখে আছে। নান্দীতে একতালীতে বৈদিক পদ্ধতির ইঙ্গিত এবং সূত্র-ধারের সংলাপে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠ-পোষকতায় অনেক নাটকেরই অভিনয়ের উল্লেখ আছে। নাটকটীর ২য় পৃষ্ঠায় '১ মাঙ্ক' লিখিত কিন্তু ঐখানে প্রথমাঙ্ক হবে না; কারণ সূত্রধার ও নটীর দ্বারা নাটকীয় বিষয় উপস্থাপনা করা হয় নাই। সূত্রধার ও নটীর প্রস্থানের পর প্রস্তাবনা শেষে ৪র্থ পৃষ্ঠায় যে 'প্রথমাঙ্ক' লিখিত আছে তা ঠিক। দ্বিতীয়াঙ্কে দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের উল্লেখ করা চলত। কাশীনাথের বাটীতে ১ম ও বড়বাটীর সম্মুখ ২য় গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য হ'তে পারত। ৩য় অঙ্কেও 'রাস্তার উপর' এখানে দৃশ্যান্তর হওয়া উচিত। কারণ কামিনীর পুনর্বিবাহের সংস্কার রাস্তার উপর সম্পন্ন হওয়া অনুচিত। ৪র্থ অঙ্কেও পাঠশালায় দৃশ্যান্তর হওয়া দরকার ছিল। ৫ম অঙ্কে বাচস্পতি ও নতুন বৌয়ের সংলাপের সময় দৃশ্যান্তর এবং অপরাহ্ন জমীদার বাটীতে ৩য় দৃশ্যান্তর হ'লে ভাল হ'ত। ৭ম অঙ্কে আপীল আদালতে দৃশ্যান্তর হ'ত, তবে ঐ রকম দৃশ্যান্তর বাস্তবিক কঠিন কারণ ঐ দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত।

নাট্যকার বৈদিক কুলীন ব্রাহ্মণদের পেটে পেটে সম্বন্ধের দোষ দেখিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে নাটক লেখায় সব দিক রক্ষা করতে পারেন নাই। কামিনীর পুনর্বিবাহ সংস্কারে পুনর্বিবাহ নাটকের কথা স্মরণ করায়। আবার আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটকে মোকর্দমায় যে অশ্লীলতা প্রকাশিত এখানে তা নাই। নতুন বৌ, শ্যামা, হরিদাস, যদুনাথ প্রভৃতি চরিত্র না থাকলেও চলত। যদুনাথ তিন প্রকার ফলারের কথা জিজ্ঞাসা করেছে—এটি রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুল-সর্বস্ব নাটকের প্রভাব। গণেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে। 'নবনাটক' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'র উদ্ধৃতিতে পূর্ববর্তী ঐ নামের দুটি নাটকের নাম স্পষ্ট। নাটকটির শেষ দিকে সূত্রধার নামকরণের সার্থকতা দেখিয়েছেন।

জ্ঞানিগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ।
সম্বন্ধ সমাধি এই হৈল সমাপণ ॥
স্বভাবে সম্বন্ধ আর যবন সমান;
'সম্বন্ধ সমাধি' তেঁই নামের বিধান ॥

প্রথমাঙ্কে মোহিনীর রাগিণী মাঁঝোয়া তাল ঠুংরির গানটিতে কুলীন বৈদিকের সম্বন্ধের বিষয়ে দোষের কথা প্রকাশিত। নাটকীয় মূল কাহিনীর সঙ্গে এ গানের সঙ্গতি লক্ষণীয়। গানটি এই—

সুখের ভারত রাজ্য হলো ছারখার।
সম্বন্দ করেচে বন্দ উন্নতির দ্বার ॥

প্রস্তাবনায় সূত্রধারের "কথায় বলে পেটে পেটে; সত্যি সত্যিই কি আর পেটে পেটে; সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে থাকে, ওদের বিবাহের আর ভাবনা থাকে না।" এই কথার পর পয়ারে

ধন্যরে বৈদিক কুল, ধন্য তোর লীলা।
ভালরে জিনেচো তুমি বল্লালের খেলা ॥

—এত বেশী কথা প্রস্তাবনায় বলা ভাল নয়। গদ্য ও পদ্য সংলাপে অনেক ক্ষেত্রে কবিত্ব প্রকাশিত ব'লে নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ।

তবু চরিত্রচিত্রণে এবং মূল বিষয় উপস্থাপনে নাট্যকার দক্ষতা

দেখিয়েছেন। আশুতোষ, কাশীনাথ, গোঁড়া বাচস্পতি, গ্রাম্য জমীদার, দুর্গাপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি চরিত্র স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল। পুরোহিতের কামিনীকে দেখে কামনার উদ্রেক ঘটে। 'গুরু প্রসাদি' তখন অপ্রচলিত ব'লে কামিনীকে ভোগ করতে না পারায় তার এই জঘন্য মনস্তাপের অন্ত নাই। কিন্তু প্রথাটি পুরোহিত সম্পর্কিত নয়—গুরু সম্পর্কিত। এ জন্য এটির নাম ছিল 'গুরুপ্রসাদী।' পুনর্বিবাহের অনুষ্ঠানে কন্যার [illegible]ভিস্থল হ'তে আংটি ফেলতে হয়। বর খরার উপর দাঁড়িয়ে নাগাল পায় না। এ সমস্ত ঘটনায় বাল্যবিবাহের নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটনে নাট্যকার সমাজের মর্মমূলে আঘাত করেছেন।

৪র্থ অঙ্কে পাঠশালার গুরু সর্দার পোড়োদের ডেকে বিপিনকে আশুতোষের কন্যার বিবাহের আদায় আনতে পাঠান। বিপিন কার্তিকের অল্প বয়সে বিবাহ এবং সন্তান হওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করে—"ভাই! শুনিচিস্ এমন কত শত হচ্চে, তা দেখেও কি বৈদিকদের চোখ ফোটে না; ওরা পরের বেলা অনেক দোষ দেখে, কিন্তু নিজের বেলা কানা হয় বুঝি," এই সমস্ত দোষ দেখিয়ে নাট্যকার সর্বশেষে অনুরোধ করেছেন—

> বৈদিকের চূড়ামণি যদি কেহ হন;
> ছাড়ুন সম্বন্ধ সহ সম্বন্ধ এখন।

বিজ্ঞাপনে লেখক জানিয়েছেন— '.........কুলীন বৈদিকদিগের সম্বন্ধ প্রথা ও বাল্যবিবাহ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার অনিষ্ট সমূহ সন্দর্শন করিয়াও কেহ ইহা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন না। নাটক লেখন ইদানীন্তন সময়ে কুপ্রথা পেষণের এক চমৎকার যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সেই যন্ত্রের সাহায্যে এই কুপ্রথা পেষণ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। ......সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সাধারণের মানস পরিতৃপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল এই কুপ্রথা কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, এই মাত্র চেষ্টা।' নাট্যকারের চেষ্টা ফলবতী। দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাটক হ'য়েও করুণ, হাস্য ও বীভৎস রসের পরিবেষণে এই নাটকটি 'সর্বোৎকৃষ্ট' না হ'লেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য।

# অষ্টম অধ্যায়

## মদ্যপান, ব্যভিচার ও বেশ্যাগমন বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সমাজ সংস্কারে নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের সক্রিয়তা প্রশংসার যোগ্য। তবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দীক্ষা ও রীতিনীতির প্রভাবে মদ্যপান পর্যন্ত তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম প্রথম শিক্ষিত যুবকদের শুধুমাত্র পানদোষ ছিল পরে এর সঙ্গে বেশ্যাগমন এসে মিলিত হয়।

এ দেশে এ দুটি নতুন নয়। আর্যদের সময়ে যাগযজ্ঞে সোমরস পানের কথা আমরা জানি। দেবী পূজায় সুরাপান অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। 'The Sakta Tantras go further and insist upon the use of wine as an element of devotion. According to them no worship of the Devi can be complete which is not celebrated with the five great essentials, "fish. flesh, wine, fried grain, and female society," technically called the five Ms, .........'[১] কৌল সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বামাচারী সাধকদের মধ্যে ধর্মের নামে মদ্যপান ও ব্যভিচার চলত। বিশ শতকেও কালীপূজা এবং শীতলা পূজায় ভদ্র ও ভদ্রেতর অনেককে মদ্যপানে উন্মত্ত দেখা যায়।

ধর্মের নামে ব্যভিচারের কেন্দ্র তীর্থস্থান। বোম্বাই প্রদেশে দেবমন্দিরের 'নায়িকা' এবং 'দেবদাসী'দের বেশ্যাবৃত্তির বিবরণ আছে।[২] ঊনিশ শতকের সমাজ সচেতনতায় মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বাদ গেল না। তবে বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতিতে সরকারের আর্থিক লাভালাভ নাই। মদ্য প্রচলনে সরকারের আয়। সেজন্য মদ্যপান নিরোধের চেষ্টায় সরকার কতকটা

১। Journal of the Asiatic Society of Bengal—Vol XLII

২। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর। পৃ ২৪৩

উদাসীন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিমিত মদ্যপান অনেকে সমর্থন করায় ডাক্তারখানা ও ঔষধালয়ে মদ্য বিক্রয় চলত। অনেক সময় এর মাত্রাও বেশী হয়। বিশেষতঃ ডাক্তার, বিচারক, আইনজ্ঞ ব্যক্তি সকলেই যখন ইংরেজ বা ইংরেজ ভাবাপন্ন তখন কে কাকে দোষী করবে? পাশ্চাত্যদেশে জলবায়ু মদ্য ও মাংসাহারের অনুকূল হ'লেও এদেশে এগুলি স্বাস্থ্য নষ্টের কারণ। শাস্ত্রমতে শুদ্ধির দ্বারা মদ্যকে সুরায় পরিণত ক'রে পান করার ব্যবস্থা আছে। পরবর্তীকালে বিলাতী, দেশী সকল প্রকার মদ্যই অবাধে পান করা হ'ত। পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় পান দোষের অনুসরণ করে। নিম্ন বা অশিক্ষিত সম্প্রদায় মদ্য পান করলে সামাজিক নিন্দা লাভ হ'ত আর শিক্ষিত সম্প্রদায় এ কাজ করলে প্রশংসা পেত। এখনও অধ্যাপক, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতির স্ব স্ব বৃত্তিতে সুনামের সঙ্গে সঙ্গে পানদোষের কথা শোনা যায়। তবে এদের পানদোষ সামাজিক সমস্যা নয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মদ্য-পান সমস্যায় হিন্দুসমাজ আন্দোলিত। মদ্যপানের সঙ্গে গঞ্জিকা, চরস প্রভৃতি নেশাও মিলত। অতিরিক্ত নেশার ফলে স্বাস্থ্যনষ্ট, পারিবারিক শান্তি নষ্ট এবং চরিত্র নষ্ট প্রভৃতি আনুষঙ্গিক দোষ উপস্থিত।

মদ্যপান ও বেশ্যাগমন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তবে অনেক সময় অন্য ব্যভিচার দোষও ঘটে। বেশ্যাগমনকে পছন্দ না ক'রে অনেকে পরস্ত্রী উপভোগে আসক্ত হয়। আবার অনেকের ভদ্র ঘরের দিকেও লোলুপ দৃষ্টি। কিন্তু বেশ্যাগমন ব্যাপক আকারে গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে কলকাতায় দেখা যাওয়ায় সমাজ ও সরকার নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে নাই। বেশ্যাগমনকে সরাসরি প্রতিহত ক'রে আইন পাস করলে একে একেবারে বন্ধ করতে হয় কিন্তু বেশ্যাগমনে নানারকম রোগ সৃষ্টি করে। যাতে দুরারোগ্য ব্যাধি সংক্রামিত না হয় তার জন্য বেশ্যাদের নাম রেজিষ্টার্ড করিয়ে নির্দিষ্ট সময়ান্তর চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে—তারা রোগগ্রস্ত কি না। যারা গোপনভাবে বেশ্যাবৃত্তি করে তারা প্রকাশ্যে নাম লেখাতে সম্মত হবে না। যারা লেখাবে তারাও বেশ সাবধান হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে The Indian Contagious Diseases Act পাস হয়। * এই আইন বেশ্যাদের ও

* পরিশিষ্ট—১ঘ

বেশ্যাগামীদের কেমন প্রভাবিত করেছিল সে যুগের নাটকগুলির আলোচনায় তা আমরা জানতে পারব। এই আইনে যে সুফল ফলেছিল তা বলা যায়। অন্যরকম ব্যভিচারের শাস্তি সমাজ বা ব্যক্তিই দিতে পাবে। পরস্ত্রী লোলুপতার শাস্তির আইন যাই থাক না কেন সমাজ অনেক সময় লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ ক'রে এই রোগ সারিয়ে দেয়।

মদ্যপানের বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা করেছিলেন। প্যারীচরণ সরকার মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের অনুপ্রেরণায় মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তাঁর এক অগ্রজের মদ্যপানের ফলে পারিবারিক অশান্তি তাঁকে পীড়া দিয়েছিল।[৩] প্যারীচরণের চেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর 'বঙ্গীয় মাদক নিবারিণী সমাজ' (The Bengal Temperance Society) স্থাপিত। তিনি নিজে এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু (হিন্দু ও মুসলমান) এই সমাজের কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজে নেমকহারাম লোকের অভাব নাই। যারা এই সমাজের সদস্য তারা অনেকে গোপনে মদ্যপানে আসক্ত। মাদক নিবারণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ম আইনের ৪৩ ধারা উক্ত বিষয়ে এক দৃঢ় পদক্ষেপ। তবে সরকারী আইন অপেক্ষা জনসাধাণের স্বীকৃতিই বিচার্য। অর্থনৈতিক অবনতি মাদক নিবারণীতে যথেষ্ট সহায়ক। ধনীর বেশ্যাগমন বা বেশ্যা রাখা যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠার লক্ষণ সে রকম মদ্যপান ও ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া সামাজিক সম্মান লাভের উপায়। উনিশ শতকের শেষ দিক হ'তে বিশ শতকের প্রথমে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবনতির ফলে ক্ষয়িষ্ণু ধনী সমাজ নিজের প্রতিষ্ঠা ঠিক রাখতে পারে নাই। ফলে বেশ্যাসক্তি এবং পানদোষ উভয়ই ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে উক্ত বিষয়গুলিতে হিন্দু সমাজের আন্দোলন বিভিন্ন নাট্যকারের উপলব্ধিতে নাট্যরচনার সংখ্যাধিক্যের কারণ।

---

৩। প্যারীচরণ সরকার—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃ ৯৮-৯৯

১। চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা—মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এই বিষয়ে প্রথম রচনা মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চারইয়ারে তীর্থযাত্রা।' এর কাহিনীতে আমরা পাই—মদখোর গোপাল মিত্র, আফিমখোর হরিহর মিত্র, গুলিখোর নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং গাঁজাখোর শ্যামল গুপ্ত এই চার ইয়ারের খুব ভাব। তারা এক সময়ে ভালভাবে সংসার চালাত। এখন বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় গোপাল মিত্রের অনুশোচনা। হরিহর অল্পবয়সে লেখাপড়া ছাড়ায় উচ্ছৃঙ্খল। গোপালের দু মেয়ের মধ্যে একটি মরেছে আর একটি মর মর। সে তার মেয়ের বিবাহের জন্য চিন্তিত কিন্তু হরিহরের ছেলের বিবাহের জন্য ভাবনা। সে গৌরদাস বাবাজীর ঘটকালিতে রামনাথ ঘোষের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেয়। শেষ পর্যন্ত গোপাল, হরিহর প্রভৃতি বৃন্দাবনে যায়। সেখানে তাদের সকলের কর্মসংস্থান হয় এবং সকলের একটি একটি পুত্র হয়। তারা সেখানে সুখে কাল-যাপন করতে থাকে।

গ্রন্থটিতে চারটি অঙ্ক আছে—দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের উল্লেখ নাই। প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থল গোপাল মিত্রের বাটীর বর্হিভাগ, তৃতীয় অঙ্কের প্রসন্ন-বাবুর বাটি এবং চতুর্থ অঙ্কের গোপাল মিত্রের বাটীর অন্তঃপুর। দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাস্থলের উল্লেখ নাই। প্রথম অঙ্কে গোপাল, হরিহর প্রভৃতির পূর্বের ভাল অবস্থার কথা থাকলেও বর্তমানের দুর্দশার বিষয় চিত্রিত। দ্বিতীয় অঙ্কে হরিহরের পুত্রের সঙ্গে রামনাথ ঘোষের কন্যার বিবাহ। তৃতীয় অঙ্কে প্রসন্নবাবুর বাটীতে আড্ডা এবং গৌরদাস বাবাজীর ধৃষ্টতা ও বিদ্যাশূন্যতা প্রকাশ। চতুর্থ অঙ্কে কামিনী ও সারদার আক্ষেপ, চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা এবং সুখে কালযাপন।

গ্রন্থটিতে সংস্কৃত নাটকের ভঙ্গিতে সূত্রধারের আগমন এবং সে 'সিমুলিয়া নিবাসি শ্রীমহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চলিত ভাষায় রচিত যে চার্ ইয়ারের তীর্থযাত্রা নামক নবীন নাটক সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে তাহারি অনুরূপ' দর্শাতে চাওয়ায় নটীকে ডাকে। এখানে গ্রন্থটির নাম চার্ ইয়ারের তীর্থযাত্রা আছে কিন্তু গ্রন্থটির শিরোনামে 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা' এই নাম দেখা যায়। নাটক না ব'লে একে

প্রহসন হলা ভাল; তবে তখন এ সমস্তই নাটক নামে চলত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের এক দীর্ঘ তালিকা আমরা দেখি। এত বেশী চরিত্র না থাকা ভাল। রামকৃষ্ণের গুরু সদানন্দ গোস্বামী, প্রসন্নর মোর্ সাহেব নন্দরাম ভট্টাচার্য্য, অন্য একজন হঠাৎ বাবু পঞ্চানন এই কটি চরিত্র বাদ দিতে পারা যায়। শ্যামল গুপ্তকে শ্যামলাল এবং রামনাথ ঘোষকে রমানাথ করায় আমাদের প্রথমে মনে হয়েছিল পৃথক চরিত্র কিন্তু শ্যামলের আদরের নাম শ্যামলাল এবং রামনাথ ছাপার ভুলে রমানাথ। গোপাল মিত্র প্রধান পুরুষ চরিত্র। কিন্তু প্রথম অঙ্কেই তার কৃতকর্মের অনুশোচনা দেখান ভাল নয়। হরিহরের উচ্ছৃঙ্খলতা তার ধনহানির কারণ। অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দিয়ে সে ভুল করে। রামনাথ পাত্র না দেখে কন্যার বিবাহ দিয়ে নিজের ভুলকে ঈশ্বরের নির্বন্ধ ব'লে স্বীকার করলেও আমরা মানতে পারি না। নেশাখোর ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকে না; এমন কি অনেকে নষ্ট চরিত্র হয়। গোপাল মিত্রের স্ত্রী কামিনী কুলত্যাগ ক'রে শ্রীক্ষেত্র যেতে চায়; হরিহরের স্ত্রী সারদা স্বামীর মৃত্যুর পর ( না মরলে তাকে মেরে ) বিদ্যাসাগরের কল্যাণে ভাল বর দেখে আবার বিবাহ করতে চায়। সারদার ছেলে না হওয়ায় কামিনী দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু হরিহরের যে ছেলের বিবাহ হ'ল সে কি সারদার গর্ভজাত নয়? গৌরদাস বাবাজীর মত প্রবঞ্চক ঘটকের অভাব ছিল না। তার বাক্‌পটুতা প্রশংসার যোগ্য। তবে কুলীনের নটি লক্ষণকে সে যে ভাবে ব্যাখ্যা করে তাতে হাস্যরস গড়িয়ে যায়। অর্থলাভে তার এই কপটতা সজ্ঞানকৃত।

মদ্যপানের কুফল দেখিয়ে অনেক নাটক লিখিত কিন্তু মদ, গাঁজা, আফিম, গুলি প্রভৃতি যে কোন নেশারই যে কি ফল তা এই গ্রন্থে প্রকাশিত। আবার নেশাখোর ব্যক্তিদের যে আশ্রয় দেয় সেও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়—প্রসন্নবাবুর দৃষ্টান্তে আমরা তা বুঝতে পারি। রামকৃষ্ণ মদ্যপান করলেও বুলবুল লড়াই দেখতে যেতে চায় না। এতে অর্থব্যয় না ক'রে গরীবদের দান করলে সার্থক হ'ত—এই চিন্তা অভিনব। বিলাসে অর্থব্যয় না করার চিন্তা তাকে মনুষ্যত্ব দান করেছে।

সূত্রধারের সংলাপে 'প্রথমে স্বজাতীয় এবং পরে বিজাতীয় ভাষা

শিক্ষা করা উচিত' বলা হয়েছে। আবার রামকৃষ্ণ ইয়ংবেঙ্গলদলের সম্পর্কে রামখোদার গল্প বলে। গ্রন্থটি চলিত ভাষায় লিখিত; স্থানে স্থানে পদ্য ( পয়ার ও ত্রিপদী ) দেখা যায়।

চার ইয়ারের বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্বে দৈববাণী হয়। সামাজিক নাটকে দৈববাণী? বৃন্দাবনে তাদের এক একটি পুত্র হ'ল—তারা কি সেখানে বিবাহ করেছিল? সারদা, কামিনী প্রভৃতি সেখানে গিয়েছিল? বর্ণনার মধ্যে নাটক শেষ হয়েছে। সংলাপের মাধ্যমে দিলে ভাল হ'ত। নাটকীয় বিষয় ও চরিত্র থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থকর্তা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেন নাই। কামিনী ও সারদা এই দুই চরিত্রেব ট্রাজিক দিক আরও ভালভাবে দেখান যেত তবে নাট্যকারের গৌরদাস বাবাজী চরিত্র চিত্রণের প্রশংসা করতে হয়।

২। একেই কি বলে সভ্যতা? ( ১৮৬০ ) মধুসূদন দত্ত।

বেশ্যাগমন বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এর কাহিনী এই—নববাবুর পিতা বৃন্দাবন হ'তে বাড়ী আসায় নববাবুর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাওয়ার বিঘ্ন। সেখানে সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনা হয় একথা ব'লে বন্ধু কালীবাবু নববাবুকে নিয়ে যেতে অনুমতি পায়। কিন্তু কর্তাবাবু কলকাতার হাল বুঝেন ব'লে বৈষ্ণব বাবাজীকে উক্ত সভার বিষয় জানতে পাঠান। বৈষ্ণব বাবাজী মাতাল, বারবিলাসিনী প্রভৃতির দ্বারা নির্যাতিত ও অপমানিত হ'য়ে চৌকিদার ও সারজনের হাতে পড়ে। শেষে ঘুষ দিয়ে মুক্তি পেলে চৌকিদার তাকে সভার বাড়ী দেখিয়ে দেয়। নববাবু ও কালীবাবুর সঙ্গে তার দেখা হ'লে নববাবু ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় চৈতনবাবুর সভাপতিত্বে ব্র্যাণ্ডি, তামাক, পয়োধরীর গীত এবং নববাবু ও কালীবাবুর উপস্থিতিতে বক্তৃতা ও মদ্যপান চলে। নববাবু বাড়ীতে এসে আরও ব্রাণ্ডি চায়। কর্তাবাবু জানতে পারলে বিভ্রাট বাধবে ব'লে নববাবুর স্ত্রী হরমণি, ভগিনী প্রসন্ন এবং ভৃত্য বৈদ্যনাথ চিন্তিত। শেষ পর্যন্ত কর্তা সব জেনে সকলকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করতে চান।

সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে মাইকেল মধুসূদন এই প্রহসন-

খানি রচনা করেন। 'জ্ঞান তরঙ্গিণী সভা' মাইকেলের পরিচিত কালী-প্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা।' তখনকা'র দিনের বিভিন্ন সভার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অনেকে বাড়ীতে মদ্যপান এবং বার বিলাসিনী নিয়ে আমোদ প্রমোদে বাধা ব'লে গোপনে সভার নাম দিয়ে গুরুজন ও অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়ে আমোদ করত। তখনকার দিনে রাস্তায় ঘাটে বারবিলাসিনীরা বেল্লিকপনা করত। বাবাজী বামা ও থাকি নামে দুজন বারবিলাসিনীর দ্বারা লাঞ্ছিত। সারজন ও চৌকিদার ঘুষ নিত। নববাবুব স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিভেদলোপ, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সভ্যতার লক্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা Young Bengal দের কথার প্রতিধ্বনি। কিন্তু আমরা হরমণির কথার ধ্বনি তুলে জিজ্ঞাসা করি 'মদমাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা? এই খানেই নামকরণের সার্থকতা। "ইয়ং বেঙ্গাল" অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্ত্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পাবি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।' [৪] নববাবু বিলাসের নববাবুর কথা স্মরণ করায়।

নববাবু এই প্রহসনের নায়ক হিসাবে যথার্থ চিত্রিত। বাড়ীতে ফিরে এসে সে চিৎকার করলে হরমণি তাকে সাবধান করে। নববাবু তাকে খেমটাওয়ালী পয়োধরী ভেবে বলে, 'এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ'—এ রকম স্বামীর স্ত্রী হরমণি। স্বামীর ব্যবহারে সে দুঃখিত, লজ্জিত। কিন্তু তার জীবনে এখনও ঠাট্টা তামাসা আছে। নববাবু একদিন প্রসন্নকে চুম্বন করেছিল ব'লে সে প্রসন্নকে ঠাট্টা করে, 'ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না।' কিন্তু তামাসা বেশীক্ষণ

৪। বিবিধার্থ সংগ্রহ—১৭৭৯-৮০ শকাব্দ পৃ-২৮১

চলে না। সে নৃত্যকালীকে দুঃখ ক'রে বলে, 'সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ কর্য়ে বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুন্‌লে জেগে উঠে!' সে তার দুর্ভাগ্যের জন্য বিধাতার দোষ দেয়। কিন্তু আমরা জানি বিধাতা কাকেও মদ খেয়ে মাতলামি করতে বলেন না। অতি দুঃখে হিন্দু রমণী হ'য়ে তার মুখ হ'তে বের হয়, 'এমন স্বামী থাক্‌লিই বা কি, আর না থাক্‌লিই বা কি?' হরমণি কামিনী ও সারদার পূর্বরূপ। লেখকের সমাজ-সচেতনতা প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থটিতে দুটি অঙ্ক এবং প্রত্যেকটিতে দুটি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নববাবু এবং কালীবাবুর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাত্রা এবং কর্তার বাবাজীকে দিয়ে অনুসন্ধানের ইচ্ছা, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আয়োজন দেখে বাবাজীর বিস্ময় এবং নববাবুর তাকে বশে আনার ইচ্ছা, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার কার্য এবং দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মাতাল নববাবুর জন্য সমস্ত পরিবারের আক্ষেপ প্রকাশিত। ১/১ এ ঘটনাস্থল নববাবুর গৃহ, ১/২ এ সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট, ২/১ এ সভা এবং ২/২ এ নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির হওয়ায় প্রহসনটিতে স্থানঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। একদিন বৈকাল হ'তে রাত্রি পর্যন্ত এই প্রহসনের ঘটনাকাল; সুতরাং কালঐক্য ও বজায় আছে। গতির দিকেও কোন ত্রুটি নাই। চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপ যোজনার প্রশংসা উদ্ধারযোগ্যঃ- 'মনুষ্যের যথার্থ প্রকৃতির অবিকল অনুভব করিয়া উজ্জ্বল বাক্যে তাহার উদ্ঘাষণ যে কবির প্রকৃত ধর্ম্ম ও বীণাপাণীর মুখ্য প্রসাদ তাহা দত্তজর উপলব্ধ হইয়াছে—।' [৫]

পয়োধরী রাগিণী শঙ্করা, তাল খেম্‌টায় একটি গীত শোনায়—

এখন্ কি আর নাগর্ তোমার্
আমার প্রতি, তেমন আছে।

গানটি জমবে ভাল এবং তার চরিত্র অনুযায়ী ঠিকই। গ্রন্থটিতে হাস্য ও বীভৎস রস পরিবেষিত। কালীবাবু যখন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আর

৫। ঐ। পৃ-২৮১

জয়দেবের গীতগোবিন্দ বলতে না পেরে শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর বোপদেবের বিন্দা দূতী বলে এবং সিকদার পাড়া ষ্ট্রীটে বাবাজী যখন নাস্তানাবুদ হয় তখন আমরা হেসে অস্থির হই। আবার সভার কার্য-পদ্ধতিতে, নববাবুর বাড়ীতে অন্তঃপুরে তাসখেলায় এবং হরমণি ও প্রসঙ্গের মধ্যে স্থূল রসিকতায় আমরা না হেসে যদিও থাকি কিন্তু যখন কর্তা মনের দুঃখে আগামী কাল সকলকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করতে চান, এখানে নববাবুকে রাখার আর কাজ নাই এবং তাকে ঘুমাতে দিয়ে সকলকে চলে যেতে বলেন তখন নববাবুর 'হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।' —এই কথা শুনে না হেসে থাকা যায় না। কিন্তু সর্বোপরি প্রহসনের যা উদ্দেশ্য হাস্যরসের মাধ্যমে গুরুতর বিষয় অবতারণা তা প্রহসনে অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার মত সভার সভ্যদের প্রতি আমাদের ঘৃণার ভাব স্থায়ী হয়।

মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনের প্রভাব পরবর্তী নাটক ও প্রহসনে যথেষ্ট। কালীবাবুর শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর বোপদেবের বিন্দা দূতী নদের চাঁদের 'আই মা হরিণের শিঙ' এ পরিণত। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় নববাবুর বক্তৃতা ও নদের চাঁদের বক্তৃতা তুলনীয়। এখানের হরমণি ও সধবার একাদশীর কুমুদিনীর মধ্যে যথেষ্ট মিল। 'প্রহসন-মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' [৬]

৩। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ—মধুসূদন দত্ত।

বৃদ্ধের লাম্পট্য ও ব্যভিচার বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। বৃদ্ধ ভক্ত-প্রসাদবাবু ভৃত্য গদাধরের পরামর্শে ও সাহায্যে ব্যভিচার চালায়। চাষী হানিফের যুবতী স্ত্রী ফতেমার প্রতি তার আসক্তি। ফতেমা শুধু যুবতীই নয় সুন্দরীও বটে। তার জন্য অর্থব্যয় ক'রে তাকে সে বশে আনতে চায়। কার্যসিদ্ধি করতে গদাধর পুঁটিকে লাগায়। ফতেমা হানিফকে সব জানালে সে বাচস্পতিকে ব'লে ভক্ত প্রসাদবাবুকে জব্দ

৬। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা—শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত। পৃ ৫২

করতে মতলব অাঁটে। পুঁটির সঙ্গে ফতেমা এক ভগ্ন শিবমন্দিরের নিকটে আসে। সেখানে ভক্তপ্রসাদবাবু ফতেমাকে প্রেম নিবেদন করে। ফতেমা লোকভয়ে এবং স্বামীর ভয়ে মন্দিরের মধ্যে যেতে চায়। হানিফ নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে তাদের ভয় দেখায় এবং বস্ত্রাবৃত অবস্থায় এসে 'গদাধরকে চপেটাঘাত,' ভক্তপ্রসাদবাবুর 'পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত' এবং 'পুঁটিকে পদপ্রহার' ক'রে প্রস্থান করে। বাচস্পতির আগমনে ভূতের ভয় গেলেও ফতেমার উপস্থিতিতে জাতিনাশের আশঙ্কায় তাঁর ব্রহ্মত্র সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে এবং নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মুখবন্ধ করতে চায়। হানিফ গাজীকেও দু'শ টাকা দিতে হয়। পরিণামে ভক্ত-প্রসাদবাবু স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা করতে থাকে।

গ্রন্থটিতে দুটি অঙ্ক এবং প্রত্যেক অঙ্কে দুটি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। ১/১ এ ভক্তপ্রসাদ বাবুর ফতেমার প্রতি আসক্তি, ১/২ এ এর জন্য পুঁটির তৎপরতা এবং হানিফ ও বাচস্পতির পরামর্শ, ২/১ এ ভক্তপ্রসাদের ফতেমার সঙ্গে মিলনের ব্যগ্রতা, সাজসজ্জা এবং ২/২ এ বাবুর সঙ্গে ফতেমার সাক্ষাৎ, বাবুর স্বরূপ প্রকাশ এবং আক্ষেপ। ঘটনার অগ্রগতি কোথাও শ্লথ হয় নাই। পঞ্চীর প্রতি বাবুর আসক্তিতে আর একটি উপকাহিনী। ঘটনাস্থল ১/১ পুষ্করিণীতটে বাদামতলা, ১/২ হানিফ গাজীর নিকেতন সম্মুখে, ২/১ ভক্তপ্রসাদবাবুর বৈঠকখানা ও ২/২ এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির। আর ঘটনাকাল দু একদিন মাত্র। সুতরাং প্রহসনটিতে গতিঐক্য, স্থানঐক্য এবং কালঐক্য বিঘ্নিত নয়।

চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি দেখিয়ে উচ্চদরের হাস্যরস পরিবেষণে মাইকেলের ভক্তপ্রসাদ চরিত্র অদ্ভুত। যে সামান্য খাজনা ছাড়তে চায় না—সে পরস্ত্রীলোভে যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত। মুখে তার ধর্মের বুলি, অন্তরে কুচিন্তার ঝুলি। যবনীগমনেও তার আপত্তি নাই। পঞ্চীকে পেতে সে অকাতরে অর্থব্যয় করতে চায়। কিন্তু বড় ঘর ব'লে তার সুবিধা হ'ল না। কলকাতায় জাতের বিচার নাই—সকলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে ব'লে পুত্র অম্বিকার জন্য সে চিন্তিত। গদাধরের মত আমরা বলতে পারি, 'নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের

মেয়েদের নিলে কিছু হয় না।' ইংরাজী শিখে কুলে কলঙ্ক দেওয়ার ভয়ে পুত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে আনতে চায়। অথচ নিজে ইংরেজীতে অশিক্ষিত হ'য়ে কুলকে কি রকম উজ্জ্বল করছে তা চিন্তা ক'রে আমরা বিস্মিত। ফতেমার সঙ্গে মিলিত হ'তে যাওয়ার পূর্বেও সে মনে মনে রাধাকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে। তার সাজপোষাক দেখলে হাসি পায়। হানিফের স্ত্রীর গায়ে প্যাজের গন্ধ দূর করতে সে আতর সঙ্গে নিয়ে যায়। দেবতা ও দেবমন্দির সম্বন্ধে তার মন্তব্য তার মত লম্পটের পক্ষেই সম্ভব। হানিফের মার খেয়ে অর্থদণ্ড দিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় 'আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।'

গদাধর ভক্তপ্রসাদের উপযুক্ত ভৃত্য। সে তার পরামর্শদাতা, বন্ধু ও সাহায্যকারী। বাবুর চরিত্রদোষে ইন্ধন জোগাতে পারলে তার লাভ। সে বলে, "কত্তাটি এমনি খেপে উঠ্‌লিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।" ভৃত্য হ'য়েও বাবুর মত সুখভোগে তার কামনা। এ জন্য সে অপর এক ভৃত্য রামকে তার জন্য তামাক সাজতে বলে এবং নিজে বাবুর গদির উপ ব'সে আরাম করতে থাকে। সে স্বগত বলে, "আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুদ খায়, আর এমনি বালিসের উপর ঠেস দিয়ে বসে, তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে?" এরপর সে আরাম ক'রে তামাক খায়—রামকে সে গা টিপে দিতে বলে।

আর একটি উজ্জ্বল চরিত্র পুঁটি; সে কুটনী, টাকার জন্য সে একাজ করে। তবে হানিফ গাজীর বাড়ীর সম্মুখে সে যা বলে, তাতে তার চরিত্র বুঝতে দেরী হয় না। পঞ্চীর ক্ষেত্রে সে পিছপা হয়। কারণ সে দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয়। পঞ্চী উপপতি করলেও বৃদ্ধকে করবে কেন? ফতেমার ক্ষেত্রে সে হানিফকে যমদূতের মত ভয় করে। শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশী হানিফের পদাঘাতের পুরস্কার পেয়ে সে শিক্ষা পায় 'আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে।'

বৃদ্ধ লম্পট ভক্তপ্রসাদ সম্বন্ধে—

যেমন কর্ম্ম ফললো ধর্ম্ম, "বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।
—বলা হয়েছে ব'লে নামকরণ সার্থক। হাস্যরসের মাধ্যমে সামাজিক ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া প্রহসনের উদ্দেশ্য। হাস্য ও বীভৎস রসের পরিবেষণে প্রহসনটি উৎকৃষ্ট।

তবে কিছু কিছু ত্রুটিও এতে লক্ষ্য করা যায়। ১/১ এ ভক্তপ্রসাদবাবু গদাধরকে বলেছে যে সে হানিফের পত্নীকে দেখে নাই কিন্তু ২/১ এ সে বলে, "ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে।' একথা বলার পূর্বে সে ফতেমাকে দেখেছে ব'লে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ২/২ এ যে অন্ধকারে ফতেমা ও পুঁটি ভয় পাচ্ছে সেই অন্ধকারে ভক্তপ্রসাদবাবু এসে বলে, 'ছুড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যেন আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙ্গড়!' সে কি অন্তর্দৃষ্টিতে ফতেমার রূপ দেখছে? লাম্পট্য বিষয়ে অনেক প্রহসন রচিত কিন্তু হিন্দুর যবনীগমনে মাইকেল যে চরম নিদর্শন দেখিয়েছেন তা তুলনারহিত। হিন্দু সমাজ-বহির্ভূত হ'য়েও ধর্মধ্বজী ভণ্ড হিন্দুর চরিত্র চিত্রণে লেখকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা প্রকাশিত। চরিত্রদোষ ঘটলে জাতির বিচার যে থাকে না—এটাই সত্য।

মাইকেলের হানিফ গাজী দীনবন্ধু মিত্রের তোরাপের তুল্য। মাইকেলের পুঁটি দীনবন্ধুর পদী ময়রাণী, ভগী ও পঞ্চী নীলদর্পণের রেবতী ও ক্ষেত্রমণি। ক্ষেত্রমণির প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি তার মায়ের নজরে পড়ে আর এখানে পঞ্চী নিজেই বুঝতে পারে। পুঁটির সংলাপ ও আতুরীর সংলাপ একই। গদাধরের গদির উপর উপবেশন, তামাক খাওয়া, রামকে দিয়ে গা টিপানো প্রভৃতি 'তুমি যে সর্ব্বনেশে গোবর্দ্ধন' নাটকে দেখা যায়।

মাইকেল মধুসূদন তাঁর দুটি প্রহসনে ইয়ংবেঙ্গল ও রক্ষণশীল এই দুই সম্প্রদায়কে উপজীব্য করায় তাঁর প্রহসন দুটি অভিনীত হ'তে দেরী হয়েছিল। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির রঙ্গমঞ্চে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া খানি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আরপুলি নাট্যসমাজ কর্তৃক প্রথম অভিনীত

হইয়াছিল।'[৭] তৎকালীন সমাজচিত্র হিসাবে প্রহসন দুটি তুলনারহিত।

৪। বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক—প্রসন্নকুমার পাল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রসন্ন কুমার পালের বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটকে বেশ্যাসক্তির চিত্র অঙ্কিত। এর কাহিনী— ছিদাম ঘোষের পুত্র শ্যামাচরণ বেশ্যা গোলাপীর বাড়ীতে যায়। তার স্ত্রী শশিমুখী তাকে সংশোধন করতে না পেরে ঠাকুর জামাই মদনকৃষ্ণের সঙ্গে পালায়। তারা ধরা পড়ায় মদন ও দূতী হরকামিনীর কয়েদ হয় এবং শশিমুখী বেশ্যা হয়ে যায়। দুঃখে ছিদাম দেশান্তরে গমন করে, তার স্ত্রী পাগল হয় এবং মদনের স্ত্রী বিনোদিনী আত্মহত্যা করে।

ভূমিকায় নাট্যকার উদ্দেশ্য জানিয়েছেন, 'কুলাঙ্গনাগণ বিরহ বেদনায় ব্যথিত হইলে তাহারদিগের চিত্ত যে প্রকার উত্তেজিত হয়, এবং তাহারা কুলমার্গ পরিহার পূর্ব্বক বারাঙ্গনা শ্রেণীভুক্ত হইলে যে প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে পরবধূ মধুপান প্রত্যাশি লম্পটগণ যে সমস্ত দুর্ঘটনার ঘটক হয়, যেরূপ উত্তেজনা এবং ক্লেশ ও অপমান সহ্য করে, এই পুস্তকে নাটকচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে;' এই হিসাবে উদ্দেশ্য সার্থক। কিন্তু শ্যামাচরণের বেশ্যাসক্তির জন্য তার স্ত্রী বিরহবেদনায় ব্যথিত হ'য়ে কুলত্যাগ ক'রে বেশ্যা হ'তে বাধ্য হয়। লেখকের 'এতৎ পাঠে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বেশ্যাসক্তি নিবৃত্ত হয়, এই অভিপ্রায়। শ্যামাচরণের বেশ্যাসক্তির নিবৃত্তি হয়েছে কি? চতুর্থ অঙ্কেও তার মতি অপরিবর্তিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে তার কি হ'ল আমরা জানি না। সুতরাং নামকরণে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশ্যাসক্তি হ'তে সমস্ত পরিবারটির শোচনীয় পরিণাম দেখে আমাদের দেশের লোকের কিছু উপকার হ'লে নামকরণ সার্থক।

শশিমুখী নাটকটির নায়িকা। প্রথম অঙ্কে সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী বামাসুন্দরী ও কাদম্বিনীর নিকটে তার স্বামিবঞ্চিত জীবনের দুঃখ প্রকাশিত। স্বামীকে নিয়ে সুখে রাত্রি যাপনের ইচ্ছা এবং তাকে সংশোধন করার চেষ্টাও তার ছিল। 'কাল যকোন রাত্তিরে ভাত খেয়ে ঘরের ভেতোর পান খেতে গ্যালো, তকোন আমি মোনে কোল্লুম কি

---

৭। দৃশ্যকাব্য পরিচয়—শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। পৃ ৪৭

আজকে আর যেতে দেবো না, তাই মোনে কোরে ভাই, আমি তাঁর কোঁচাটা ধোল্লুম, তাতে সে পোড়া কোল্লে কি বোন্, ন্যাংটো না হোয়ে দৌড়ে গিয়ে আঁল্লা থেকে আর একখানা কাপোড় পোরে গ্যালো,……।' তার মর্মভেদী হাহাকার 'হায়! আমার কি তেমন ভাগ্‌গি হবে যে প্রাণনাথ আমার সঙ্গে কতা কবেন।' —এ কথায় প্রকাশিত। এত দুঃখ সহ্য করলেও রঙ্গ-রসিকতা তার যায় নাই। বিনোদিনীর সঙ্গে তার রসিকতা স্মরণীয়। এর পর সঙ্গত কারণেই সে মদনকৃষ্ণের সঙ্গে রসিকতা ক'রে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। গৃহত্যাগ করার পূর্বে সে তার স্বামীকেই এ জন্য দায়ী করেছে। সে যে অন্যায় করছে তা বুঝে। তার নিরুপায় অবস্থায় বেণী গারদে তার শ্বশুরের তিরস্কারের উত্তরে বলতে শুনি 'য়্যাকন আর আমাকে মিচে বোক্‌লে কি হবে, আমি অবলা হোয়ে যে যাতনা সোয়ে এয়েচি তা আমিই জানি।' ষষ্ঠ অঙ্কে কাইমুদ্দি তাকে ভোগ করতে চাইলে 'হায়, আমি এমন কুকর্ম্ম ক্যান করিয়াছিলাম, যে অতি জঘন্য পিশাচবৎ যবন দ্বারাও অপমানিত হইতে হইল।' —এই আক্ষেপোক্তি শুধু শশিমুখীর নয়। কে জানে গোলাপীও শশিমুখীর মত কোন গৃহস্থের কুলবধূ ছিল কি না। শশিমুখীর অবস্থায় পড়লে চার রকম হওয়ার সম্ভাবনা—বেশ্যা হয়ে যাওয়া, দুঃখে আত্মহত্যা করা, ঘরে ব'সে গোপনে ব্যভিচার করা এবং নীরবে সহ্য করা। শেষ তিনটি অবস্থার চিত্র আমরা অন্যত্র দেখতে পাব।

শ্যামাচরণ এই নাটকের নায়ক। যুবতী স্ত্রীর প্রতি তার কোন আকর্ষণ নাই—কোন কর্তব্য নাই। স্ত্রীর ট্রাঙ্ক ভেঙ্গে টাকা নিয়ে বেশ্যা গোলাপীর বাড়ীতে তার সঙ্গে মদ্যপান ও ব্যভিচারে সে লিপ্ত। স্ত্রীর কুলত্যাগের সংবাদ সে যখন পায় তখন তার নির্মম উক্তি আমাদের মর্মে আঘাত করে। সে বলে, 'যেতে দাও গে, য়্যাকটা রাঁড় বেড়েছে, আমি য়্যাকন এ গর্‌রা ছেড়ে যেতে পাল্লেম না।' সে যে সমস্ত অনর্থের মূল তার জন্য সে অনুতপ্ত নয়।

মদনকৃষ্ণ প্রতিনায়ক হিসাবে চিত্রিত। সে স্বভাবে শয়তান প্রকৃতির নয়। তবে শশিমুখী তাকে ইন্ধন দিয়েছে। তার ব্যভিচারই এই নাটকের বিষাদকরুণ পরিণতি ঘটিয়েছে। তার এবং শশিমুখীর

সম্পর্কের ভিন্নতার কথা পুলিসের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। তাদের শেষ পর্যন্ত বেণী গারদে স্থান হয়। অবশ্য মদন ঘুষ দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়।

ছিদাম ঘোষ সাধারণ বৃদ্ধ কর্তারূপে কল্পিত। চেষ্টা ক'রে সে পুত্রকে সুপথে আনতে পারে নাই। বেণী গারদে মদন ও শশিমুখীকে তার তিরস্কারে নিম্নরুচির ভাষা প্রয়োগ হ'লেও দুঃখে, অপমানে জর্জরিত বৃদ্ধ কর্তার মুখে সময়োপযোগী।

সারজনকে মদনকৃষ্ণের ইংরেজীতে 'উই গো আওয়ার ফ্রেণ্ড হাউস্ ফর ইনভাইট, নাউ গোয়িং হাউস।' —উক্তি ছলনা হ'লেও সাহেব-দের বুঝাতে এ রকম ভাষার প্রয়োজন ছিল। হাস্যরস পরিবেষণে এ ভাষা সাহায্যকারী।

নাটকটির মধ্যে একই বিষয়ে গদ্য এবং পদ্য সংলাপ ব্যবহৃত। প্রথম অঙ্কে শশিমুখী গদ্যে স্বামিবঞ্চিত জীবনের কথা বলার পর পয়ারে বলেছে—

কেনো সে দুখের কথা জিজ্ঞাসিছ সই।
প্রাণকান্ত বিনে প্রাণ বাঁচে আর কই॥

বামার ক্ষেত্রে আগে পদ্যে পরে গদ্যে একই বিষয় প্রকাশিত। শশিমুখী সন্ধ্যাকে মনোবেদনা জানাতে এই রীতি গ্রহণ করেছে। প্রাচীন যাত্রার মত ছিদাম যখন গদ্যে মদন ও শশিমুখীকে তিরস্কার ক'রে শশিমুখীর উদ্দেশ্যে গানের আকারে বলে—

বাসনা কি ছিল তোর জাতি কুল খাবি মোর

কি দুঃখে বাহির হোয়ে, এলি মোর জাতি খেয়ে
বল দিকি শুনি তোর বোল॥

তখন আমরা বিস্মিত। রাগিণী ও তাল লেখা থাকলে ভাল হ'ত। অভিনয়-কালে পরিচালক তার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দিতেন। কাদম্বিনী, বামা প্রভৃতির স্বামীনিন্দা মঙ্গলকাব্যের পতিনিন্দার প্রভাবে প্রভাবিত।

ফলারের বিষয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রভাব পড়েছে এবং শশিমুখীর স্বগত ভাষণ আলঙ্কারিক ও কৃত্রিম হ'য়ে পড়ায় রসহানি ঘটিয়েছে। নাটকটিতে পাত্রপাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থান অনেকস্থলেই ছাপা লেখা নাই; ভ্রম সংশোধন স্থানে ঐগুলির উল্লেখ আছে।

নাটকটিতে ছটি অঙ্ক আছে—দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক নাই। প্রথম অঙ্কে শশিমুখীর মনোবেদনার ইঙ্গিত, দ্বিতীয় অঙ্কে মদনের উপস্থিতি এবং তার সঙ্গে শশিমুখীর কুলত্যাগের ষড়যন্ত্র, তৃতীয় অঙ্কে শশিমুখীর কুলত্যাগ, চতুর্থ অঙ্কে তাদের বেণী গারদে অবস্থান এবং বিচার, পঞ্চম অঙ্কে ছিদামের দেশান্তরে গমন, জটিলের ( জটিলার ? ) পাগল হওয়া এবং বিনোদিনীর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা; ষষ্ঠ অঙ্কে শশিমুখীর অনুতাপ—এ ভাবে ঘটনা চতুর্থ অঙ্কে চরম অবস্থায় উঠে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে পরিণতির পথে গেছে।

পরিশেষে একটি কথা বলতে হয়—গ্রন্থটিতে প্রধান প্রধান চরিত্র অপেক্ষা পার্শ্বচরিত্রগুলি সুপরিস্ফুট। ছিদাম, শ্যামাচরণ, জটিলে, শশিমুখী অপেক্ষা রামচন্দ্র আচার্য, মদনকৃষ্ণ, জমাদার, বামাসুন্দরী, কাদাম্বিনী, বিনোদিনী, হরকামিনী প্রভৃতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত।

৫। রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা—( ১৮৬৩ )

প্যারিমোহন সেন।

প্যারিমোহন সেনের রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এতে এক সাধুর কলকাতায় এক লম্পটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শহরে রাঁড়, মারামারি, মিথ্যাকথা চলছে। লাম্পট্য, মদ্যপান, মিথ্যাকথা, পরধন হরণ প্রভৃতি দেখে সাধুর চিত্ত চঞ্চল। ফলে সাধুর সাধুত্ব নষ্ট হয় এবং সে লম্পটের সঙ্গে বারাঙ্গনাদের নিকটে যায়। সাধু বেশ্যাসক্ত হ'য়ে সেখানে দিন কাটাতে থাকে।

গ্রন্থটি প্রহসন বা নক্সা জাতীয় রচনা। বেশ্যাসক্তি, মদ্যপান এবং মিথ্যাকথার দ্বারা প্রতারণা প্রভৃতি সামাজিক কুরীতি এর বিষয়। সোনাগাজিতে রাঁড় ভাঁড়ের দৃষ্টান্তে এবং মেছুয়াবাজারে বারাঙ্গনাগণের চরিত্র ও বয়সের বর্ণনায় লেখক যে শুধু উনিশ শতকের সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন তা নয় বিশ শতকেও এ রকম চিত্র অস্বাভাবিক নয়।

এতে দুটি চরিত্রের মধ্যে লম্পট চরিত্র কোন পরিণতি লাভ করে নাই। সাধু চরিত্রে লম্পটের সংস্পর্শে পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটনা সংলাপের মধ্যে গতি লাভ করে নাই। বর্ণনাধর্মী হ'য়ে পড়ায় নাটকীয় গতি ক্ষুণ্ণ। কলকাতায় বারাঙ্গনাগণের ও বাবুদের কীর্তিকলাপকে চরিত্রের মাধ্যমে রূপ দিলে আরও হৃদয়গ্রাহী হ'ত।

প্রহসনটির প্রথমে রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটায় যে গানটি আছে তাতেই বিষয়বস্তু বুঝা যায়। গানটি এই—

যদি কেহ সুখী হতে চাও। হিত কথা বলি শুন উপদেশ লও ॥
পরস্ত্রী, পরধন, সদা করিবে হরণ, মিথ্যা কথা প্রতারণা, এই কার্য্যে রও ॥
মিছে কাল কর গত, মদ্যপানে হও রত, সুখ পাবে বিধিমত,
বেশ্যাসক্ত হও ॥

গানটির গায়ক কে যদিও উল্লেখ নাই কিন্তু পরে আমরা জানতে পারি যে গায়ক লম্পট।

সংলাপে গদ্য এবং পদ্য ব্যবহৃত। পদ্যে ত্রিপদী এবং পয়ার ছন্দ, গদ্যে শুধু সাধু ভাষা। একই বিষয়ে পূর্বে গদ্য এবং পরে পদ্য স্থান পাওয়ায় প্রাচীন যাত্রা লক্ষণাক্রান্ত। এতে কোন অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্কের ভাগ নাই। নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট থাকলেও লেখক তা ব্যবহার করতে পারেন নাই। গত শতকের প্রথম দিকের সমাজচিত্র কলিকাতা কমলালয়, নববাবুবিলাস প্রভৃতিতে যে রকম তারই অনুস্মৃতিরূপে নাট্যরচনা এই 'রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা।'

লেখক গ্রন্থশেষে লিখেছেন—'এইরূপ সাধুবর বেশ্যাসক্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন, পরে তাহার যেরূপ অবস্থা হইল তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। ইতি—প্রথম খণ্ডঃ।' কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড না পাওয়ায় তার কি রকম অবস্থা হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পরিশেষে বলতে হয় লেখক যে বিষয়বস্তু অবলম্বন করেছেন তাতে অশ্লীলতা আসা অস্বাভাবিক ছিল না। আধুনিক রুচির বিচারে গ্রন্থটিতে নিম্নরুচির পরিচয় থাকলেও তৎকালীন দৃষ্টিতে লেখক যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন ক'রে শৃঙ্গার ও বীভৎস রস পরিবেষণ করেছেন।

৬। চক্ষুঃস্থির—ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তি।

সন ১২৭২ সালে প্রকাশিত ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তির চক্ষুঃস্থির নাটকে আমরা নেশাখোর, লম্পট ও প্রবঞ্চকদের বিষয় জানতে পারি। এর কাহিনী এই—কলিরাজা তাঁর সভায় সহধর্মিণীকে গুলিখোর, মাতাল, লম্পট, গাঁজাখোর ও প্রবঞ্চক এই পাঁচ সচিবকে দেখালেন। তাঁর রাজ্য এতদিন মন্ত্রীদের দ্বারা চলত এখন তিনি রাজ্যের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। রাজপুরোহিত সুরাচায্যের দুঃখ দূর করতে ধর্মকে সমূলে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে কলিরাজা যুদ্ধ যাত্রা করলেন। গাঁজাখোর, গুলিখোর, মাতাল, জোয়াচোর প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। সুরাচায্য কলিরাজার জয়ধ্বনি দিলেন এবং আনন্দে নৃত্য এবং গীত আরম্ভ করলেন।

ভূমিকায় চক্ষুস্থির নাটককে গদ্য পদ্য বিরচিত পুস্তক এবং প্রবন্ধ রূপে ধরা হয়েছে। তবে 'ভরসা করি এতৎ পাঠে মনুষ্যের চিত্র ক্ষেত্র হইতে কণ্টক সমাকীর্ণ দুষ্পিবৃত্ত সমূহ কিঞ্চিৎ দূরিকৃত হইতে পারে, কারণ দুষ্পিবৃত্ত ভাজন হইলে তৎসমূহের ফলাফল ভোগ ইহাতে বিলক্ষণ বর্ণিত হইল,......' একথায় উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

গণেশাদি পঞ্চদেবতার পরিবর্তে গুলিখোর, গাঁজাখোর প্রভৃতির বন্দনা কালোপযোগী। ত্রিপদীতে গুলিখোর ও গাঁজাখোর বন্দনা, পয়ারে মাতাল বন্দনা, লঘু ত্রিপদীতে লম্পট বন্দনা এবং ত্রিপদীতে জোয়াচোর বন্দনায় কবিত্ব প্রকাশিত হ'লেও নাট্যলক্ষণ ক্ষুণ্ণ। নাটকীয় সংলাপ এবং সংঘাতের অপেক্ষা প্রবন্ধাকারে লেখার প্রভাব বেশী। 'গানের শেষ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ পাইবেক' —এ কথা লেখা আছে কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুরাচায্যের দুটি গানের প্রথমটির রাগিণী আচারভ্রষ্ট, তাল ধর্ম্ম-নষ্ট এবং দ্বিতীয়টির রাগিণী ঝালঝাড়া তাল বেয়াড়া। যেমন রাগিণী ও তাল তেমনই গানের বিষয়বস্তু। প্রথম গান ইংরেজ সভ্যতার পক্ষে এবং হিন্দুয়ানীর বিপক্ষে।—

চল সবে চর্চ্চে যাব লাইট পাব
অন্ধকারে আর রব না।

সুরাচায্যের কলিরাজার নিকট আবেদন '...যদি আপনি ভাগ্যক্রমে আসিয়াছেন তবে দয়া, মায়া, ধর্ম্ম, একেবারে সহমূলে বিনাশ করুন এ সকল কর্ম্ম কাণ্ড লণ্ড ভণ্ড করুন তাহা না হইলে আর রক্ষা নাই।' —বেশ চিত্তাকর্ষক। তাঁর কলিরাজাকে আশীর্বাদ—

'জয়স্তে কলিরাজায় ধর্ম্মনাশায় নৃপবর।
যুবতি কুমতি সর্ব্বে কিমাহ্লাদমতঃ পর॥
দ্বিজ সর্ব্বে মত গর্ব্বে সন্ধ্যা গায়ত্রী বিবর্জ্জিতা।
পাপে পূর্ণ মহীতল ঘোর কলি প্রবাহিতা॥' —কৌতূহলোদ্দীপক।

গুলিখোর, গাঁজাখোর প্রভৃতির অবস্থা দেখে এবং ধর্ম নষ্ট হ'তে দেখে সকলের চক্ষুঃস্থির হবে। —এ জন্য নামকরণ সার্থক।

৭। বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি প্রহসন—কোন নাট্যানুরাগি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত।

'কোন নাট্যানুরাগি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত' * 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' প্রহসন সন ১২৭০ সালে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত। কাহিনী—প্রিয়বাবু তার রক্ষিতা বেশ্যা হেমলতার জন্য সব কিছু নষ্ট করছে ব'লে তার অকপট বন্ধু কেদারবাবু তাকে নিবৃত্ত করতে চায়। বেশ্যার ভালবাসা ব'লে কিছু নাই; তারা প্রেমের ধার ধারে না—এ নিয়ে তাদের বাজি হয়। বাজিতে যে হারবে তাকে দুশ টাকা দিতে হবে। এরপর শ্যামবাবুর বাগানে হেমলতার কেদারবাবুর প্রতি প্রেম-আলাপের সময় শ্যামবাবুর অসুখের সংবাদ দিয়ে প্রিয়বাবুকে আনা হয় এবং সে নিজের ভুল বুঝে বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি ব'লে স্বীকার করে।

প্রহসনটির বিজ্ঞাপনে গ্রন্থপ্রণেতা জানিয়েছেন 'দুঃসাহস সমুদ্রে একমাত্র সমাজোপকার ভরসাতরি অবলম্বনে ভাসিত হইলাম।' বেশ্যাগমন বন্ধ করার জন্য লেখক এই প্রহসন রচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রথম অঙ্কে চৌদ্দ আইনের কথা এসে পড়েছে। প্রিয়বাবুর মত যাদের

* শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুকুমার সেন ও আশুতোষ ভট্টাচার্য রাধামাধব হালদারের 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি'র উল্লেখ করেছেন। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড- সুকুমার সেন। পৃ ৮৮। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড- ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ ৬১২

কিছু ভাল অবস্থা তারা অনেকেই বেশ্যা রাখা সামাজিক প্রতিপত্তির লক্ষণ বলত। শ্যামবাবু এর দার্শনিক ব্যাখ্যা করে, '…মিনস্ (means) থাকতে যে না এঞ্জয় ( Enjoy ) করে সে অতি মূর্খ চক্ষু বুজলেই সব অন্ধকার, অতএব যে কদিন বেঁচে থাকা যায় মনের সাধ মিটিয়ে লওয়া উচিত।'

মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, ধনী কিভাবে হৃতসর্বস্ব হয় তা এই গ্রন্থে আছে। দেওয়ান বকলমে প্রিয়বাবুর সই করিয়ে টাকা তছরূপ করে। দেওয়ানজির স্বার্থপরতা এবং প্রিয়বাবুর দৈনন্দিন জীবনচিত্র এ রকম— 'বাবু আমার সমস্ত রাত্রি বেশ্যার বাড়ি, প্রাতঃকাল হতে দুই প্রহরাবধি নিদ্রা, তারপর স্নান আহার সাঙ্গ হতেই তৃতীয় প্রহর, অমনি পাঁচবেটা খোসামুদে মোরসাহেব হাজির, খোস গল্পেই সন্ধ্যা, এ রূপ মনিব না হলে কি চাকরি করে সুখ আছে, বিষয় কর্ম্ম দেখবার এক দণ্ড সাবকাশ নাই, আয় সকলি আমার হাত, আদায় যা হয় তার চোদ্দ আনা আমার বক্রি দুই আনা বাবুর বেশ্যার খরচ, অন্যান্য খরচ সমস্ত দেনার উপর নির্ভর……আর দশ হাজার হলেই কলা দেখাই………।' এতে বেশ্যার ছলনা, স্বার্থপরতা সমস্তই সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয়, নববাবু বিলাস প্রভৃতির প্রভাব স্পষ্ট। হেমলতা প্রিয়বাবুকে শেষে অনুরোধ করেছে—'আমাকে ছেড়ে অন্য কার কাছে যেও না, সকলি সমান, এ সব কায ত্যাগ করে মাগ ছেলে নিয়ে সুখে ঘর করগে।' কিন্তু প্রিয়বাবু বাজির সর্ত অনুযায়ী বেশ্যাগমনে বিরত হবে; হেমলতার অনুরোধ করার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ এটা তার মনের কথা কি না কে জানে।

প্রিয় বাবু এই প্রহসনের নায়ক। তাকে সৎপথে আনার জন্য কেদারবাবু বলেছে, 'সামান্য বেশ্যাদের উপর লাভ ( Love ) কি ফেৎ ( Faith ) রাখা উচিত নয়, স্ত্রীজাতিমাত্রেই অবিশ্বাসিনী, তাতে বেশ্যা, ওরা অর্থের লোভে সকলি কত্তে পারে, এমন কি ধন পেলে জীবন পর্যন্ত বিনাশ করে।' বেশ্যাসক্তির ফলে প্রিয়বাবু অবুঝ। তারই সাতনরী হার গলায় প'রে হেমলতা তার বক্ষে পদাঘাত করে। কেদারবাবুর প্রতি আকর্ষণ এবং তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলে প্রিয়বাবু তার স্বরূপ

বুঝে তিরস্কার করে। বন্ধু কেদারবাবুর প্রশংসা ক'রে নিজে আক্ষেপ করে—'উঃ! বেশ্যার প্রণয় কি বিষম।'

নায়িকা হেমলতা ছলনা, প্রতারণা, স্বার্থপরতায় প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা। তবে তার মা সৌদামিনী তাকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই দুজনই যে কেদার বাবুর দ্বারা পরাজিত হবে তা কে জানত? মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করলেও কেদারবাবু মদ্যপানও করে না বেশ্যার প্রতিও তার কোন আসক্তি নাই। তার চারিত্রিক বিশুদ্ধির বিষয়ে দিনবাবু 'Reverend সাহেব' ব'লে এবং শ্যাম 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ ভেতরে যে কি করেন তা কে বল্‌তে পারে, ডুবে জল খেলে মহাদেবের বাপেরো সাধ্য নাই যে জানতে পারেন' ব'লে ব্যঙ্গ করলেও আমরা বলতে পারি তার চরিত্র নির্মল। সে বন্ধুকে সৎপথে আনার জন্য হেমলতার সঙ্গে ছলনা করেছে। শ্যামবাবুর বাগানে হেমলতার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে সাক্ষী হিসাবে গোপনে শ্যামবাবুকে রেখেছে পাছে তার চরিত্রে কেউ সন্দেহ করে। শেষ পর্যন্ত সে প্রিয়-বাবুকে সৎপরামর্শ দিয়েছে 'স্ত্রী পুত্র, পরিবারগণের চিত্ত যাতে সর্ব্বদা সুখে থাকে তাই কর, তা হলেই আবার জন সমাজে সুখ্যাতির ভাজন হবে।' আবার হেমলতার প্রতি তার সহানুভূতি কম নয়। সব দিক বিবেচনা ক'রে কেদারবাবু প্রশংসার যোগ্য। এর বিপরীতে স্বল্প পরিসরে শয়তান দেওয়ান চরিত্র অতি সুন্দর ও যথাযথ।

প্রহসনটিতে চারটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে প্রিয় বাবুর বৈটক-খানায় কেদারবাবুর সঙ্গে বেশ্যার ভালবাসা সম্বন্ধে বাজি, দ্বিতীয় অঙ্কে হেমলতার বাড়ীতে প্রিয়বাবুর বন্ধুবান্ধব সহ আমোদ এবং কেদারবাবুর হেমলতার প্রতি ভালবাসার ভান স্বরূপ অঙ্গুরীয় উপহারদান, তৃতীয় অঙ্কে কেদারবাবুর মিথ্যা ভালবাসায় হেমলতার তার সঙ্গে মিলিত হ'তে শ্যামবাবুর বাগানে যাত্রা এবং চতুর্থ অঙ্কে ঐ বাগানে প্রিয়বাবুর উপস্থিতি এবং হেমলতার মিথ্যা প্রণয় হ'তে মুক্তি। অঙ্ক বিভাগে কোন ত্রুটি না থাকলেও তৃতীয় অঙ্কে সৌদামিনীর সঙ্গে হেমলতার পরামর্শের পর দ্বিতীয় প্রস্তাবনা না থাকলেও চলত। ঘটনাস্থল প্রিয়বাবুর বৈটক-খানা, হেমলতার উপবেশনাগার, হেমলতার গৃহ এবং শ্যামবাবুর বাগান।

নাটকটিতে স্থানঐক্য, কালঐক্য ও গতিঐক্য বজায় আছে বলা চলে।

প্রিয়বাবুর বেশ্যানুরক্তি যে বিষম বিপত্তি ঘটিয়েছিল তা ঠিকমত দেখান হয় নাই। হেমলতার পদাঘাত এবং তার মিথ্যা প্রণয় দেখিয়েই শেষ হয়েছে। সুতবাং নামকরণে কিছু ক্রটি লক্ষ্য করা যায়।

তবে সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব আছে। প্রথম দিকে শ্যামবাবু, কেদারবাবু এবং অন্যান্য বন্ধু অনেকেই ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছে। অন্যত্র ইংরেজী শব্দ ব্যবহার কম।

শনিবার রাত্রে হেমলতার বাড়ীতে প্রিয়বাবু মোহনবাবুকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলে সে দিনবাবুকে ঠেকা দিতে ব'লে রাগিণী কাপি সিন্ধু তাল আড়া ঠেকায়

প্রণয় পয়ধি জলে, যে ডুবেচে একবার।

কুলশীল ধন মান, সকলি গিয়েছে তার॥ —এই গান গায়। প্রহসনটিতে ইয়ারদের এই গান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রিয়বাবু, কেদারবাবু, শ্যামবাবু. দিনবাবু প্রভৃতি হাস্যরস পরিবেষণ করলেও শেষ পর্যন্ত বেশ্যানুরক্তির প্রতি ঘৃণার ভাব স্থায়ী হয় এবং তাতে বীভৎস রসের পরিবেষণ ঘটায়।

গ্রন্থপ্রণেতা বিজ্ঞাপনে স্বীকার করেছেন 'এই পুস্তকে বিবিধ পং চুএসন দোষ আছে, সানুগ্রহে সংশোধনান্তে পাঠাজ্ঞা হইবেক।' লেখক যেভাবে দোষ স্বীকার করেছেন সে রকম দোষ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বানান বিষয়ে গুরুতর ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের শেষে লেখক 'শুদ্ধিপত্র' দিয়েছেন। শুদ্ধিপত্রেও অশুদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এবং শুদ্ধিপত্রে উল্লেখ নাই এমন অনেক অশুদ্ধ শব্দ (বানান ভুল) এই গ্রন্থে আছে। এ ছাড়া প্রথম অঙ্কে প্রিয়বাবুর বৈটকখানায় শ্যামবাবু ও দিনবাবুব প্রবেশের পর প্রিয়বাবুর উক্তি 'আরে এস এস শ্যামবাবু দিন বাবু এস, বস ভাই এই খানে বস। (শ্যামবাবু দিন বাবুর করস্পর্শ পূর্ব্বক উপবেশন। তবে ভাই আছ ভাল?' এর পরই কেদার বলছে 'হাঁ ভাই আমরা ভাল আছি তোমার সব মঙ্গল? ওয়েল কেদারবাবু হোপ ইউ আর এনজইং হেল্‌ত (Well Kedar Baboo hope you are enjoying health?)' এ কি ক'রে সম্ভব? প্রিয়বাবুর

সম্ভাষণ কেদারবাবুর প্রতি নয় কেদারবাবুর সঙ্গে প্রিয়বাবুর আলাপ শ্যামবাবু ও দিনবাবুর প্রবেশের পূর্বেও চলছিল। দ্বিতীয়তঃ কেদারবাবু নিজেই কি ক'রে নিজেকে সম্বোধন ক'রে কথা বলবে? দ্বিতীয় অঙ্কে দিনবাবুর 'ওহে বিবি তোমার বাবু ত কাত হয়েছেন তা আমাদের কি ঘরে গিয়ে খেতে হবে, না এই খানেই হবে।' এই উক্তির পর 'দেখ'র উক্তি 'কেন ঘরে গিয়ে খেতে হবে কেন?……' ইত্যাদি আছে। 'দেখ' ব'লে কোন চরিত্র নাই। এটি হেমলতার সংলাপ হ'বে। চতুর্থ অঙ্কে প্রিয়বাবু যখন নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় এবং লোকলজ্জার ভয়ে কাঁদতে থাকে তখন 'ভাই কেঁদ না, যুবাকাল বড় বিষম কাল',…… ইত্যাদি যে সংলাপ আছে তা কার? এ সংলাপ কেদারবাবুর ভিন্ন আর কারও হ'তে পারে না।

৮। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—রামনারায়ণ তর্করত্ন।

গৃহস্থ ব্যক্তির ব্যভিচার বিষয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এর কাহিনীতে আমরা পাই—সুধীর কলকাতায় চাকুরি করতে যাওয়ার সময় তার বাড়ীর দেখাশুনার ভার মুন্সেফের সেরেস্তাদার ভোলানাথের উপর দিয়ে যায়। এই সুযোগে ভোলানাথ এবং মুন্সেফবাবু তার স্ত্রী সুমতির প্রতি আকৃষ্ট। সুধীর কলকাতা হ'তে এলে সুমতি তাকে সব বলে। তখন কৌশল ক'রে তাদের দুজনকে ডেকে এনে লাম্পট্যের শাস্তি স্বরূপ ভোলানাথকে গাধার মত ক'রে মুন্সেফবাবুকে চূণ দিয়ে তার মাথায় মাছের চুপড়ি দিয়ে তার উপর চড়ান হয়। ঝি মতের মা কুলো বাজায়। তাদের যাওয়ার সময় সুধীর পিছন দিক হ'তে পদাঘাত করে।

প্রহসনটিতে দুটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কের সংযোগস্থল—শয়নগৃহ-পালঙ্কোপরি সুমতি ও সুধীর উপবিষ্ট। দ্বিতীয় অঙ্কের সংযোগস্থল—গৃহান্তর—সাংসারিক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট সুমতি। সুধীর, মুন্সেফ, ভোলানাথ, সুমতি এবং মতের মা—এই পাঁচটি চরিত্র। সুধীর নায়ক এবং সুমতি নায়িকা। রক্ষকবেশী নষ্টচরিত্র ভোলানাথ এবং মুন্সেফের যে শুধু সুমতির উপর দৃষ্টি তা নয়—'যার স্ত্রী, কি ভগিনী বড় সুন্দর সে নালিশ করলে অমনি ডিক্রি, আর সাক্ষী সাবুদ চাই না।' মতের মা

যখন তাকে ডাকতে যায় তখন সে তার পাপ অভিলাষ চরিতার্থের সুযোগ মনে ক'রে মন্তের মাকে বলেছে, সেই সব হ'লো, তবে তুই মাগি সেদিন আমাকে অমন কথা বল্লি কেন? তাইতেই তো তোর বৌনপোব মোকর্দ্দমাটী গেল।' তার লাম্পট্যের শাস্তি ঠিকই হয়েছে। তবে মুন্সেফবাবুর শাস্তির চেয়ে ভোলানাথের শাস্তি বেশী হওয়া উচিত ছিল। সে সুমতির দেখাশুনার সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—প্রয়োজনের সময় তাকে টাকা না দিয়ে ছলনা ক'রে তাকে পাপের দিকে টেনেছে—তার মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার উপক্রমে সে সুমতিকে পরমসুখে রাখবে ব'লে আশ্বাস দিয়েছে। তার মত শয়তান চরিত্র ভাগ্যে বেশী পাওয়া যায় না। স্বল্প পরিসরে মতের মা তার উপযুক্ত কাজই করেছে এবং মাঝে মাঝে হাসতে সে বাইরেও যেতে পেয়েছে। কিন্তু সুমতির অবস্থা! সুঅভিনেত্রী না হ'লে শেষ অঙ্ক অভিনয়ে ব্যর্থতা আসতে পারে। তবে অবশ্য অনুরূপক্ষেত্রে মাইকেলের ফতেমা যদি যথাযথ হয় সুমতি ও যথা-যথ হবে—সন্দেহ নাই।

সংলাপের মধ্যে 'পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী,' 'কাযের বেলা কাজি, কায ফুরালে পাজি' প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্য শোনা যায়। প্রথম অঙ্কে সুমতির সুধীরকে 'ভাই' সম্বোধন সপত্নী নাটকে সৌদামিনীর ভূধরকে সম্বোধনের সঙ্গে তুলনীয়। একেই কি বলে সভ্যতায় নববাবুর পয়োধরীকে সম্বোধনে এর ব্যবহার আছে। আবার তার 'মেয়ে নাথিতে মিন্সের মুখ ভেঙে দি' চার ইয়ারে তীর্থযাত্রাতে সারদার উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুন্সেফবাবুকে তার দুষ্ট স্বভাবের জন্য অপমানিত করা হ'লেও তাকে উপহাসের পাত্র করা যুক্তিযুক্ত নয়। মৃচ্ছকটিকের শকারের প্রভাবও লক্ষণীয়। সধবার একাদশী, পুনর্বিবাহ, সপত্নী প্রভৃতি নাটকে এই উপায়ে হাস্যরস পরিবেশিত। তারপর রাগ যথা ইচ্ছা এবং তাল তেথে-বচতে মুন্সোববাবুর সঙ্গীতে তার রুচিহীনতার পরিচয়ে তাকে আরও হেয় করা হয়েছে। যখন সে সঙ্গীতের জন্য মতের মাকে জোড়া তবলা আনতে বলে তখন মতের মা বলেছিল, 'একি খানকী নটীর বাড়ী যে তবলায় ঘা দেবেন!' কিন্তু সঙ্গীতের সময় মতের মা সহাস্যবদনে কি বলে? সে

তো এ সময়ে কিছু ব'লে শোধ তুলতে পারত।

প্রহসনটিতে বিশেষ কোন সামাজিক আন্দোলন স্থান পায় নাই। মুন্সেফ এবং ভোলানাথের সুমতির প্রতি আকর্ষণ ব্যক্তিবিশেষের দুষ্ট স্বভাবের লক্ষণ। যদি সুমতির চরিত্র দৃঢ় না হ'ত তাহ'লে তাকে তারা মন্দ পথে নিয়ে যেত—এ পর্যন্ত বলা যায়। আর বিদেশে স্বামী থাকলে অনেক কুলনারীইযে অনুরূপ অবস্থায় পড়ে তা বলাই বাহুল্য। তবু সুমতির সুচরিত্রের প্রকাশে গ্রন্থকর্তা মুন্সেফ এবং ভোলানাথের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' দান ক'রে নামকরণ সার্থক করেছেন এবং পোয়েটিক জাস্টিস রক্ষা করেছেন। দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনীর মন্ত্রী জলধরের এবং মাইকেলের বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁর ভক্ত প্রসাদের লাম্পট্য এবং শাস্তির প্রভাবে এই প্রহসনটি প্রভাবিত।

৯। সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র।

মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী এই—ধনী জীবনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অটলবিহারী ইয়ার নিমচাঁদ ও ভোলার পাল্লায় প'ড়ে মদ খায়। জীবনচন্দ্র ও অটলের খুড়শ্বশুর গোকুলচন্দ্র তাকে বিরত করতে চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ। ক্রমে অটল কাঞ্চন নামে এক বেশ্যার প্রতি আসক্তিতে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। জীবনচন্দ্র তাকে শাসন করতে চাইলেও তার মা তাকে প্রশ্রয় দেয়। মদ খেয়ে অজ্ঞান হ'লে গৃহিণী কাঞ্চনকে তিরস্কার করে। তার জ্ঞান হ'লে কাঞ্চন চলে যায়। অটল ইন্দ্রিয় লালসায় তার খুড়শাশুড়িকে হিজড়ার সাহায্যে আনতে পাঠায়। সে ভুলক্রমে অটলের স্ত্রী কুমুদিনীকে নিয়ে আসে। অটল তার ভুল বুঝে কুমুদিনীকে বাড়ীর মধ্যে যেতে বলে। অটলের পিতৃব্য রামধন সে এ বিষয়ে নিমচাঁদকে দায়ী করে। অটলও নিমচাঁদকে দোষ দেয়। জীবনচন্দ্রের তিরস্কারের ভয়ে অটল ও নিমচাঁদ বাগানে চলে যায়।

মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত পুরুষের স্ত্রীর দুর্গতির চিত্র এই গ্রন্থে প্রধান। কুমুদিনী একবার স্বামীর মৃত্যুকামনা করেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মৃত্যুও চেয়েছে। সধবা অবস্থায় বিধবার মত তাকে থাকতে হয়

ব'লে সধবার একাদশী এই গ্রন্থের নাম সার্থক।

মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সৌদামিনী তার দাদা অটলের চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য ইংরেজীশিক্ষার দোষ দেয় কিন্তু কুমুদিনীর মতে গোকুলকাকা, চন্দ্রবাবু প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিত হ'য়েও মদ্যপান করেন না। আসলে তখন সমাজ ব্যবস্থা এমনই ছিল যে বেশ্যা না রাখলে, মদ না খেলে খাতির পাওয়া যেত না। অনেক সময় এক বেশ্যা নিয়ে দুবাবুর মধ্যে মনোমালিন্য এবং এমন কি মামলা মোকর্দমা পর্যন্ত বাধবার উপক্রম হ'ত। এই নাটকে কাঞ্চনকে নিয়ে অটল ও নকুলেশ্বরের মধ্যে তা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। সুরাপান নিবারণী সভা এই দেশ হ'তে সুরাপান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। অনেকে সভ্য হ'য়েও পানাভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না। মদ্যপান ও বেশ্যা-গমন হ'তে রক্ষা করতে অনেক পিতাকে বাধ্য হ'য়ে পুত্রকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেওয়ার কথা বলতে হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে গৌরমোহন আড্ডির স্কুল, হেয়ার সাহেবের স্কুলে বাবুজ কেলাশ প্রভৃতির কথা এসেছে। কেনারাম ডেপুটির বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে বিচারকদের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণকারী অনেকে উক্ত ধর্মের মর্ম বুঝত না ব'লে নিমচাঁদের কেনারামের প্রতি ধারণা। মদ্যপান নিবারিণী সভার বিরুদ্ধে পরিণয় নিবারিণী সভা এবং লম্পটতারিণী আড্ডার পরিকল্পনা দেয় নিমচাঁদ। কলকাতায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভাসমিতি স্থাপনের এটি ইঙ্গিত। মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত পুরুষের স্ত্রীর চরিত্র যে ঠিক থাকত না তা আমরা হিজড়ার উক্তিতে নসীরামবাবু ও তার স্ত্রীর সম্বন্ধে জানতে পারি। নিম চাঁদের মতে সভ্যতার সঙ্গে বিদ্যাভ্যাসের উদ্বাহ হইলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। সে অটলের স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে বলেছে, 'তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ?' 'পুলিশ সধবার একাদশী প্রচার নিষেধ করায়......এবং তাহার বিরুদ্ধে দেশের বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের অভিযোগ, ও তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সে আদেশের প্রত্যাহার হইতে ইহা বুঝা যায়, যে সধবার একাদশী গ্রন্থের যথার্থ গুণাগুণ অনেকে বুঝিলেও, বুঝেন না এমনও অনেকে আছেন।' ৮

---

৮। নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ—৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য। বিজ্ঞাপন

নায়ক অটল প্রথমে মদ খেতে চায় না ; পরে সে মদ ধরে। বেশ্যা রাখার ইচ্ছা তার প্রথম হ'তেই ছিল। এই উদ্দেশ্যে সে জীবনচন্দ্রের নিকট হ'তে টাকাও নিত। কাঞ্চন বেশ্যার নিকট প্রত্যাখ্যাত হ'লে সে খুড়শাশুড়ীর প্রতি লোলুপ হ'য়ে আরও নীচতা প্রকাশ করেছে। অটল চরিত্রের কোন পরিণতি নাই বলা ঠিক নয়। সে প্রথমে সেকালের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকরূপে দেখা দিয়ে শেষে একটি নরপশুতে পরিণত হয়েছে। তার চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে সার্থক এক ট্রাজেডির নায়ক তাকে করা চলত কিন্তু গ্রন্থকার ত'র ইঙ্গিত দিয়ে গ্রন্থ শেষ করায় একে নাটক না ব'লে প্রহসন বলা চলে।

নিমচাঁদ এর প্রতিনায়ক। সে ইংরেজী শিক্ষিত যুবক। পারিবারিক জীবনে স্ত্রী নিয়ে সে সুখী নয় ব'লে মদ্যপান ও বেশ্যার প্রতি তার আসক্তি। ইংরেজী শিক্ষার কুফল রূপে সে শিখেছে—Man being rational must get drunk. The best of life is but intoxication. কিন্তু নাটকের উদ্দেশ্য শেক্ষপীয়র ও এলবু বারেটের উক্তি হ'তে প্রকাশিত হওয়ায় নিমচাঁদের উক্তির মধ্যে বৈপরীত্য দেখিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। তার আত্মসচেতনতা প্রশংসনীয়। নব্যবঙ্গের ধ্বংসের এবং সাধ্বিপুঞ্জের চিত্তদুঃখের কারণ যে কাঞ্চনরূপিণী রূপ বিলাসিনীর দল তা তার অজানা নয়। সে বেশ্যাসক্ত হ'লেও গৃহস্থের বধূর প্রতি তার কোন লোভ নাই। কুমুদিনীর ব্যাপারে সে বিনা কারণে দোষী হয়েছে —মার খেয়েছে। রামধন যখন তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়েছে তখন সে 'ঘুলিশের মত কথা' বলার জন্য 'কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ' ব'লে সামাজিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। সুরাপান নিবারিণী সভার বিরুদ্ধে সে পরিণয় নিবারিণী সভা খুলতে চায়; সে ব্রাহ্মধর্মের মূলসূত্র সম্বন্ধে কেনারাম ডেপুটীকে জ্ঞান দেয়। এ রকম এক চরিত্রকে প্রহসনের চরিত্র করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজে অটল ও নিমচাঁদের মত চরিত্রের অভাব ছিল না। 'ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের যুবকগণ যাঁহারা কলিকাতায় বর্ত্তমান অবস্থা ও কোন ধনাঢ্য পরিবারের ইতিহাস জ্ঞাত আছেন তাঁহারা ইহার পাঠে যৎপরোনাস্তি প্রহসিত

হইবেন।' ১

জীবনচন্দ্রের চরিত্রে কোন দৃঢ়তা নাই। যুগের নিকটে, স্ত্রীর নিকটে সে অসহায়; কিন্তু তার অসহায়তার শোচনীয় পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম না।

বেশ্যা কাঞ্চন গৃহিণীর তিরস্কারের শোধ তুলতে অটলের জ্ঞান হ'লে বলে, 'নাও বাছা, তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তুমি যে কথা বলেছ আমার গা কাঁপ্‌চে। আমি চল্যেম বাছা, এমন খুনের কাছে ভদ্রলোকে থাকে?' এ কি বেশ্যার কথা? সে অপমানের জ্বালায় চ'লে গেল না অন্য কোথাও বেশী টাকার লোভে চ'লে গেল?

স্বামিবঞ্চিতা কুলবধূ কুমুদিনীকে মনের দুঃখে দিন কাটাতে হয়। তার রূপযৌবনকে প্রত্যাখান ক'রে তার স্বামী কাঞ্চনের প্রতি আসক্ত। সমস্তই তাকে সহ্য করতে হয়। তবে সে ঠাকুরঝি সৌদামিনীর কাছে মন হাল্কা করতে সব কিছু বলে। সৌদামিনী তার ব্যথারব্যথী। তবে সে গৃহিণীর জন্য কিছু বলতে পারে না। উৎসবের দিনে কুমুদিনী কোমরে চেন সহ ঘড়ি ঝুলিয়ে হেসে হেসে সকলকে অভ্যর্থনা করে ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে সে সুখী। চোখের জল মুছে আত্মীয়স্বজনের নিকট হাসিমুখ যে কত কুমুদিনীকে দেখাতে হয় তার ইয়ত্তা নাই। ভোলা, রামমাণিক্য, দামা, কেনারাম, বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করেছে কিন্তু রামধন রায়কে কেবল নিমচাঁদকে মার দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে ব'লে মনে হয়।

নিমচাঁদের মুখে ইংরেজী উদ্ধৃতি হ'তে আরম্ভ ক'রে কালিদাসের হেঁয়ালী পর্যন্ত ব্যবহৃত হওয়ায় সংলাপের বৈচিত্র্য ঘটেছে। ভোলার ইংরেজী হাস্যকর। রামমাণিক্যের ইংরেজী বড় গোলমাল ঠেকে। কারণ 'মর্দ্দাগোর পের্‌লাউনে হি, হিজ্, হিম্ অইচে; মাইয়াগোর নামে শি, হার্, হার্ কইচে; যদি মর্দ্দাগোর "হি, হিজ্, হিম্" অইল, তবে মাইয়াগোর "শি. শিজ্ শিম্" অইবে না ক্যান্?'

গ্রন্থটির তিনটি অঙ্কের প্রথম অঙ্কে দুটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। কলকাতার কাঁকুড় গাছা, চিতপুর

---

১। রহস্য সন্দর্ভ—১৯২১-২২ সংবৎ। পৃ-১৭৪

রোড এবং কাঁশারি পাড়া এই তিন স্থানে নাটকের সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। এতে স্থানঐক্য, কালঐক্য ও গতিঐক্য অক্ষুণ্ণ। ১/১ নকুলেশ্বরের অনুরোধে কাঞ্চন মুলতান রাগে এবং আড়াঠেকা তালে বিরহের গান গেয়ে অটল, নিমচাঁদ, নকুলেশ্বর প্রভৃতির মনে বিরহ জাগাতে চায়। এই হিসাবে গানটি স্মরণীয়।

'১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তমী পূজার রাত্রিতে বাগ বাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী' সর্ব্বপ্রথম বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। এই সখের দলের ইহাই প্রথম অভিনয়। এই দলে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা ছিলেন। এই থিয়েটারই পরবর্ত্তীকালে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ এবং আরও পরে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। .........'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গ-পত্রে গিরিশচন্দ্র বিশেষ ভাবে 'সধবার একাদশী'রই উল্লেখ করিয়াছেন।'

১০। বুঝলে কি না প্রহসন। *

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' এর অনুসরণে বুঝলে কিনা প্রহসনে ( ১২৭৩ সালে প্রকাশিত ) তথাকথিত ধনাঢ্য প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির চারিত্রিক বিবিধ দোষ উদ্ঘাটিত। এর কাহিনী এই—দলপতি অটলকৃষ্ণ বসু হাবলেব মায়ের কিছু টাকা জমা রেখে আর ফেরত দেন না। তিনি দর্পনারায়ণের স্ত্রী কুমুদিনীর প্রতি আসক্ত হ'য়ে পুরোহিত বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যে তাকে অর্থ দ্বারা বশে আনতে চান। কুমুদিনী অটলবসুর কুমতলব তার স্বামীকে জানালে সে লাঠি নিয়ে মারতে এসে মেথরানীর প্রতি তাঁর কুমনোভাব জানতে পারে। সে টাকায় মেথরানীকে বশীভূত ক'রে বিদ্যালঙ্কারকে নাস্তানাবুদ করে এবং অটলবাবুকে জানোয়ার সাজিয়ে প্রহার ক'রে মেথরানীকে রাধা সাজিয়ে বামে দাঁড় করিয়ে বাবুর মাথায় বিঁড়ে এবং হাতে বোতল দিয়ে অপমান করে।

অন্যের অর্থ আত্মসাৎ, নারীলোলুপতা, মদ্যপান, দলাদলি, অখাদ্য

* গ্রন্থটিতে লেখকের নাম না থাকায় এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

ভক্ষণ প্রভৃতি ধনী, লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তির যে চারিত্রিক দোষ হ'তে পারে তা এই প্রহসনে অটলকৃষ্ণ বসু নামে দলপতির মাধ্যমে জানতে পারি। তাঁর গর্হিত কার্যে বিদ্যালঙ্কার ও কম নন। যেমন যজমান তেমন পুরোহিত। এই প্রহসনে মেথরানীর প্রতি আসক্তি ও পরিণতি 'কিছু কিছু বুঝি'তে কলু বৌয়ের প্রতি আসক্তি এবং তার পরিণতি বর্ণিত হ'লেও মাইকেল মধুসূদন বিধর্মী মুসলমানের প্রতি আসক্তি এবং তার পরিণতি বর্ণনায় সকলের উপর টেক্কা দিয়েছেন।

প্রহসনটিতে 'বুঝলে কিনা' কথাটি বহুবার অটলবাবু ও দর্প-নারায়ণের সংলাপে লক্ষ্য করা যায়। এই হিসাবে অটলবাবুর মত ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্য 'বুঝলে কিনা' দ্বারা বুঝা যায় ব'লে প্রহসনটির নাম সার্থক। গ্রন্থটি দু অঙ্কে সমাপ্ত—প্রথমাঙ্কে মেথরানীর প্রতি আসক্তি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়াঙ্কে তার পরিণাম পর্যন্ত চিত্রিত। এতে কোন গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য নাই; তবে প্রথমাঙ্কের ঘটনাস্থল অটলকৃষ্ণ বসুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ এবং দ্বিতীয়াঙ্কের ঘটনাস্থল তাঁর অশ্বশালা।

অটলকৃষ্ণের রাগিণী ভৈরবী এবং তাল মধ্যমানে

মনেরো যে আশা ছিল —এই গানে তাঁর লাম্পট্যের আশা প্রকাশিত।

প্রধান চরিত্র অটল সম্বন্ধে হাবলের মায়ের কথায় আমরা জানতে পারি যে সে তাঁর নিকটে 'বারো পোণ আর দশ গণ্ডা খানি' টাকা গচ্ছিত রেখেছিল। সমাজে সৎ, ধার্মিক ব'লে বাবুর সম্মান ছিল কিন্তু 'এখন দেবার সময় বলে কিসের টাকা, কতো টাকা, কবে দিয়েচ, আমার মনে নেই, খাতা দেখ্‌বো,......' ইত্যাদি। গৃহের কুলবধূও তাঁর নজর হ'তে বাদ যায় না। বিদ্যালঙ্কার ভালবাসার কথা ব'লে কুমুদিনীর নিকট ব্যর্থ হ'লে তিনি বলেন, 'তুমিও যেমন খুড়ো টাকাতে কি না হয়?' নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তিনি বিদ্যালঙ্কারকে রটনা করতে বলেন, 'দর্পনারায়ণের স্ত্রী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাড়কাটার গলির গুঁপো বিমলির বাড়িতে ক'দিন ছিলো, ......তারপর তাকে দর্পনারায়ণ আবার বাড়িতে ফিরিয়ে এনেচে।' মূর্তিমান শয়তান ছাড়া তাঁকে আর কিছু বলা যায় না। নারীলালসায় অর্থব্যয় করতে তিনি প্রস্তুত; খাওয়

দাওয়াও তাঁর ভাল। তবে কাকেও সহজে টাকা দেওয়ার অভ্যাস তাঁর নাই। কোচম্যানও বলে, "কেয়া ঝকমারি! শালাকো নোকরি ছোড় দেগা।' পরস্ত্রীলোলুপতার জন্য তিনি স্ত্রীশিক্ষাবিদ্বেষী। লেখাপড়া শিখলে তারা চরিত্র রক্ষা করতে পারবে—এ তাঁর অসহ্য। তাঁর মতে 'স্ত্রীলোকের ইস্কুলে যাওয়াও যা আর মেছোবাজারের বারিকে যাওয়াও তা।' ইন্দ্রনারায়ণের মেয়ে স্কুলে পড়েছিল ব'লে তিনি তাকে সমাজচ্যুত ক'রে পরে তার কাছে টাকা নিয়ে জাতে তুলেছেন। নীলাম্বরকে জাতিচ্যুত ক'রে তার বসতবাটী সাফ কোবালা নিয়ে টাকা ধার দিয়ে জাতে স্থান দেন। সুতরাং এ রকম লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি সকলেরই কাম্য। এই হিসাবে প্রহসনটির উদ্দেশ্য সার্থক। তবে শেষাংশে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সুখী, বিদ্যালঙ্কার এবং অটলবাবুর লাঞ্ছনা-'এই ব্যাপারটী সম্ভবপরও নহে, সরসও নহে। অপর দীর্ঘকালব্যাপি বলিয়া অভিনয়ে সুসিদ্ধ ও অনুরাগ সাধক হইবে এ মতও বোধ হয় না। এই প্রসঙ্গের পাঠে প্রথম হাস্য হইয়া তৎপরেই গ্লানি বোধ হয়। ইহাতে দর্পনারায়ণ স্বয়ং বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি নানা ব্যক্তির শব্দ একবারে এবং অটলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির বাক্য কহে; এই সকল ব্যাপারের অভিনয় করে এমত লোক কলিকাতায় নাই।' [১০]

গ্রন্থটির ২য় মুদ্রণে 'তোমার গায়ের ঐ শালখানি সুখীকে দেও, বুঝলে কিনা।' 'আর দুটি কর্ম্ম কত্যে হবে। হাবলের মার যে হাজার টাকা তুমি ধার, সে টাকাগুলি সুদ শুদ্ধ কাল ফেলে দিতে হবে, বুঝলে কিনা। আর নীলাম্বরের বাড়িখানি ফিরে দিতে হবে, বুঝলে কিনা।' 'একবার বাঁকা হয়ে দাঁড়াও, বুঝলে কিনা। ......আ মরি মরি! কি রূপ! কি মাধুরী! বলিহারি! বলিহারি! ইনিই আমাদের দল-পতি বুঝলে কিনা।' ১২৭৩ সালের মুদ্রণে 'এই যে, বাঁশি রাধে—রাধে, বলচে। আহা! যুগল বেশের কি বে শোভাই হয়েছে। আ মরি, মরি। (করতালি দিয়া) "শ্যামের বামে কিবা শোভা, রাধে কিশোরী।" আহা কি রূপ! কি মাধুরী! বলিহারি—বলিহারি! এই সময় একতাল গোবর পাই, তো মুখের ছাঁচটা তুলে নি, বুঝলে কিনা। (কর

১০। রহস্য সন্দর্ভ—১৯২৩ সংবৎ। পৃ-১৬

যোড় করিয়া ) আ! আমার আজ জীবন সার্থক হলো। কৃতার্থোঽহং! কৃতার্থোঽহং। নয়ন একবার দর্শন করে চরিতার্থ হও ( কিঞ্চিত অগ্রসর হইয়া দর্শকবর্গের প্রতি ) ইনিই আমাদের দলপতি—"বুঝলে কিনা।" শেষের সংলাপে ব্যঙ্গ জোর। 'বুঝলে কিনা' এই বালিশ' কম ব'লে ভাল হয়েছে।

১১। কিছু কিছু বুঝি—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

পানদোষ, অপব্যয়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, 'ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া,' বিষয়ে পঞ্চম অঙ্কে সমাপ্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসন ১২৭৪ সালের ১৫ই কার্ত্তিক প্রকাশিত হয়। "কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের" অধ্যক্ষবৃন্দের অনুরোধক্রমে তাঁদের অতিনয়ের জন্য দেশাচার সংশোধন বিষয়ে এই প্রহসন রচিত। লেখক মুখবন্ধে লিখেছেন 'বিশেষতঃ নাইকেল মধুসূদন দত্তের, দিনবন্ধু মিত্রের, ও "বুঝলে কিনা" গ্রন্থকর্ত্তার প্রহসন খানির রচনা যে কি চমৎকার হইয়াছে তাহা বলাপেক্ষা আমি এই "কিছু কিছু বুঝিতে" যে স্থলে স্থলে তাহাদিগের নিকটে ঋণী হইয়াছি, ইহাই স্বীকার করা ভাল?

বাগেশ্রী রাগিণীতে এবং তাল আড়াঠেকায় প্রহসনের বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে। নট উপস্থিত হয়। দেশাচার সংশোধন বিষয়ে অভিনয় করতে নটী অস্বীকৃত। নটী এসে রাগিণী সুরট মোল্লার ও তাল আদ্ধায় তার অস্বীকৃতির কারণ জানায়। সে ইতরামির ভয়ে 'কিছু কিছু বুঝি' অভিনয় করতে চায় না। নট দেশাচার সংশোধনের পক্ষে যুক্তি দেখায়, 'দেখ তুই বিবাহ কোল্লে বিস্তর অনিষ্ট হয়, নবনাটকখানী তাহা নিবারণের জন্য প্রস্তুত হয়েচে আর প্রতারণা সুরা সেবন ইন্দ্রিয় দোষ যদেচ্ছাহার ও যদেচ্ছাচারে এ দেশ যেন ছারখার হোচ্চে, "বুঝলে কিনা" প্রহসন খানি সে পক্ষে যেন মুগুর হয়ে বসেচে।' ......'আমরা যদি ও সব না বুঝে থাকি কিন্তু কিছু ২ যাহা বুঝি তাহাই পোষকতা করাই কর্ত্তব্য। ......আর কিছু ২ বুঝি ঐ "বুঝলে কিনারই" আদর্শমত, "সুরাসেবন ইন্দ্রিয় দোষ যদেচ্ছাহার......বিষয়েই লিখিত হয়েচে।' এই অংশে প্রহসনটির উদ্দেশ্য বলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী লেখকদের প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্তমান লেখকের গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক। দেশাচারমূলক বিষয় সংস্কৃত রীতিতে নটনটী প্রভৃতির উপস্থিতি দোষদুষ্ট হ'লেও এ দোষ অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়।

প্রহসনটির আখ্যানাংশ এ রকম—অল্পবয়স্ক বিনোদকুমার অভিনয়ী খদ্যোতেশ্বর বাবুর প্ররোচনায় ও উৎসাহে লেখাপড়া না ক'রে মদ্যপান ও নাটক অভিনয়ে এমন কি বেশ্যাগমনেও আসক্ত হ'য়ে পড়েন। তাঁর মা রাধামনি ও প্রতিবাসিনী বরদা এর জন্য দুঃখিত। তাঁরা তাকে সুপথে আনার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ। খদ্যোতেশ্বর বাবু নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে মদ্যপান, পরদারগমন প্রভৃতির নেতা। তাঁর ভণ্ডামি ধরা পড়ে। বৈষ্ণবীর সাহায্যে রাত্রে মেদো কলুর বৌয়ের সহিত মিলিত হ'তে গেলে তিনি চরম অপমানিত হন। মেদোর বৌয়ের পরিবর্তে কামিনী বেশ্যার হাতে প'ড়ে তিনি বানর সেজে এবং মাথায় বিঁড়ে দিয়ে নাচতে বাধ্য হন। মেদো তার বৌয়ের বোন সেজে এক ঘরে থাকে। সেখানে বৈষ্ণবী রাত্রে উপস্থিত হ'লে সে তার মালা ছিঁড়ে দেয়, ঘা কতক দিয়ে তাকে বেঁধে রাখে। বানর নাচাতে গিয়ে মেদো বানরবেশী খদ্যোতেশ্বর বাবুকে চাবুক মারে। খদ্যোতেশ্বর বাবু তখন মদ্যপান এবং পরস্ত্রীগমনের কুফল বুঝতে পারেন। রামতারকবাবু বৈষ্ণবীকে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চুনকালি দিয়ে বিদায় দিতে পরামর্শ দেন এবং খদ্যোতেশ্বর বাবু মাধবের নিকটে ক্ষমা চাইলে রামতারকবাবু তাঁকে সদুপদেশ দিয়ে বিদায় করেন।

প্রহসনটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে—দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক নাই। প্রথম অঙ্কে রাধামনির বাটীতে রাধামনি ও বরদা বিনোদকুমারের চরিত্রদোষে চিন্তিত ও দুঃখিত, দ্বিতীয় অঙ্কে খদ্যোতেশ্বর বাবুর বৈঠকখানায় বিনোদ-কুমারের জন্য সকলের প্রতীক্ষা,—তাঁর মদ্যপান এবং বিদূষক ও বিনোদের তা দেখা এবং বাবুর সজ্ঞান অছিলা প্রয়োগ, তৃতীয় অঙ্কে বিনোদ-কুমারের অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অজ্ঞান হওয়া, চতুর্থ অঙ্কে খদ্যোতেশ্বর বাবুর বাটীতে বৈষ্ণবীর উপস্থিতি এবং মেদো কলুর বাড়ী রাত্রে যাওয়ার মতলব এবং পঞ্চমাঙ্কে তাদের মেদো কলুর বাড়ীতে যাত্রা এবং সেখানে তাদের শাস্তি। সুতরাং ঘটনাবিন্যাস, অঙ্ক স্থাপন, স্থান, কাল, ও গৃতি-

ঐক্য যথাযথ।

খণ্ডতেশ্বর বাবু এই প্রহসনের প্রধান পুরুষ চরিত্র। তিনি নাটক অভিনয়ের জন্য অল্পবয়স্ক যুবকের পরকাল খেয়েছেন। তাঁর জন্যই বিনোদকুমার মদ্যপায়ী এবং লম্পট। অথচ সেই দোষ তিনি নিজের উপব না রেখে বিনোদকুমারের উপর আরোপ করেন। অভিনয়ে এবং স্ত্রীলোকের জন্য অর্থব্যয়ে তাঁর কার্পণ্য নাই। সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে সকলের সম্মুখে তিনি মদ্যপান করেন না।। বৈষ্ণবীর সহায়তায় তিনি অনেক নারীর ধর্ম নষ্ট করতে চান। মাইকেলের ভক্তপ্রসাদেরও এ বিষয়ে তাঁর কাছে হার। যেমন ভণ্ডতপস্বী (একদিকে ত্রিকণ্ঠি, তার উপরে মালা, নামাবলী গায়ে জড়ান এবং সর্বাঙ্গে ছাপছোপ দেওয়া অন্য-দিকে মদ্যপায়ী, নারীলোলুপ) বাবু তেমন গলায় হরিনামের মালা দেওয়া, মদমুরগী খাওয়া বৈষ্ণবী।

এই বৈষ্ণবীই প্রধানা নারী চরিত্র। সে জাত হারিয়ে বৈষ্ণবী হয়েছে, তার চরিত্রদোষে মুরাদ আলীর ভগ্নী হ'য়ে কুলত্যাগ ক'রে হিন্দু হ'য়ে মদমাংসে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এখন ঐ সব ছেড়ে বৈষ্ণবী হ'য়ে ভদ্রলোকের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিন চালায়। কিন্তু খণ্ডতেশ্বর বাবুর সংলাপে আমরা বুঝতে পারি তাঁর কুটনীগিরি ক'রে অর্থলাভ এবং মদ্যমাংসাহার তার উদ্দেশ্য। পরে অবশ্য সে 'একবার হরিকে ডাকলেই ......ফতে কোরে দেওয়া যাবে'—ব'লে আত্মশুদ্ধির উপায় খুঁজে পায়। একবার বৈষ্ণবী ভাবে বিদূষক তার প্রতি আসক্ত আবার সে বাবুর কথাবার্তায় তাঁর আসক্তির ভাব বুঝে বিদূষককে প্রত্যাখ্যান ক'রে বাবুকেই অবলম্বন করতে চায়। আমরাও বৈষ্ণবীকে হরিনামের মালা গলায় দিয়ে মদ মুরগী খেতে দেখে বিস্মিত না হ'য়ে পারি না।

মেদো কলুর বাড়ীতে বৈষ্ণবী ও খণ্ডতেশ্বর বাবুর উপস্থিতিতে প্রহসনটি বেশ জমে উঠে। একদিকে বাবু কামিনীর কথায় বানর সেজে মাথায় বিঁড়ে দিয়ে নাচছেন। অন্যদিকে মেদো কলু দড়ি টেনে মাটিতে লাঠি ঠুকে 'ঝিঙ্গের ফুল কাঁকুড় কাঁকুড়। ভাব কোরে নাচ্ বুড়ো......" এই কথা ব'লে তাঁর পিছনে লাঠি মারে। খণ্ডতেশ্বর বাবু তখন সন্দেহ করেন, 'আমাকে নাকাল করবার তরে তো এ কাজ কচ্চে না?' তিনি

বুঝতে পারেন, 'মদটা কি খারাপ জিনিস, ইন্দ্রিয় দোষটা কি ভয়ঙ্কর। মদ আর ইন্দ্রিয় দোষের জন্য আমাব কি কম অপমান হোচ্চে?' শেষ পর্যন্ত তিনি মেদো কলুকে বলতে বাধ্য হন, 'মাধব! আমাকে মাপ কর, আমার ঘাট হয়েচে, আমি এমন কাজ আর কখন কোর্বো না।' তাঁর মত 'গুণবান, ধনবান, মান্যমান,' লোকের এই দুর্দশায় আমরা ব্যথিত।

পূর্ব হ'তে মেদো কলু তার স্ত্রীর ভগিনী সেজে অন্য ঘরে ছিল। বৈষ্ণবী সেই ঘরে উপস্থিত হ'লে তাকে ঘা কতক দিয়ে, তার মালা ছিঁড়ে দিয়ে, বেঁধে রেখে খড্যতেশ্বর বাবুকে সে জব্দ করতে এসেছিল। এখন রামতারক বাবু এসে বৈষ্ণবীকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, 'মুখে আগুন তোমার, সেদিন তত জুতো খেয়ে এলি, তবু লজ্জা হোলো না। (মেদোর প্রতি) মাধব! বেটীর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, গালে চূণকালী দিয়ে বিদায় কোরে দাও গে।' খড্যতেশ্বর বাবু এবং বৈষ্ণবীর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।

বিনোদকুমার এই প্রহসনের নায়ক কিন্তু গ্রন্থকর্তা খড্যতেশ্বর বাবুকে প্রধান করেছেন। আর রাধামনি ও প্রতিবাসিনী বরদা এতই গৌণ হয়ে পড়েছে যে এই প্রসঙ্গ না আনলেও চলত। তৃতীয় অঙ্কে শিশুপাল বাবুর অনুস্বার যোগে সংলাপে বৈচিত্র্য থাকলেও তাকে অনাবশ্যক বলা যায়। পঞ্চম অঙ্কে রাত দশটার পর নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য রামতারক বাবুর মেদো কলুর বাড়ীতে উপস্থিতি আকস্মিক। তাঁর দীর্ঘ সংলাপ নীতি শিক্ষায় উপযোগী হ'লেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়।

প্রথম অঙ্ক হ'তে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত বরদা, শিতল পাঁড়ে, বিদূষক, গুরুজী, বৈষ্ণবী, রামতারকবাবু প্রভৃতি প্রায় সকলেরই মুখে 'কিছু কিছু বুঝি' এই কথা এত বেশীবার শুনতে হয়েছে যে তা প্রহসনের নাম মনে রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় হ'লেও দোষদুষ্ট। তবে নটী যে ইতরামির ভয়ে এটি অভিনয় করতে অনিচ্ছা করেছিল সে রকম ইতরামি এতে নাই।

১২। বারুণী বিলাস নাটক—শ্রীনবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'কলিকাতাস্থ সুরাপান-নিবারণী সভার বিজ্ঞাপনানুসারে পাটনা সুরাপান-নিবারণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী চরণ চট্টো-

পাধ্যায় মহাশয়ের আদেশে পাটনা কলেজের পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত' 'বারুণীবিলাস নাটক' 'সন ১২৭৪' সালে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী এই—বিজয় মিত্র তার ভগ্নী সৌদামিনীর এমন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চায় যে জীবনে মদ্যপান করে না। তার ভগ্নীপতি বিনয় বহু চেষ্টায় বসন্তপুরে প্রাণকৃষ্ণ দত্তের পুত্র নীরদকৃষ্ণ দত্তকে উপযুক্ত পাত্র স্থির করে। কিন্তু এক হাজার টাকা বরপণ দিতে বিজয় অসুবিধায় পড়ে। শেষ পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অনঙ্গমোহন ঘোষ বিবাহের অর্ধেক খরচ দিবেন বললে বিজয় এই বিষয়ে অগ্রসর হয়। সমাজ-হিতৈষী অনঙ্গবাবু তাঁর ইয়ার ললিত ও মোহিতের প্ররোচনায় মদ্যপানে আসক্ত হন। বিজয় অনঙ্গবাবুকে এই ললিত ও মোহিতকে ত্যাগ করার কথা বলায় তারা প্রতিশোধ নিতে সৌদামিনীর প্রতি অনঙ্গ বাবুকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। মদ্যপানের সময় তারা সৌদামিনীর রূপ বর্ণনা করলে তিনি কামোন্মত্ত হ'য়ে তাকে আনতে বলেন। এদিকে সৌদামিনীর বিবাহ—বর ও বরযাত্রগণ এসেছে। ললিত ও মোহিত সুমতি ও করুণার বেশে সৌদামিনীকে দৈবজ্ঞের নিকটে নিয়ে যাওয়ার ছলনা ক'রে অনঙ্গবাবুর বাগানে নিয়ে যায়। অনঙ্গবাবুর হীন প্রস্তাবে সে সম্মত না হ'লে তিনি তাকে ছোরা দেখান। সেই ছোরা নিয়ে সৌদামিনী আত্মহত্যা করে। সৌদামিনীর আসার সময় নীরদের বন্ধু বিনোদ দেখে ফেলে এবং সে নীরদকে নিয়ে অনঙ্গের কাছে আসে। সেখানে মত্ত অবস্থায় অনঙ্গবাবু নীরদকে ছোরা মারে। মন্মথ, বিজয়, বিনোদ, মধুসূদন, বিনয় প্রভৃতি উপস্থিত হ'লে বিজয় অনঙ্গবাবুকে তিরস্কার করে এবং অনঙ্গবাবু অনুতপ্ত হন।

কলকাতা ও পাটনায় সুরাপান নিবারণী সভার কথা আমরা জানি। নটী ও সূত্রধারের সংলাপে সুরাপান ও তার কুফল দূরীকরণে চেষ্টিত হওয়া উচিত; তা না হ'লে কত দুর্ঘটনা ঘটবে তার ইয়ত্তা নাই—এই ভাব প্রকাশিত। 'আজকাল সুরাপান সভ্যতার প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছে। কি আশ্চর্য্য! "সুরায় বিদ্বেষ আছে কিনা" এ কথা জিজ্ঞাসিলে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে বেটা কি অসভ্য।' একথা বিনয় ব'লে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

মদ্যপায়ী ডাক্তারেরা মদ্যপান ক'রে ভুল ঔষধ দিয়ে অনেক সময় লোক মেরে ফেলে। কয়েকজন মদ্যপ কমলাকান্তের বিধবা কন্যার উপর অত্যাচারে ব্যর্থ হ'য়ে তার বাড়ীর সম্মুখে বৈঠকখানা তৈরী ক'রে তাতে অশ্লীল ব্যবহার করে। জমাদার ঘুষ খেয়ে কিছু করেন না।

করুণার জ্যাঠামশায়ের দৃষ্টান্তে মদ্যপায়ী ব্যক্তিদের হিতাহিত জ্ঞানের অভাব জানতে পারা যায়। সুতরাং দুঃখে, ক্ষোভে এবং লজ্জায় করুণা ও রেবতী আত্মহত্যা করতে চায়। মজুমদার পরিবারের ঘটনা দেখিয়ে নাট্যকার মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করতে চেষ্টা করেছেন। সমাজসংস্কারক, স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক অনঙ্গবাবুর সঙ্গে আমরাও অনুতপ্ত।

বড় বড় ডাক্তার মদ্যপানের বিরোধী কিন্তু সামান্য ডাক্তারগণ অর্থ লাভের জন্য মদ্যপানের পক্ষপাতী। অনেকে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ক'রেও ভিতরে ভিতরে মদ্যপান করে। করুণা বলেছে, 'নব্যবাবুরা ইংরেজদের চাল চুল শিখ্‌তে গিয়ে আগেই তাদের মন্দ চালগুলি শিখে বসেন্, তারপরে তাঁদের ভাল চালগুলি শিখ্‌তে আর সময় হয় না, এ দিকে হয়ে আসে।'

সুরাপানের কুফল দেখানো এই নাটকটির উদ্দেশ্য। ১/৩ এ সুমতি বলে, 'ভাই এ সব বারুণীর বিলাস; এখন এ সব প্রায় ঘরে ঘরেই ঘট্‌ছে।' ৪/১ এ করুণা মজুমদার পরিবারের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে বলে, 'এই যে ভাই এক ঘর লোক; একবারে বয়ে গেল, এতেও কি ভাই বারুণী বিলাসের পর্য্যবসান হবে না!' এই সব উক্তিতে "বারুণী বিলাস" নামকরণের ইঙ্গিত আছে। বারুণী প্রথম প্রথম বিলাস হ'লেও শেষ পর্যন্ত যে বিনাশের কারণ হয় তা আমরা এই নাটকে বিশেষভাবে জানতে পারি। এই হিসাবে এর নামকরণ সার্থক।

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয়াঙ্কে তিনটি, তৃতীয়াঙ্কে তিনটি ( যদিও ৩য় গর্ভাঙ্কের উল্লেখ নাই ), চতুর্থাঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক আছে। প্রাপ্ত গ্রন্থটি খণ্ডিত হওয়ায় অনুমান যে পঞ্চমাঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্কই ছিল। কাহিনীর উপস্থাপনা, ঘটনার অগ্রগতি, চরম অবস্থা এবং পরিণতিতে ত্রুটি নাই। ঘটনাস্থল কুসুমপুর ও পুষ্পপুর।

তবে ১/১ এ ঘটনাস্থল কুসুমপুর কেন হ'ল বুঝা গেল না। বিনয় বসু কেন গোকুল সিংহের বাড়ী খুঁজছিল তাও স্পষ্ট নয়। যদি বলরামের মদ্যপানাভ্যাস ত্যাগ করানোই তার সিংহদের বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্য হয় বা মধুসূদন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করা উদ্দেশ্য হয় তবে সে বিজয়বসুর বাড়ী ( নিজের শ্বশুর বাড়ী ) পুষ্পপুর গেল না কেন? দ্বিতীয়তঃ ১/৩ এ আমরা দেখি মধুসূদন সিংহদের বাড়ী পুষ্পপুরে। সিংহ পরিবারের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ীর বেশ হৃদ্যতা ছিল। সুতরাং স্থানের বিষয়ে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

অনঙ্গ বাবু এই নাটকের নায়ক। তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ব'লে মনে হয় না। মদ্যপানে তাঁর চরিত্রের দুর্বলতার বীজ হ'তে চরিত্রের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি নাট্যকারের কৃতিত্ব। বিজয় মিত্র, বিনয় বসু, মধুসূদন সিংহ একই ভাবে ভাবিত হওয়ায় চারিত্রিক বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় নাই। মন্মথ চরিত্রের মদ্যপানের বিষয় তারই মুখ দিয়ে আলোচনা ক'রে নাট্যকার তাকে ভাবের ফানুষে পরিণত করেন নাই। বসন্ত ও শিশিরের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নায়িকা সৌদামিনীর চরিত্রে নাট্যকার দক্ষতা দেখাতে পারেন নাই। তাকে ভাবের ফানুসে পরিণত ক'রে তার মৃত্যু ঘটিয়ে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করা হয়েছে। রেবতী, হেমলতা, হেমাঙ্গী, শারদা প্রভৃতি নারী চরিত্র স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল। সৌদামিনীর সঙ্গে সুমতি ও করুণার যে রকম ভাব তাতে ললিত ও মোহিত তাকে প্রতারণা করল কিভাবে বুঝা গেল না। রঙ্গ রসিকতায় সুমতি ও করুণা নিপুণা। মদ্যপায়ীদের দুঃখে দুঃখিতা ব'লে সুমতি করুণাকে বলে, 'এই জন্যেই ত তোমার নাম করুণা হয়েছে।' আর আমরা বলি মদ্যপায়ী ভ্রাতা মন্মথর মতি ভাল করার জন্য সুমতি সত্যই সুমতি। সুমতি এবং করুণার মুখে ছড়ার মত পয়ার মন্দ লাগে না। সুমতির মুখে মাইকেলের অনুকরণ করা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাল লাগে না। এই দোষ বিনয় বসুরও আছে। মদ্যপানের কুফল প্রকাশে আলঙ্কারিক ভাষায় বিজয়মিত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হ'লেও এ ভাষা তার নিজস্ব নয়। ৩/৩ এ শরৎ মজুমদারের বাড়ীতে তার মৃত্যুর সময় তার মা, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধুর পয়ার, ত্রিপদীতে দুঃখ প্রকাশ প্রাচীন যাত্রা

রীতি।

প্রস্তাবনাংশে নটীর সঙ্গীতের পর 'নেপথ্যে' "ঠিক্; সুরার এই গুণটা আছে তাই নিস্তার, নইলে বসুমতী এতদিন মাতালে পরিপূর্ণ হয়ে একেবারে উৎপীড়িতা হয়ে পড়্‌তেন।" —এই রকম উল্লেখ আছে। কিন্তু এই নেপথ্য ভাষণ কার? ৪/৪ এ নেপথ্যে 'বরযাত্রেরা আগত-প্রায়, চল, অনঙ্গকে সঙ্গে লয়ে যাওয়া যাউক, তাহাদিগকে প্রত্যুদ্‌গমন করা আবশ্যক, হববাবুর বাটীতেই তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে' —এই নেপথ্য ভাষণও কাব বুঝা গেল না। হরবাবু নামে কোন চরিত্র এ নাটকে নাই। অনঙ্গ বাবু তখন কোথায়? বিবাহ বাড়ীতে না বাগানে? ৫/৩ এ বিনোদ দুজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সৌদামিনীকে আসতে দেখে নীরদকে নিয়ে যায়। বিবাহ করতে এসে পাত্রী যদি দুজন স্ত্রী-লোকের সঙ্গে যায় তা হ'লে বরের পক্ষে তার খোঁজ করতে যাওয়া কোন রীতি সিদ্ধ? ৩/২ এ মধুসূদন সিংহের 'অহহ! এই বৎসরের মধ্যে বারুণী বজ্রপাতে আমাদের দেশের দুইটি অমৃত-ফলপ্রদ-তরুবর দগ্ধ হয়ে ভস্মসাৎ হলো।' এ কথায় আমাদের মনে হয় যে শরৎ মজুমদারও বুঝি মারা গেছেন কিন্তু ৩/৩ এ তার মৃত্যু হয়। এটি মধুসূদনের ধারণা বলা যায়। শরৎ মজুমদারের মৃত্যুর পর বিজয়া "অগো বাহিরে কে আছ শীঘ্যির এসো" ব'লে ডাকলে 'বেগে চন্দ্র ও কুমুদের প্রবেশ ও শরৎকে নিয়ে প্রস্থান' এ রকম লেখা আছে। কিন্তু চন্দ্র ও কুমুদ মদ্য-পায়ী হ'লেও বেগে প্রবেশ ক'রে মৃত শরতকে নিয়ে প্রস্থান কিভাবে করবে? এতে স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হবে না?

নাটকটির প্রস্তাবনাংশে তাল ঠুংরি রাগিণী বা রায়াঁয় অথবা তাল আড়া রাগ বিহাগে নটীর গানে সুরাপানের কুফল এবং তা নিবা-রণের উদ্যোগ করার ইঙ্গিত যথোপযুক্ত। ৩/৩ এ তাল আড়াঠেকা রাগিণী বিহাগে নেপথ্য সঙ্গীতে গভীর শোকে সকলকে আহ্বান—প্রাচীন যাত্রা রীতি হ'তে অনুসৃত। ৪/২ এ রূপব্যবসায়িনী চারুনেত্রার রাগিণী বিহাগ আড়াঠেকা অথবা তাল ঠুংরিতে প্রথম গানটি শৃঙ্গার রস সৃষ্টির সূচনা এবং তাল ঠুংরি রাগ ঝিঁঝিটিতে দ্বিতীয় গানটি এর পুষ্টি সাধন করেছে।

শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, বীভৎস প্রভৃতি রস পরিবর্যিত হ'লেও নীরদকৃষ্ণ ও সৌদামিনীর মত সরল এবং নিষ্পাপ চরিত্রের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকে মুহ্যমান হই। অনঙ্গবাবুর মদ্যপানই এই ট্র্যাজেডির কারণ। সুরাপান নিবারণী সভায় সৌদামিনী ও নীরদকৃষ্ণের চিত্রপট নিয়ে শোক সভা ক'রে তাদের মৃত্যুর জন্য যে সমাজ দায়ী তাকে ধিক্কার দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলে ভাল হয়।

১৩। এঁরাই আবার বড়লোক প্রহসন—শ্রীনিমাই চাঁদ শীল।

বিত্তবান, জনদরদী, লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তির মদ্যপান ও ব্যভিচারকে বিষয়বস্তু ক'রে নিমাই চাঁদ শীলের 'এঁরাই আবার বড় লোক, প্রহসন সন ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে ( ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ) প্রকাশিত হয়।

পল্লীগ্রামের বড় মানুষ রাজাবাবু মাঝে মাঝে গ্রামে এসে মদ্যপান ও ব্যভিচারে মগ্ন থাকেন। দেশে নিজের সুনাম রাখতে অন্নসত্র, ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, এডেড স্কুল প্রভৃতি ক'রে দিয়েছেন। স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণকিশোর ছাত্রছাত্রীর মিথ্যা হিসাব দিয়ে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ ক'রে এবং বাবুর উমেদারি ক'রে অতিরিক্ত অর্থ উপায় করত। ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্তে ধরা পড়ায় স্ত্রীর সাহায্যে রক্ষা পায় বটে কিন্তু তার স্ত্রী কুলত্যাগ করে। অন্যত্র চাকুরি পাওয়ার আশায় লজ্জায়, ক্ষোভে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় এবং স্কুলটি উঠে যায়। ডাক্তার জয়কুমার ডাক্তারি বিদ্যায় নিপুণ না হ'লেও নারীলোলুপতায় নিপুণ। সে অর্থ দিয়ে কুলীনকন্যা শশিমালাকে আয়ত্তে আনতে চায়। পাপ বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে শ্যামার ঝাঁটা খেয়ে সেও গ্রাম ত্যাগ করে এবং ডাক্তারখানা উঠে যায়। আর রাজাবাবু গ্রামে এসে গোপনে জ্ঞাতি বিধবা স্ত্রী বড় বৌয়ের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর স্ত্রী নির্ম্মলা জানতে পেরে তিরস্কার করে। রাজাবাবু তাকে মদের বোতল দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। তাতে নির্ম্মলার মৃত্যু হয়।

প্রহসনটিতে তিনটি অঙ্ক। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নান্দী আছে তবে নান্দ্যন্তে সূত্রধার ও নটী প্রভৃতির বিষয় এতে নাই। প্রথম অঙ্কে দুটি, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। ভুলক্রমে দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্ক দুবার লেখা। বিক্রমপুর গ্রামের প্রকাশ্য

পথ, দাতব্য ঔষধালয়, পুষ্পোদ্যান, অন্দরমহল, শয়নাগার প্রভৃতি এর ঘটনাস্থল। কালঐক্য ( সন্ধ্যার একটু পূর্ব হ'তে রাত্রের মধ্যে হওয়ায় ) ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তবে শশিমালার নববাবুকে ডাকযোগে পত্র দেওয়ায় মনে হয় তার বাড়ী দূরে। অথচ তার পুষ্পোদ্যান ২/১ এবং ৩/১ ঘটনাস্থল হওয়ায় একটু ত্রুটি ঘটিয়েছে। এই দুটি গর্ভাঙ্কে হরিহর ও নবকৃষ্ণ সমাজ সম্বন্ধে খুব বেশী কথা বলায় গতির দিকেও দোষ দেখা যায়।

বিত্তবান রাজাবাবু, শিক্ষক কৃষ্ণকিশোর, ডাক্তার জয়কৃষ্ণ প্রভৃতির লাম্পট্য, চরিত্রহীনতা প্রভৃতি বেশ সুগ্রথিত। এদের বিপরীতে হরিহর ও নবকৃষ্ণ প্রহসনটিতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। মদ্যপান, ব্যভিচার, সরকারী অর্থ তছরুপ, ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীশিক্ষা, অখাদ্যভক্ষণ, সুরাপান নিবারণী সভা প্রভৃতি সামাজিক বিষয় এসে উপস্থিত। নায়ক রাজাবাবুর বিপরীতে নায়িকা নির্ম্মলা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। বিধবা বড় বৌয়ের প্রতি করুণা দেখাতে নির্ম্মলা তাকে আদর যত্নে ঘরে রেখেছিল, কিন্তু এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথে শনি ঢুকে তার সংসার ভাসাল—তাকে অকালে স্বামিহস্তে নিহত হ'তে হ'ল। পার্শ্বনায়িকা যুবতী বিধবা বড় বৌ। তাকে মদ্যপান করিয়ে রাজাবাবু অধিকার করেন। যে নির্ম্মলা তাকে ঘরে রেখেছিল তারই স্বামীকে হস্তগত ক'রে সে দুর্নীতির পথে চললেও অবাস্তবিক কিছু করে নাই। আমরা শ্যামালতার 'ঘরে এমন বিধবা বিয়ের কন্যে থাকতে বাবু কেন বাইরে খুঁজে বেড়ান?' —এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, 'তা না হলে বাবুর মত ব্যভিচারী ব্যক্তির সুবিধা হবে না।'

মতিরাম, শ্যামালতা, শশিমালা, ক্ষমা, সখী, বামা প্রভৃতি গৌণ চরিত্র ভালই হয়েছে। মতিরাম পিতার আদেশে মদ্যপান করত না; এখন সে অভ্যস্ত। তার ব্রাহ্মসভায় গতিবিধিও আছে। সেজন্য সে দুখানা রুমাল লেবেণ্ডারে ভিজিয়ে রাখে। ৩/১ এ তার রূপ পূর্ণভাবে পরিস্ফুট। সে তিন বৎসর নর্ম্যাল স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়েছে, ইংরাজীও কিছু কিছু জানে, তার কোন প্রেজুডিস নাই, সে বিধবা-বিবাহের বর, পিতার লোকান্তরে অশৌচ গ্রহণ করে না, শ্রাদ্ধও করে না, সুতরাং সুসভ্য ব'লে বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ দাবী

করে। কিন্তু নববাবু তাকে সুসভ্য বিবেচনা না করায় তার প্রতি তার বিরাগ। কুলীনকন্যা শশিমালার বিষয় অধিক না বলাই ভাল। তবু যে তার সতীত্ব রক্ষায় ভগবান (ইন্দ্র?) বজ্রপাত ঘটিয়ে সাহায্য করেছেন এর জন্য কৃতার্থ। বামা গতানুগতিক কুটনীরূপে চিত্রিত।

প্রহসনটিতে চারটি গান আছে। নান্দী অংশে খাম্বাজ চৌতালে সুধী সজ্জনগণের উদ্দেশ্যে যে গানটি আছে তাতে সমাজের বিষয় প্রকাশিত। নান্দী অংশে কোন দেব দেবীর স্তুতি থাকে; কিন্তু এতে তা নাই। পক্ষান্তরে 'সময় দোষ বর্ণনে, করি নাই হেন মনে, কটাক্ষ বিশেষ জনে, করিব সন্ধান।'—ব'লে মনে করতে বললেও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করাও অসম্ভব নয়। ১/১ এ দুশ্চরিত্রা বামার সুরট মোল্লার আড়-খেমটায় গানটিতে তার চরিত্র বুঝা যায়। যদি কারও অসুবিধা ঘটে তাহ'লে এরপর প্রাচীন যাত্রা রীতি অনুযায়ী গদ্য সংলাপ শুনতে হয়। 'বাপু! দু বচ্ছর চাঁদ নগরে বাস করে্য এসেছি, যেখানে মাসে হাজার সতীত্ব বাজেআপ্ত হয়, ......।' ১/২ এ রাজাবাবু যখন মদের বোতল ও গ্লাস নিয়ে রাগিণী জয় জয়ন্তী, তাল চৌতালে 'নমো নমঃ গো জননী, সুরারূপা সনাতনী' ......গানটি ধরেন তখন আর আমাদের কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। ২/১ (দ্বিতীয়) (অর্থাৎ ২/২ হবে) এ নির্ম্মলা মনের দুঃখে রাগিণী বাগেশ্বরী—জলদ্ তেতালায় 'কে জ্বালিল মম হৃদে, বিষম অনলে।' —ব'লে যে গান গায় তাতে অতি পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। গানটির শেষাংশের ইঙ্গিত বড় বৌ বুঝতে পারলে নির্ম্মলার শোচনীয় পরিণতি হ'ত না।

গ্রন্থকার নাম দিয়েছেন 'এঁরাই আবার বড়লোক!' নবকৃষ্ণের ভাষায় 'এঁরাই আবার সমাজের ভূষণ! এঁরাই আবার দেশের লোকের প্রতিনিধি! এঁরাই আবার বড়লোক!' এই হিসাবে নামকরণ সার্থক। তবে রাজাবাবুর মদ্যপান ও অন্যান্য দোষ বড় লোকের হ'লেও যুবতী বিধবা বড় বৌ বাড়ীতে রাখায় যত বিপত্তি। যুবতী বিধবা বাড়ীতে থাকলে তার সঙ্গে ব্যভিচার শুধু বড়লোকের কুচরিত্রের পরিচায়ক নয়। তবে দরিদ্রের ব্যভিচারে কে মাথা ঘামায়? কিন্তু একে প্রহসন বলা যুক্তিহীন। 'প্রহসনের প্রধান উদ্দেশ্য হাস্যোদ্দীপন, এবং তদর্থে রস-

ব্যঞ্জক বর্ণনার সাহায্যে ক্রমশঃ হাস্যরসের সম্পূর্ণতা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তদন্যথায় গ্রন্থকার এক দুঃখজনক স্ত্রীহত্যাদ্বারা আপন রচনা সমাধা করিয়া তাহার নাম "প্রহসন" রাখিয়াছেন।'[১১]

মতিরামের সংলাপে, ক্ষমার জয়কুমারের দাঁতে আঘাত করার সময় আমরা হাসি, নির্ম্মলার মৃত্যুতে আমরা কাঁদি আর রাজাবাবুর প্রতি ঘৃণায় আমরা শিহরিত হই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে (৩০ শে বৈশাখ ১২৭৫ সাল) তারিখের সোমপ্রকাশে একজন দর্শকের বিবরণীতে ৯ই মে শনিবার সনঠনিয়া নাট্যালয়ে 'এঁরাই আবার বড়লোক' এর অভিনয়ের সংবাদ আছে। 'অভিনয়ের সঙ্গে একতান বাদ্য ও গীতও হইয়াছিল। ......গ্রন্থের যে দোষ থাকুক, অভিনয় অতি সুন্দর ও যাবতীয় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অঙ্গভঙ্গী, আর্ত্তনাদ, রোদন, আহত হইয়া ভূতলে পতন ও মৃতকল্প হইয়া শয়ন এবং সূর্যাস্ত বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত প্রভৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। মাষ্টার কেষ্টোকিশোর অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন।'[১২]

১৪। বাহবা চৌদ্দ আইন—অজ্ঞাত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের চৌদ্দ আইন সমাজ জীবনে এক আন্দোলন ঘটায়। বেশ্যা ও বেশ্যাসক্তগণের পক্ষে এই আইন সাংঘাতিক অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে ১২৭৬ সংবতে 'বাহবা চৌদ্দ আইন' গ্রন্থ কলকাতা হ'তে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী এই—চৌদ্দ আইন প্রকাশ হওয়ার ১০।১২ দিন বিলম্বে নিস্তারিণী নামে এক বারাঙ্গনা পল্লীর ছোটঠাকরুণ নামে এক ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হ'লে ব্রাহ্মণী তাকে এতদিন কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করে। প্রথমে সে লজ্জায় সত্য বলতে চায় না। পরে চৌদ্দ আইনের পরীক্ষা দিতে তাকে যেতে হয়েছিল ব'লে স্বীকার করে এবং পল্লীর আরও কয়েকটি বৌ ঝিয়ের সাক্ষাতে সে অকপটে তার পরীক্ষার বিষয়, চিকিৎসার বিষয় সব ব'লে দেয়।

গ্রন্থটির মুখবন্ধ স্বরূপ এক দীর্ঘ বিবৃতি আছে। 'এর প্রথমে ইংরেজ

---

১১। রহস্য সন্দর্ভ—সংবৎ ১৯২৩ পৃ ১২৭

১২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—২য় সংখ্যা। পৃ ১৩৩

বাহাদুরের শৃঙ্খলা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং প্রজাদের সচ্চরিত্র করার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। তাঁরা যে সর্বশোষক এবং রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেই তাঁদের দৃষ্টি—তা ঠিক নয়—প্রজার মঙ্গলও তাঁদের কাম্য। প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হ'তে-দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পর্যন্ত কলকাতায় বেশ্যাবৃদ্ধি, বেশ্যাগমনের কুফল এবং চৌদ্দ আইনকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠায় বেশ্যাগামীদের অসুবিধার কথা আছে। দীর্ঘ ভূমিকার পর গ্রন্থকার লিখেছেন 'অধুনা চৌদ্দ আইন প্রকাশ হওয়াতে বারাঙ্গনাকুল কি প্রকার কথাবার্ত্তা ব্যবহারাদি করিয়া কিরূপে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছে, তাহা সাধারণের গোচরার্থ নাটকচ্ছলে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' ভূমিকার দৈর্ঘ্য অল্প ক'রে পরের অংশের মত নাটক বর্ণনা করা চলত। কলকাতায় ঐ আইন নিয়ে আন্দোলনের বিষয় লেখক জানিয়েছেন। তবে সতী-দাহ নিরোধ আইন এবং বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার সময়েও আন্দোলন কম হয় নাই। বারাঙ্গনাকুলের সংলাপ এবং ব্যবহারের মধ্যে ছোটঠাকরুণ নামে ব্রাহ্মণী এবং পল্লীর বৌ ঝি প্রভৃতি কামিনীর আমদানী না করা ভাল। বারাঙ্গনাদের দুভাগ ক'রে—এক ভাগ চৌদ্দ আইনে পড়েছিল এবং অপরভাগ পড়ে নাই—তাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারের মাধ্যমে নাটক রচনা করা ভাল। তবে একটি কথা—ভদ্র-পল্লীর মধ্যেই বারাঙ্গনাগণ তখন বাস করত এবং তাদের ভদ্র ঘরের বৌ ঝি প্রভৃতির সঙ্গে মেলামেশা চলত। ছোটঠাকরুণ নিস্তারিণীকে যে ভাবে জিজ্ঞাসা করছিল তা ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বর্ষীয়সী মহিলার পক্ষে অনুচিত। বেশ্যার মুখে কিছু আটকায় না, সে যেরূপ অশ্লীল-ভাবে তার পরীক্ষার বিষয় বলেছে তা শোনা অনুচিত।

কামিনীগণ নিস্তারিণীকে নিয়ে রসিকতা করেছে। তার স্বভাব সকলেই জানে। এই রসিকতা ঠিক নয়। আর কামিনীগণের ৫ বার সংলাপে সকলে একসঙ্গেই বলবে? তাদের পৃথক পৃথক নাম না থাকায় অসুবিধা ঘটবে।

বসন্তকুমারীর দুঃখ পয়ারে এবং মোহিনীর বিরহ ত্রিপদীতে কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। বসন্তকুমারী অপেক্ষা মোহিনীর বাস্তব দৃষ্টি

প্রশংসনীয়। মোহিনী আক্ষেপ করেছে, 'যে সকল ভদ্রলোকের ছেলের যাতায়াত করে, তারা আর কি আস্‌বে। তারাই হলো আমাদের প্রাণধারণের উপায়।' মনের আগুনের চেয়ে পেটের আগুন যে বেশী গুরুতর তা আমরা বুঝতে পারি।

নাটক ছলে বিষয়টি বর্ণিত হ'লেও এতে বিষয়বস্তু তেমন কিছু নাই। গ্রন্থকর্তা প্রথমে বিবরণ দিতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত নাটক লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। নাটকীয় রীতি এতে অনুসৃত নয়। এতে হাস্যরস পরিবেষণ করতে বীভৎস রস পরিবেষিত। তবে শেষদিকে বসন্তকুমারী ও মোহিনীর দুঃখে কিছু করুণ রসের সঞ্চার হয়েছে। অশ্লীল ও নিম্নরুচির ব'লে এবং নাট্যকাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে এটির অভিনয় হয় নাই। নাট্যকার, কামিনীগণ, মোহিনী প্রভৃতি 'বাহবা চৌদ্দ আইন' বলায় আমরা ঐ নাম সমর্থন করি। তৎকালীন সমাজচিত্র হিসাবে এর স্থান উল্লেখযোগ্য।

১৫। বেশ্যা বিবরণ—তারিণী চরণ দাস।

একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে তারিণীচরণ দাসের বেশ্যা বিবরণ নাটক ১২৭৬ সালে ( ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ) প্রকাশিত হয়।

শহর কলকাতায় বেশ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং সংক্রামক রোগের প্রকোপ হওয়ায় তার নিবারণার্থ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ আইন পাশ হয়। এতে বেশ্যাগণ অসুবিধায় পড়ে। তারা লুকিয়ে বেড়ায়, নানারকম মন্ত্রণা করে। এই পটভূমিকায় নাটকটি লিখিত। বেশ্যাগণের মন্ত্রণা সুমতি জ্ঞানের নিকট শুনতে চাইলে জ্ঞান বলতে থাকে এবং সুমতি শুনে।

এই নাটকে কোন অঙ্ক ভাগ এবং দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের উপবিভাগ নাই। জ্ঞান ও সুমতি এর পাত্র পাত্রী। এই পাত্রপাত্রী নির্বাচনে লেখক পৌরাণিক রীতি অনুসরণ না ক'রে অন্য নাম ব্যবহার করতে পারতেন। জ্ঞানের বেশ্যাগমন এবং দুষ্ট রোগে আক্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। তবে বেশ্যাদের এমনই প্রভাব যে জ্ঞানও নিজেকে সামলাতে পারে নাই—এ রকম ধরা চলে। পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার আছে কিন্তু স্ত্রীলোকের নাই ব'লে সুমতি যে দুঃখ প্রকাশ করে তা ঠিক নয়। কারণ বিধবা বিবাহ আইন পূর্বে পাস হয়ে গেছে।

সৌদামিনীর সুমন্ত্রণায় তার বাবাজীর সেবাদাসী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশিত। সে পূর্বে কালীভক্ত ছিল এখন কৃষ্ণভক্ত হ'তে চায়। মদমাংস ভক্ষণ এবং নারীসাধনা যেমন শাক্তদের তেমন জাতিভেদ-শূন্যতা, বাবাজী ও সেবাদাসীর ব্যভিচার বৈষ্ণবধর্মের রীতি। অনেকেই মরতে চায় কারণ আর সুখ তাদের হবে না। সুধামুখী মৃত্যু অর্থে জীর্ণ শরীর ত্যাগ গীতার এই অর্থ বুঝে। তবে হিন্দু সমাজের প্রতি তার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা আছে। কিন্তু হিন্দুকুলেই যখন বিধবা হ'য়েও বিবাহ করা যায় তখন ঐ সুযোগের জন্য যবনকুলে জন্মগ্রহণ করতে হবে কেন? 'হিন্দুকুলে মনুষ্য নাহিক একজন।' ব'লে সে খেদ করলেও আমরা মানতে পারছি না। বেশ্যা হওয়ার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে জানালে তার মনোবাসনা পূর্ণ করতে তিনি তার মত বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দুকুলে ছিলেন। সে বলেছে, 'পরীক্ষা দিতে জেতে হল জবন ঠাঁই। পরীক্ষা দিয়ে পুন গৃহে আসিব নাই॥' পরজন্মে যে যবনকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে বাদশার বিবি হয়ে হিন্দুধর্ম বিনাশ করতে চায় সে এই জীবনে যবন ডাক্তার পরীক্ষা করবে ব'লে গৃহে ফিরবে না বলছে কেন? মুসলমান ডাক্তারই তার পরীক্ষা করবে তা ঠিক কি? দ্বিতীয়তঃ তার বেশ্যা জীবনে যবনের সংস্পর্শে সে আসে নাই? তবে তার 'গোপনে সকলি করে থাকে হিন্দুগণ। গোপনে করিয়ে কার্য্য সাধু হয়ে রন॥ প্রকাশেতে পাপ হয় জেনেছে নিশ্চয়।' —উক্তি হিন্দুর লোকাচার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

নাটকটির আরম্ভে বেশ্যার গানে বেশ্যাগণের বিপদ এবং ফরাস-ডাঙ্গায় চ'লে যাওয়ার বিষয় বর্ণিত। কিন্তু মুদ্রণের ত্রুটিবশতঃ ফরাস-ডাঙ্গা 'ফয়েসডাঙ্গা' হ'য়ে গেছে। গদ্য সংলাপে যতিচিহ্ন যথাযথভাবে স্থাপিত নয়। সুমতির উক্তির প্রায় ১০ লাইনের পর পূর্ণচ্ছেদ এবং জ্ঞানের উক্তির প্রায় ১৮ লাইনের পর দুটি পূর্ণচ্ছেদ আছে। গ্রন্থকার কেন এ রকম করেছেন বুঝা গেল না। ষষ্ঠ পৃষ্ঠা হ'তে সৌদামিনী, পচার মা প্রভৃতির উক্তি জ্ঞান না ব'লে তারা বলছে এ রকম থাকলে কি ক্ষতি হত? সুধামুখীর সাহস নবম পৃষ্ঠা হ'তে দ্বাদশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পয়ারে বর্ণিত। এতে শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা। মুদ্রণের ত্রুটিবশতঃ

প্রচুর পরিমাণে বানান ভুল লক্ষ্য করা যায়। আবার মধ্যযুগীয় ভনিতা ও এতে আছে। কয়েকটি বেশ্যার বিবরণে গ্রন্থটিকে নাটক করার চেষ্টা আছে ব'লে কিছু ত্রুটি থাকলেও নাম 'বেশ্যাবিবরণ নাটক' সার্থক বলা যায়। এতে বীভৎস রসের প্রকাশ ঘটেছে। বেশ্যাদের কাহিনীতে দুঃখ থাকলেও করুণরস পরিবেষিত হয় নাই। নাটকটির প্রথম খণ্ড আলোচনা করা গেল। এর আর কোন খণ্ড রচিত হয়েছিল কিনা বা কোন খণ্ডের অভিনয় হয়েছিল কিনা জানা নাই।

১৬। কামিনী নাটক—ক্ষেত্রমোহন ঘটক।

মদ্যপান হ'তে স্ত্রীজাতিও রেহাই পায় নাই। এ বিষয়ে ক্ষেত্রমোহন ঘটক প্রণীত ও প্রকাশিত ( সন ১২৭৫ সাল ) কামিনী নাটকের নাম করতে হয়। এর কাহিনী এই—জমিদার উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিবা-রাত্র মদ্যপানে ব্যস্ত থাকায় কন্যা কামিনীকে বিদুষী ক'রেও সৎপাত্রে বিবাহ দিতে পারলেন না। কুৎসিত, মূর্খ কুলীননন্দন কেবলরামের সঙ্গে তার বিবাহ দেন। পিতার ইচ্ছায় কামিনী মদ্যপানে অভ্যস্ত।, স্বামীকে তার অপছন্দ। অনেকেই তার চরিত্রে সন্দেহ করে; কেউ কেউ আবার মিহিরবাবুর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথাও বলে। স্বামী কেবলরামের সন্দেহ উদয়বাবুর উপর। শেষ পর্যন্ত কামিনী কেবলরামের প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তার কেশাকর্ষণ ক'রে কপোলদেশে দন্তা-ঘাত করে। কামিনী প্রকাশবাবুর বাড়ীতে এসে অতিমাত্রায় শ্যাম্পিন ও ব্রাণ্ডি খেয়ে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়লে তাকে পাল্কী ক'রে পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বটে কিন্তু শেষ রাত্রে সে কাপড় ছিঁড়ে পাকিয়ে গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করে।

নাটকটি আরম্ভ হওয়ার পূর্বে গ্রন্থকারের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখাটিতে উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

মদ্যাসক্ত পুরুষের দুর্গতি আমরা পূর্বে দেখেছি। স্ত্রীলোকে মদ্যাসক্ত হ'লে কি হয় তা গোপালবাবুর ভাষায় বলি, 'এঁরা ডামা করে দাগা ষাঁড় পার কত্তে পারেন। সিভিলাইজ্‌ড হয়েছেন, লেখাপড়া শিখেচেন, ভারত-চন্দ্রের গোমূত্র আগে পান করে দাশরথীর শেষ খণ্ড পড়ে চরিতার্থ হয়েছেন, তারপর কেবল বটতলার দিকে চেয়ে বসে আছেন। কোন্

দিন দ্যাখ না স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়ে বেরোন্ আর কি।' স্ত্রীলোকের মদ্যপানেও পুরুষ দায়ী; কারণ পুরুষের প্রশ্রয়েই তারা সাহস পায়।

সম্প্রদায় সহ বাই, উদয়, মিহির, প্রকাশ ও যবনিকান্তরালে কামিনী, মোক্ষদা ও সহচরীদ্বয় উপস্থিত হ'লে আমরা উনিশ শতকের বিশেষ এক সামাজিক চিত্র দেখি। নলদময়ন্তীর পালা, পাঁচালী, যাত্রা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি সেকালের আমোদ প্রমোদের বিষয় জানা যায়। উদয়বাবুর বিধবাবিবাহ মতে কামিনীর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা; কিন্তু কামিনী তা চায় না। কারণ তার স্বামী বেঁচে আছে।

গ্রন্থটিতে চারটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে গর্ভাঙ্ক নাই, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক আছে, আবার চতুর্থ অঙ্কে গর্ভাঙ্ক নাই। ইতি প্রথমাঙ্ক, ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক প্রভৃতি লেখা আছে। গতি-ঐক্য, স্থানঐক্য ও একদিনের সকাল হ'তে পরের দিন সকাল পর্যন্ত এর ঘটনাকাল হওয়ায় কালঐক্য বজায় আছে।

নায়িকা কামিনীর নামানুসারেই নাটকের নাম। মিহিরবাবুর সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয়ের কথা গোপাল ও কৃষ্ণমোহন আলোচনা করে। কামিনী ব্যভিচারিণী হ'লে স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখেও হ'তে পারত। তার লিপিতে জানা যায় সুরাই তার সর্বনাশের মূল। তার ইচ্ছা ছিল 'নয়নজ্বালাকর কদর্য্য স্বামীকে পতিত্বে স্বীকার করিব না, আর পুরুষান্তরও সেবা করিব না।' সে পিতামাতাকে অনুরোধ করেছে, 'মিহিরবাবু যেন আমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন ইহা যাহাতে হয় তাহা কোরো।' এ সব বিবেচনা করলে কামিনী অতি জটিল চরিত্র। তার আত্মহত্যার কারণ কি? মদ্যপানে ঘৃণা ও লজ্জা না কেবলরামের প্রতি বিতৃষ্ণা; না মিহিরবাবুর সঙ্গে প্রণয়? অথচ কামিনীকে ট্র্যাজেডির উপযুক্ত নায়িকা ক'রে চিত্রিত করার উপাদান যথেষ্ট ছিল।

মূর্খ, কদর্য ও কুলীন কেবলরাম কামিনীর স্বামী। পত্নীর প্রেম-ভালবাসা হ'তে সে বঞ্চিত। ধনী শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তির লোভে সে পত্নীর অবজ্ঞা সহ্য করে। কামিনীর মদ্যপানে সে উদয়বাবুকেই দায়ী করে, এমন কি তাদের অবৈধ সম্পর্কের চিন্তাও করে। শাশুড়ী তার পক্ষে ব'লে সে তার উপর সন্তুষ্ট। কামিনীর দ্বারা প্রহৃত হ'য়ে সে

স্ত্রী ত্যাগ ক'রে প্রাণ নিয়ে চ'লে যেতে চায়। কামিনীর মৃত্যুতে তার দুঃখ ন'ই কারণ সে কুলীন কুমার। তার আশা কামিনী মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিষয়ের মালিক ক'রে গেছে। কামিনীর যেমন স্বামীভক্তি কেবলের তেমন পত্নীপ্রেম। দুজনেই দুজনের তুলনা। কিয়দংশে এদের সঙ্গে জামাই বারিকের অভয়কুমার ও কামিনীর তুলনা করা যায়।

উদয়বাবু কামিনী, কামিনীর মাতা এবং কেবলরামের দ্বারা অভিযুক্ত। মদ্যপান সভ্যতার লক্ষণ ব'লে তিনি কন্যাকে এটি ধরিয়ে ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর যুক্তি 'আর ভাল জিনিস ছেলেপুলেকে না দিয়ে কি খেতে আছে?' যিনি কন্যাকে মদ খাওয়াতে পারেন তিনি দেশাচারের দাস হ'য়ে মূর্খ কুৎসিত কেবলরামের সঙ্গে সুচারু মাধবী-লতারূপ কামিনীকে বিবাহ দিলেন কিভাবে বুঝা যায় না। প্রকাশ-বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়ে যখন কামিনীকে বিশ্রস্তবসনা এবং মদোন্মত্তা দেখে উদয়বাবু বলেন, "সী দেয়ার ইজ্ অ্যানাদার বিউটি কামিং" তখন আর তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নাই।

উম্নো এবং ঝুম্নো চরিত্র বেশ উজ্জ্বল। ঝুম্নো অপেক্ষা উম্নো রসিকা। ঝুম্নোর গদ্যে সংলাপ এবং উম্নোর পয়ারে টিপ্পনী মন্দ লাগে না। সাধারণ স্ত্রীলোক হ'লেও সামাজিক ও সাংসারিক আলোচনা তাদের মুখে বেশ স্বাভাবিক।

প্রথম অঙ্কে গোপাল ও কৃষ্ণমোহনের কবিতার ঢঙে সংলাপে রঙ্গ-রসিকতা প্রকাশিত। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কেবলরাম যে সব কবিতা ব্যবহার করেছে তাতে সুরুচির পরিচয় না থাকলেও তার মনো-ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতায় গিন্নী উদয়বাবুর নিকটে জাতি খাওয়ার বিষয়ে বলে। আর কামিনী ও গিন্নী পয়ারে পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করে।

নাটকটি গোপালচন্দ্রের মদ্যপানের কুফল বিষয়ে স্বগতোক্তিতে আরম্ভ। প্রথমে, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত এ রকম নাটকের সংলাপ হওয়া অনুচিত। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কও কেবলরামের দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে আরম্ভ। তার সংলাপে চন্দ্রবিন্দু বেশী দেখা যায় কিন্তু অন্যত্র এই

দোষ দেখা যায় না।

নাটকে যে ক'টি গান আছে তার অধিকাংশই উন্মোর। প্রথম অঙ্কে চমরু পাঁঠা নিয়ে যেতে যেতে ভৈরবী রাগিণীতে তাল আদ্ধায় যে গীত পরিবেষণ করে তাতে তার একদিকে আনন্দ প্রকাশ এবং অন্যদিকে কুঞ্জের অবৈধ প্রণয়ের ইঙ্গিত দিয়ে নাট্যকার কৌশল দেখালেন। উন্মোর সব গানেই তার জীবনের হাহাকার প্রকাশিত। অন্যদিক বিচারে তার সঙ্গে কামিনীর সাদৃশ্য ধরলে গানগুলিতে কামিনীর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নাটকটিতে ভারতচন্দ্র ও শেক্ষপীয়রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেবলরামের বিদ্যাসুন্দরের জ্ঞান কম নয়। কামিনীর সঙ্গে কেবলরামের মিল না হওয়ায় গিন্নীর দুঃখ 'কামিনীও যে এতদিন ঘরকন্না কল্লে দু ছেলের মা হতো। দুর্ভাগ্যি।' কেবল তা শুনে স্বগতভাবে বলে, "হাঁ ইতদিনে গান্ধারী করে দিতে পাত্তাম।' এতে তার উপর মহাভারতের প্রভাব অপেক্ষা শেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট নাটকের ক্যালিবানের মিরাণ্ডার প্রতি মনোভাব প্রকাশিত।

১৭। হিন্দুমহিলা নাটক—বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা বিষয়ে নাটক লেখার জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উদ্যোক্তাগণের পুরস্কার ঘোষণায় বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুমহিলা নাটক রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮৬৯এ (১২৭৫ সালে) প্রকাশিত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরস্কার পান নাই; পেয়েছিলেন বিপিন মোহন সেনগুপ্ত। * বটুবেহারীর গ্রন্থের কাহিনী এ রকম— বিনোদের স্ত্রৈণতার সুযোগে তার স্ত্রী ভগবতী গণেশদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত এবং শাশুড়ী, ননদ, দেওর প্রভৃতির উপর অসন্তুষ্ট। সে বিষপ্রয়োগে স্বামীকে হত্যা করার চেষ্টা করে। বিনোদ প্রাণে বাঁচে বটে কিন্তু সব দোষ শ্যাম, জগদম্বা প্রভৃতির উপর পড়ে। ফলে তাদের গৃহচ্যুত হ'তে হয়। তারা কমলের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কমলের মা বগলা এবং স্ত্রী সুরমা চেষ্টা ক'রেও কমলকে মদ্যপান ও চুনি এবং মনমোহিনী নামে দুই বেশ্যার হাত হ'তে সুপথে আনতে পারে

* চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নাই। অন্যদিকে মনমোহিনী নবীনের পরামর্শে পানের সঙ্গে শিকড় খাওয়ায় এবং কমল পাগল হ'য়ে যায়। দাসী এই সুযোগে তাকে দিয়ে বিনোদকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পাগল কমল গণেশদেব ও দাসীকে হত্যা করলে ভগবতী পলায়ন করে। কমল সুস্থ হ'য়ে উঠে এবং বিনোদ তার মা, ভাই প্রভৃতিকে আনতে পাঠায়।

গ্রন্থকার উৎসর্গপত্রে লিখেছেন 'হিন্দুমহিলায় কোন নূতন কথা নাই, বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ যাহা দেখিতেছেন বা করিতেছেন তাহারই প্রতিমূর্ত্তি, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে হিন্দুমহিলা আমাদিগের সময়ে আদরণীয় না হইয়া বরং ভবিষ্যতের গর্ভস্থ লোকদিগের আদরণীয় হইতে পারে,' কিন্তু গ্রন্থকারের আশা ফলবতী হয় নাই। কালের পরিবর্ত্তনে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে। এখন এই বিষয় অচল। বিনোদের স্ত্রৈণতার সুযোগে ভগবতীর ব্যভিচারিণী হওয়া, এ বিষয়ে দাসীর সহায়তা, গণেশদেবের মত বকধার্ম্মিকের চরিত্রহীনতা কিছুরই অভাব নাই। শৈল, গোলাপী, বিধুমুখী প্রভৃতি লেখাপড়া না শিখে সেঁজুতি, তুঁস তুঁসলী শিখে কাল কাটায়। হাস্যকর ব্যাপার এই যে মনোরমা তাদের শিখায় 'গাড়ি গাড়ি গাড়ি আমি হই জন্ম এয়েস্ত্রী সতিন হোগ্ রাড়ী।' সতীন রাড়ী হ'লে সে এয়ো কিভাবে থাকবে? সেকালের বিশ্বাসের কথা মনোরমার কথায় আমরা জানতে পারি, 'স্ত্রীলোকে লেখাপড়া কল্লে বিধবা হয়, আর ওদেরি বা দোষ কি যেমন উপদেশ পায়, ।

কমলের মদ্যপানের জন্য সন্তেন, তুলসী প্রভৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু দৈবশক্তি এখানে নিষ্ফল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবিনী তবুও তারই কথা বলে। ভাবিনীর কথায় মদ্যপানের সঙ্গে বেশ্যাসক্তির সম্বন্ধ বুঝতে পারি। পুলিশের ঘুষ খাওয়া; বিষ দিয়ে স্বামীকে হত্যা করা, ব্যভিচার জীবন যাপন করা, ঔষধ প্রয়োগে পাগল করা প্রভৃতি সামাজিক কুরীতি এতে লক্ষণীয়। ৫/১ এ দাসী বাঙ্গালী মেয়েদের সম্পর্কে বলে, 'বাঙ্গালির মেয়েদের ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই যে যা বলে তাতেই মন, কেবল খেতে পারে শুতে পারে, আর কোমর বেঁধে কোঁদল কত্তে পারে।' এতে বঙ্গমহিলার বিশেষ এক দিক প্রকাশিত।

নাটকটির পাঁচটি অঙ্কে ১ম অঙ্কে তিনটি, ২য় অঙ্কে চারটি, ৩য় অঙ্কে তিনটি, ৪র্থ অঙ্কে তিনটি এবং ৫ম অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক আছে। অঙ্ক স্থাপনে কোন দোষ নাই। ত্রিবিধ ঐক্যও এতে মোটামুটিভাবে রক্ষিত। বিনোদের ভুল এবং তার অনুতাপ বেশ সুন্দর। তবে উপকাহিনীতে কমলের বিষয়ে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তার পাগল হওয়ার পর মা ও স্ত্রীর প্রতি মন আসা, তার গণেশদেব ও দাসীকে হত্যা করা প্রভৃতি আকস্মিক। আবার তার সুস্থ হওয়ারও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যান্য ত্রুটি ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ভাবিনীর দাদারা কে কে? দু বৌদিদির একজনকেও দেখা গেল না। লেখক উৎসর্গপত্রে 'ইহা দেখিয়া আপনি যদি মৃদুহাস্য করেন তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।' —এ কথা লিখলেও আমরা একটুও হাসতে পারি না। বরং শ্যাম, মনোরমা, বগলা, সুরমার দুঃখের অবসানে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। তবে হাস্যরস যে এতে নাই তা নয়। ২/১ এ গণেশদেব ও দাসীর সংলাপে, ২/৪ এ কমল, দাসী, চুনি প্রভৃতির সংলাপে, ৩/২ এ মনমোহিনী, নবীন প্রভৃতির সংলাপে, ৩/৩ এ পঞ্চানন ও পাহারাওয়ালার সংলাপে হাস্যরস আছে। শেষের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রের হাস্যরস নিম্নরুচির।

গ্রন্থটি যে উদ্দেশ্যে রচিত তার অন্যতর পরীক্ষক প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বি. এ. মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত। এতে দুর্গেশনন্দিনী, নবীনতপস্বিনী, নীলদর্পণ, বুঝলে কিনা, কিছু কিছু বুঝি, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে দুর্গেশনন্দিনী, নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। বগলা ও জগদম্বার দুঃখ সেকালের কুলীন কন্যার কথা স্মরণ করায়।

নাটকটির মুখপত্রে 'A DRAMA ON NINDU FEMALES THEIR CONDITION AND HELPLESSNESS' এই লেখা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা বুঝা যায়। তাদের অসহায় অবস্থা যা এই নাটকে রূপায়িত তার জন্য মহিলাই দায়ী। নাটকে ভগবতী এবং দাসী তাদের উদ্দেশ্য

সাধনে অন্যের অসহায় অবস্থা ঘটিয়েছে। অবশ্য ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ব'লে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত পোয়েটিক জাস্টিস রক্ষা করেছেন।

১৮। চক্ষুদান—রামনারায়ণ তর্করত্ন।

পুরুষের মদ্যপান ও বেশ্যাগমন হিন্দুমহিলা নাটকে যেভাবে সংশোধন করা হয়েছে তা অপেক্ষা রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর চক্ষুদান প্রহসনে হাস্যরসের মাধ্যমে সুন্দরভাবে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশ করেছেন।

বসুমতীর স্বামী নিকুঞ্জ মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত। দুঃখে বসুমতী আত্মহত্যা করতে চায়। নাপিত বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শে স্থির হয় সে বসুমতীর উপপতির অভিনয় করবে। এ রকম অভিনয়কালে নিকুঞ্জ এসে প্রকৃত মনে ক'রে তিরস্কার করে; পরে সব বিষয় জেনে তার চক্ষু-দান হয়।

প্রহসনটিতে একটি অঙ্ক ও দুটি গর্ভাঙ্ক আছে। প্রথম গর্ভাঙ্কের উল্লেখ নাই; দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের আছে। এটিকে একাঙ্ক নাটক রচনার পূর্বসূচনা বলা যায়। তিনটি চরিত্র—নিকুঞ্জ, বসুমতী ও নাপিত বৌ—নিয়ে প্রহসনটি রচিত। নিকুঞ্জ নায়ক, বসুমতী নায়িকা এবং নাপিতবৌ পার্শ্বচরিত্র। তিনটি চরিত্রই উপযুক্ত, তবে নাপিতানীর চরিত্রে কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। সে বসুমতীর মনের ভাব বুঝতে না পেরেও বুঝার ভান ক'রে একের পর এক ছড়া কেটে তার প্রতি তার সহানুভূতির ভাব নষ্ট করেছে। আবার প্রথমে সে যে পরিমাণ চালাকচতুর দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সেই পরিমাণে হাবাগোবা। তবে বসুমতীর শেখানো 'প্রিয়ে যে অবধি তোমার রূপের মাধুরী আমি নয়নে দেখেছি সেই অবধি দেহ মন প্রাণ তোমাতে সঁপেছি।' যখন নাপিত-বৌ "প্রিয়ে যে অবধি তোমার রূপোর মাদুলি নয়নে দেখেছি, সেই অবধি দেও মোর প্রাণ তোমাকে—" বলে তখন আমরা হাসতে থাকি। আর বসুমতীর 'প্রিয়ে, তোমার বিরহে আমার অন্তর দগ্ধ হচ্যে, এখন তোমার বচনামৃতদানে শীতল কর।' যখন নাপিত বৌয়ের মুখে 'প্রিয়ে তোমার বেরালে আমার অনন্তর দগ্ধ হচ্যে……' এই রূপ গ্রহণ করে তখন আমরা হেসে গড়াগড়ি যাই। বসুমতী স্বামীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে

স্পষ্ট ভাষায় যখন বলে, 'কেন? আমি কি মানুষ নই? আমার রক্ত মাংসের শরীর নয়? আমার মন নাই? ইন্দ্রিয় নাই, সুখ দুঃখ নাই? কিছুই নাই? তুমি কর কেন? তুমি কি সৎকার্য্য করে থাক?' —তখন আমরা তার দৃঢ়ত্বব্যঞ্জক নারীত্বকে প্রকাশ করার ক্ষমতায় আশ্চর্য। উনিশ শতকের নারী জাগরণের লক্ষণ এই বসুমতীর মধ্যে পাওয়া যায়। সে এ সময়ে গান ধরতে পারত—

'বেশ করেছি—প্রেম করেছি—করবই তো।' তার মত যদি অন্য নারীও করতে পারত তা হ'লে পুরুষের মদ্যপান ও বেশ্যাগমন প্রতিরোধ করা যেত। কারণ নিকুঞ্জের মত অনেক পুরুষকেই বলতে হ'ত "তুমি আজ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো।"

১৯। আলালের ঘরের দুলাল—হীরালাল মিত্র

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এর বিষয়বস্তু অবলম্বনে হীরালাল মিত্র শকাব্দা ১৭৯১ এ (১৮৬৯, এপ্রিল) আলালের ঘরের দুলাল নাটক প্রকাশ করেন। কাহিনী সেই পরিচিত বৈদ্যবাটীর জমিদার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মতিলালের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শেষ পর্যন্ত তার মতি পরিবর্তন।

নাটকটিতে দশটি অঙ্ক—সংস্কৃত নাটকানুযায়ী নান্দীপাঠ, নটনটী প্রভৃতির মাধ্যমে নাটকীয় বিষয়ের উপস্থাপনা আছে। বৈদ্যবাটী, বালী, কলিকাতা, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রভৃতি স্থান ঘটনাস্থল। স্থানঐক্য ও কালঐক্য এতে ক্ষুণ্ণ। উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ায় অনেক অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক। ১/৩, ২/২, ৫/১, ৫/২ ও ৮/১ সংক্ষিপ্ত।

বাবুরাম বাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান ব'লে না দুটি পুত্রই ভাল হ'ল না ব'লে দ্বিতীয় বিবাহ করলেন বুঝা গেল না। তিনি মোক্ষদা ও প্রমদাকে সুপাত্রে ও সমান ঘরে দিয়েছেন বললেও আমরা স্বস্তি পাই না। প্রমদা স্বামীর দুর্ব্যবহারে মর্মাহত। তার মর্মভেদী উক্তি 'এমন ভাতার থাকায় না থাকায় সমান।' মোক্ষদার মতে—

'ভাতার যদি না চায় কোন দুঃখ নাই তাতে।
মোত্তে যেন পারি ভাই নোয়া রেখে হাতে।'

মোক্ষদা নোয়া হাতে রেখে মরতে না পেলেও সে ম'রে বেঁচে গেল। আর প্রমদা বেঁচে থেকে মরার বাড়া দুঃখ ভোগ ক'রে শেষে সুখ ভোগ করল।

গৃহিণী চরিত্র ভালই হয়েছে। বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী বিনোদিনী এবং মতিলালের স্ত্রী কাত্যায়নীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে না দেখে আমাদের অনুশোচনা হয়। বিনোদিনীর পিতামাতা তাকে ধনী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তার জীবনে হাহাকার ডেকে এনেছেন সত্য কিন্তু কাত্যা-য়নীর পিতার অবস্থা ভাল। সে পিত্রালয়ে চলে গেল না কেন? কুলীন-কন্যাদের পিত্রালয়ই তো সম্বল।

গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে বরদাবাবু, বেণীবাবু ও বেচারামবাবু এবং রমেশ, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা দুই বিপরীত শ্রেণীতে পড়ে। বাঞ্ছারাম বাবু শেষ পর্যন্ত ঠকচাচাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ঠকচাচার উপর টেক্কা দিয়ে সে তার স্ত্রীর গহনা আত্মসাৎ করেছে, বিনোদিনী ও কাত্যায়নীকে গৃহহারা করেছে। ঠকচাচার দ্বীপান্তর হয়েছে বটে কিন্তু বাঞ্ছারাম বাবুর কোন শাস্তি না হওয়ায় পোয়েটিক জাস্টিস রক্ষিত হয় নাই। স্বল্প পরিসরে হলধর, গদাধর, হরি, মুন্সি, গুরুমহাশয়, পূজারী ও তর্ক-সিদ্ধান্তের চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

নটের মুখ দিয়ে নাট্যকার বলেছেন, 'মনুষ্যে দুষ্কর্ম্মান্বিত হইযা ধর্ম্মাশ্রয় কোল্লে তাহারও সদগতি হয়। "আলালের ঘরের দুলালের" এই স্থূলমর্ম্ম।' বিশেষ এই উদ্দেশ্যে নাটকটি রচিত হওয়ায় এর শেষাংশে নানা আকস্মিক ঘটনা এসে গেছে। রামলালের বিষয় সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হওয়ার পর সে কিভাবে বৃন্দাবনে দানীতে পরিণত হ'ল তা নাটকে ঘটনার মাধ্যমে দেখান হয় নাই। তবে ধনীর দুলালের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, গাঁজা, মদ খাওয়া ও অন্যান্য চারিত্রিক দোষ দুষ্ট হওয়া, কুসঙ্গলাভ সবই যেমন এতে চিত্রিত তেমন শেষ পর্যন্ত তার মতি পরিবর্তনে লোকশিক্ষার উপাদানও পাওয়া যায়। এই দিক বিচারে আলালের ঘরের দুলালকে নাটক না ব'লে প্রহসন বলাই ভাল।

গ্রন্থটিতে কয়েকটি গান আছে এবং প্রত্যেক গানেই রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। প্রস্তাবনায় নান্দীপাঠের পর নটনটীর গানে

নাটকটির পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। ২/৩ এ হলধরের গান তার মত মদ্যপায়ীর উপযুক্ত। ৩/২ এ প্রমদা ও মোক্ষদার গানে তাদের দুঃখের বিবরণ হৃদয়গ্রাহী। তবে প্রমদার গানে অলঙ্কার প্রয়োগ আছে। মোক্ষদার গানে অলঙ্কার না থাকলেও গদ্য সংলাপের পর তার ও প্রমদার গান আছে। এ সব প্রাচীন যাত্রা হ'তে অনুসৃত। ৬/১, ১০/২ এ নেপথ্যে গান কার বুঝা যায় না। তবে শেষের গানটি তত্ত্বরসে মত্ত হ'তে উপদেশ থাকায় পরিণতির পথে গেছে।

টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলালে কিছু কিছু ঐতিহাসিক কাহিনী আছে—নাটকে তা অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত। উপন্যাসে ঠকচাচার সঙ্গে ঠকচাচীকেও পেয়েছিলাম কিন্তু নাটকে ঠকচাচীকে পাওয়া গেল না। উপন্যাসের মতিলাল ও বাবুরাম বাবুর বিবাহ ব্যাপারে গোলযোগের কারণ বেশ ভালভাবে প্রকাশিত। বিশেষতঃ বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গে কবিতায় কৌলীন্যপ্রথার দোষ চিত্রিত কিন্তু নাটকে এ সুযোগ নষ্ট। বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের বাদানুবাদ নাটকে না থাকায় আমরা সে কালের বিশেষ এক সমাজচিত্র দর্শনে বঞ্চিত। সংলাপের ক্ষেত্রে অনেক স্থলে দুই গ্রন্থের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গুরুমহাশয় বাবুরামবাবুকে বলেন, 'মতিবাবুর কলাপাত ও কাগজ লেখা শেষ হইয়াছে এবং এক প্রস্থ জমিদারি কাগজ ও লেখান গিয়াছে। ১ম অধ্যায় পৃ ২। নাটকে আছে—

গুরু। মশায় মতিবাবুর তো কলাপাতা ও কাগজ লেখা একপ্রকার শেষ হয়েচে তারপর এক প্রস্থ জমিদারী কাগজ পর্য্যন্ত লেখান গিয়াছে। (পূজারি) এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল—আজ্ঞে হাঁ, আমি কুইন মোড়ার ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তবাগীশের টোলে ব্যাকরণাদি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করি,' ১ম অধ্যায় পৃ ৩। নাটকে—

পূজারী। আজ্ঞে হাঁ, আমি কুনুই মোড়ার ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তবাগীশের টোলে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিচি। ১/১

হাস্যরস, করুণরস শেষ পর্যন্ত 'তত্ত্বরস' নাটকটিতে পরিবেষিত হওয়ায় এটি কম উপভোগ্য নয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী আলালের ঘরের দুলাল নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

২০। কি মজার শনিবার। চন্দ্রকান্ত শিকদার।

শহর কলকাতায় ও পল্লীগ্রামে শনিবারের অবস্থার বর্ণনা আমরা ৺চন্দ্রকান্ত শিকদার রচিত ও শ্রীগঙ্গাধর শীল কর্তৃক ( ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ) কি মজার শনিবার এ পাই। শনিবারে কলকাতায় বাবু, বিবি, মুটে-মজুর, বারবনিতা সকলেই আনন্দিত। গাঁজা ও মদের ধুম পড়ে। সোনাগাজি, মেছুয়াবাজার, হাড়কাটা, সিদ্ধেশ্বরীতলা প্রভৃতি অঞ্চল সরগরম। পক্ষান্তরে পল্লীঅঞ্চলের লোকে শনিবারে বাড়ী যেতে ব্যস্ত। তাদের পত্নীরা স্বামিমিলনে সুখী।

গ্রন্থটি আগাগোড়া কবিতার আকারে লেখা। পাত্রপাত্রীর উল্লেখ নাই। একে নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায় না; সমাজচিত্র হিসাবে ধরা যায়। শহরের ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার বিপরীতে পল্লীর মধুর দাম্পত্য জীবনের চিত্র স্থাপনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। দুই স্থানের পক্ষেই 'কি মজার শনিবার' প্রযোজ্য বলে নামকরণ যথার্থ।

মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ী ভনিতা পাওয়া যায়।

এমতে বঞ্চন হয় সুখে শনিবার।
বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদার ॥

তবে— দাঁড়াইয়া দ্বারে কেহ করিতেছে শোর।
কাম সুন মিডিয়ের ওপেন দি ডোর ॥

ইংরেজী কথাকে বাংলা কবিতার ঢঙে ব্যবহারের কৃতিত্ব লেখকের ছিল তা উপরের পঙ্‌ক্তি দুটিই প্রমাণ।

আবার কলকাতায় শনিবারের মজা বর্ণনায় তিনি যখন—

ধন্য বলি ধন্য কলি, ধন্য বলী তুমি।
ধন্য তব কলিকাতা ধন্য তার ভূমি ॥

পয়ারে লিখেন তখন এতে অলঙ্কার প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। অক্ষম রচনা হ'লেও উনিশ শতকের সমাজচিত্র হিসাবে 'কি মজার শনিবার' বিশেষ স্থান পাওয়ার অধিকারী। শহর কলকাতার চিত্র এখন কিছু পরিবর্তিত হলেও পল্লীঅঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রায় অপরিবর্তিত।

২১। একাদশীর পারণ—শ্রীবিপিন বিহারী দে।

শিক্ষিত উচ্চ বংশজাত ধনী যুবকেরা মদ খেয়ে বেশ্যা নিয়ে আমোদ

করত। তাদের পত্নীরা স্বামিসুখে বঞ্চিত হ'য়ে বিধবার মত দিন কাটাত। বিধবারা দ্বাদশীর দিনে একাদশীর পারণে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হয়। মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত স্বামীর চরিত্র ভাল হ'লে পত্নীর সুখের দিন আসত। এ বিষয়ে শ্রীবিপিন বিহারী দে লিখিত 'একাদশীর পারণ' প্রহসন ১২৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

সুধার্চাদ সুরাপান নিবারিণী সভার সদস্য হ'য়েও মদ্যপান করে এবং হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে আমোদ করে। সুধার্চাদের স্ত্রী কামিনী একদিন মিথ্যা আত্মহত্যার আয়োজন ক'রে তার স্বামীকে সুপথে আনে। কিন্তু মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত আশুতোষকে তার স্ত্রী প্রেমোলাঙ্গিনী কিছুতেই সৎপথে আনতে পারে না। শেষে আশুতোষের কঠিন পীড়ায় সেবা যত্ন করলে সে তার ভালবাসা পায়। কামিনীর একাদশীর পারণ হওয়ার সুখ সেও অনুভব করে।

শেষের মন্তব্য— 'রোদন করো না আর, ওলো রসবতী।
একাদশীর পারণ, কর লয়ে পতি॥'

নাম করণের ইঙ্গিত দেয়।

প্রহসনটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং একমাত্র পঞ্চম অঙ্কেই দুটি গর্ভাঙ্ক দেখা যায়। অন্যান্য অঙ্কে কোন গর্ভাঙ্ক নাই। পঞ্চম অঙ্কযুক্ত প্রহসন দেখা যায় না। তবে এ ক্ষেত্রে গ্রন্থটিতেই প্রহসন ব'লে লেখা আছে। আশুতোষ ও সুধাচাঁদের চরিত্র পরিকল্পনায় ত্রুটি থাকায় যত অনর্থ। সুধার্চাদের চারিত্রিক পরিবর্তন শুধু কামিনীর আত্মহত্যার ভয়ে? অথচ ঐ রকম লোকের এত সহজে পরিবর্তন আসে না। আশুতোষ অসুখে পড়ার পূর্বেই সুধার্চাদের কথায় হেমাঙ্গিনীর উপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছিল; তার উপর হেমাঙ্গিনী চ'লে যাওয়ায় তার অহঙ্কার হয়েছে ব'লে আশুতোষ মনে করে। অথচ নাটকের শেষ দিকে আশুতোষ ও প্রেমোলাঙ্গিনীর কথোপকথনে এর অসঙ্গতি দেখা যায়। হেমাঙ্গিনীকে আশুতোষের মা বলা এবং তার মা মাসী শাশুড়ি জ্ঞানের অভাবের কোন অংশ দেখানো হয় নাই। আসল কথা আশুতোষ ও সুধাচাঁদের সৎপথে আসা না দেখালে এটি নতুন 'একাদশীর পারণ' না হ'য়ে পুরাতন 'সধবার একাদশী' হ'য়ে যাবে ব'লে লেখকের এ রকম

পরিকল্পনা। তবুও বলা যায় জীবনচন্দ্র আত্মারামবাবু, অটলবিহারী আশুতোষ, নিমচাঁদ সুধাচাঁদ, ভোলা অভয়চাঁদ, গিন্নি সুরমা, সৌদামিনী বিদ্যুল্লতা, কুমুদিনী প্রেমোলাঙ্গিনী এবং কাঞ্চন হেমাঙ্গিনীতে পরিণত। তবে আত্মারাম বাবু জীবনচন্দ্রের মত অত বেশী স্ত্রৈণ নয়; সুধাচাঁদ নিমচাঁদের মত উগ্রপন্থী নয়। তার মুখে নিমচাঁদের মত ইংরেজী কথা বসালেও তাকে নকুলেশ্বর বা কেনারাম ডেপুটীর মত হাস্যাস্পদও করা হয়েছে। আশুতোষ অটলের মত সাহস ক'রে হেমাঙ্গিনীকে বাড়ীতে আনতে সাহস করে নাই। সধবার একাদশীর প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের সঙ্গে একাদশীর পরাণের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক তুলনীয়। তবে মদ খাওয়া এবং না খাওয়া নিয়ে অটল ও নিমচাঁদ যা বলেছে তার বিপরীত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে আশুতোষ ও সুধাচাঁদ। 'জানি,' 'বাব্বী' দু নাটকেই পাওয়া যায়। কুমুদিনী ও প্রেমোলাঙ্গিনীর মধ্যে প্রেমো-লাঙ্গিনী বেশী সহিষ্ণু। তাদের চরিত্র নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল অথচ কোন কলুষতা তাদের স্পর্শ করে নাই। তবুও এ দুজনের সম্বন্ধে নিমচাঁদ এবং সুধাচাঁদ যথাক্রমে জীবনচন্দ্র ও আত্মারাম বাবুর প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করে।

৪র্থ অঙ্কে একাদশীর পারণে অন্তঃপুরস্থ রমণীদের রসিকতার এক সুন্দর চিত্র আছে। এখানে অশ্লীলতার সম্ভাবনাকে লেখক পরিহার ক'রে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রহসনটিতে দুটি গান আছে। অভয়ের অনুরোধে হেমাঙ্গিনীর গান ( রাগিণী পিলু তাল যৎ )

আজ কি সুখের নিশি, দেখ যেন না পোহায়।

আশুতোষ বাবুর বাগানের বৈঠকখানায় আশুতোষ, সুধাচাঁদ ও অভয় এই তিন ইয়ারের সাহচর্যে সে যে সুখের নিশির অবসান চাইবে না এতে আশ্চর্য কি? আদিরসের উদ্বোধক হিসাবে এই গান হেমাঙ্গিনীর মত দেহ পসারিণীর কণ্ঠেই শোভা পায়। আবার কাওয়ালীতে অভয়ের গীত—

We are passionate প্রাণ, তোমারি কারণ।
আমাদের Leave করে, অন্যে কেন মন॥
Love করবার কালে, We have done many play
Why then ভুলে গেলে, ও বিধুবদন॥

ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় গানটি বিশেষতঃ 'মুস্তফী সাহেব কা পাকা তামাশা'র মত চমৎকার।

২২। সুধা না গরল? শ্রীজ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার।

মদ্যপান ও বেশ্যাগমনের বিরুদ্ধে জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের সুধা না গরল? নাটক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী—বিধুবাবু, রামেশ্বর, শম্ভু, গণেশ ডাক্তার প্রভৃতি মদ্যপায়ী। প্রগতিশীল উকিল বিধুবাবু বয়স্কা বিধবা ভগ্নীর বিবাহ দিলেও স্ত্রীর বিষয়ে রক্ষণশীল। গণেশ ডাক্তার বোসেদের বড় বৌয়ের প্রতি আসক্ত। শম্ভুর স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ নাই। মদ্যপানের আনুষঙ্গিক দোষে সকলেই বেশ্যা-সক্ত। বিধুবাবু লিবরে মারা যায়, গণেশ ডাক্তার মার খেয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে যায়। শম্ভুর চরিত্র সংশোধন করতে সরোজিনীর সই কুমুদিনী তার দাদা রাজেন্দ্রকে অনুরোধ করে। রাজেন্দ্র ব্যর্থ হয়। সরোজিনী তার স্বামী শম্ভুকে মদ ছাড়তে অনুরোধ করে কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। বেশ্যা বসন্ত কলকাতায় নাচতে যাবে ব'লে শম্ভু সরোজিনীর রত্নচূড় দুখানি চাইলে সে দিতে রাজি না হওয়ায় তাকে লাথি মারে এবং গালাগালি দেয়। সরোজিনী চাবি ফেলে দিলে সে রত্নচূড় নিয়ে চ'লে যায় এবং দুঃখে, অপমানে জর্জ্জরিত হ'য়ে সরোজিনী গলায় ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করে। *

জাতীয় মেলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি অর্পিত। চার্লস জনসন এবং শেক্ষপীয়রের উদ্ধৃতি নাটকটির বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়। প্রথমে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নান্দী, নান্দ্যন্তে সূত্রধার ও নটের প্রবেশ এবং তাদের সংলাপের মাধ্যমে নাটকের সূত্রপাত। অভিনেতারা অভিনয়কালে মদ্যপান করায় নট অনুযোগ করে; সূত্রধার এ বিষয়ে আশ্বাস দিলেও সে বিশ্বাস করে না। সূত্রধার বলে, 'বিশ্বাসের জন্যেই এই নাটকখানি অভিনয় করা; কারণ যাঁরা সুরাপানের বিষময় ফল দেখিয়ে সুরাপান

* শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন গ্রন্থের ২৯৫ পৃষ্ঠায় 'পরিশেষে স্ত্রীকে লাথি মারে এবং তাহাতেই শম্ভুর স্ত্রী মারা যায়।' লেখা আছে। কিন্তু আমি যে গ্রন্থটি দেখেছি তাতে আত্মহত্যার বিষয় আছে।

নিবারণের জন্য অভিনয় কচ্চেন, তাঁরা কখন সুরাপানরূপ পাপে লিপ্ত হবেন না।' তবে নট অভিনয় করতে সম্মত হয়। তাদের প্রস্থানের পর নাটকীয় চরিত্রের ( বিধুবাবু, রামেশ্বর ) উপস্থিতি।

নাটকটির তিনটি অঙ্কের প্রত্যেকটিতে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। স্থান ও কালঐক্য রক্ষিত হ'লেও গতিঐক্য ক্ষুণ্ণ। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক বাদ দিলেও নাটকের কোন ক্ষতি হ'ত না। দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীর প্রভাব এতে স্পষ্ট। সরোজিনীর আত্মহত্যার প্রভাব মদনমোহন মিত্রের মনোরমা নাটকে লক্ষ্য করা যায়। শম্ভু মন্মথর সঙ্গে তুলনীয়। উভয়েব কার্যকলাপ এবং ভাষা প্রায় অভিন্ন।

রামেশ্বর ও বিধুবাবু ব্রাহ্মসমাজে যায় অথচ মদ্যপান করে এবং বেশ্যার সঙ্গে আমোদও করে। বিধুবাবু ৪০ বৎসরের বিধবা ভগ্নীর বিবাহ দেয়, স্ত্রীকে মদ্যপানে অভ্যস্ত করায় অথচ স্ত্রীকে 'দশ ইয়ারেব কাছে বসে ইয়ারকি দিতে allow' করে না। শম্ভু ইংরেজী শিক্ষিত যুবক কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। এ ভাবে চারিত্রিক বৈপরীত্য দেখিয়ে নাট্যকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবিনাশ ও রাজেন্দ্র এ দুজনকে বেশ ভাল লাগে। বিশেষতঃ রাজেন্দ্রের 'পিতার ইচ্ছাতে বিবাহ পাতিব্রত্যের কণ্টকস্বরূপ, ভ্রূণহত্যার আকর, বেশ্যাসক্তির হেতু ও নানাবিধ কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক।' —এ কথা আমাদের সামাজিক দিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মদ্যপান বন্ধ না হ'লে সরোজিনীর মত কত পতিব্রতা আত্মহত্যা ক'রে সকল জ্বালা জুড়াত তার সংখ্যা নাই। শম্ভু তাকে বেশ্যা হ'য়ে নাম লেখাতে বলে। তাতে চৌদ্দ আইনের বিপত্তির কথাও তৎকালীন রীতির পরিচয়।

১/২ এ কমল মাষ্টারের এক ইয়ার এসে ভাঁড়ামি করে। নিম্ন শ্রেণীর হাস্যরস সেকালের অনেক লোকে পছন্দ কর্ত ব'লে পরিবেষিত। কৃষ্ণযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির প্রভাবও এতে আছে। ২/৩ এ শম্ভুর মুখে বিদ্যাসুন্দরের উদ্ধৃতি শুনি। আর ইয়ং বেঙ্গলদের মুখে ইঙ্গ বঙ্গ ভাষা লেগে থাকত। বিধুবাবুর ভাষা 'Reformation না হলে native দের ভাল হবে কিসে?' তার মতে 'Prejudice গুলো root out না কল্লে দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গল হবে না।'

নাটকটিতে কেবল একটি গান আছে। ২/৩ এ বিধুবাবুর বৈঠকখানায় গোলাপীর বসন্তবাহার রাগিণী এবং যৎ তালে গানটি জমবে ভাল।

নাটকটির শেষে সরোজিনী চিঠিতে স্বামীকে সুরা সুধা না গরল জানবার জন্য অনুরোধ করেছে। এই হিসাবে নামকরণ সার্থক। সরোজিনীর আত্মহত্যার পূর্বে দীর্ঘ সংলাপে তার মনোভাব যতই ব্যক্ত হোক—এ যেন তার ধীর স্থির ভাবে সব কিছু গুছিয়ে আত্মহত্যা। যে স্বামীর জন্য সে আত্মহত্যা করল সে স্বামীর কোন পরিবর্তন হল না! এটিই মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির কুফল।

১৩। সাক্ষাৎ দর্পণ—শ্রীগ্রন্থকার।

'যে সকল ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচার ব্যবহার বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে প্রচলিত আছে, এই 'সাক্ষাৎ দর্পণ' নাটকে তাহাই বর্ণন করিলাম।' —বিজ্ঞাপনে লিখিত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির 'সাক্ষাৎ দর্পণ' নাটক শ্রীযদুনাথ রায় কর্তৃক সন ১২৭৮ সালে মুদ্রিত। মদ্যপান, বেশ্যাগমন ও ব্যভিচার কেন্দ্রিক গ্রন্থটির কাহিনী এ রকম—হরিহরবাবু তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা নলিনীর সঙ্গে হলধর বাবুর পুত্র কেদারের বিবাহের কথা ব'লেও সে মদ্যপায়ী ও চরিত্রহীন হওয়ায় বিবাহ দেন নাই। তিনি হরিশবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র সুবোধের সঙ্গে নলিনীর বিবাহ দিতে চান। জ্যেষ্ঠপুত্র কালীকুমার মদ্যপায়ী এবং স্ত্রী কুসুম থাকলেও সে বেশ্যাসক্ত ব'লে হরিশবাবু তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। সুবোধ সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক। কালীকুমার, কেদার এবং রামনারায়ণের পুত্র দোয়ারি তিনজনেই মদ্যপায়ী এবং বেশ্যাসক্ত। সুবোধ দোয়ারির স্ত্রী কামিনীর প্রতি আসক্ত। সে আবার নলিনীর দিদি। কামিনীও তাকে ভালবাসে। সুবোধ নলিনীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে এবং হরিশবাবু তাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেন। সুবোধ দাসী লক্ষ্মীর সাহায্যে কামিনীকে চিঠি দেয় কিন্তু চিঠিটি কালীকুমারের হস্তগত হয়। সে ঈর্ষাবশে দোয়ারিকে সমস্ত ব'লে দিলে কামিনীর সঙ্গে সুবোধের মিলনকালে দোয়ারি তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। কামিনীর ঐ অবস্থা দেখে সুবোধ বের হ'য়ে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে দোয়ারিকে আঘাত করে এবং শেষ পর্যন্ত কামিনীর বিরহে এবং অন্যান্য লোক

আসছে বুঝতে পেরে সে ঐ তলোয়ার দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ইয়ংবেঙ্গলদের সম্বন্ধে হরিশবাবুর উক্তি 'মাসে মাসে স্কুলের মায়িনে দেও, নতুন নতুন্ বই দেও, কাপড় দেও, জুতা দেও, চাদর দেও, তারপরে ছেলে বড় হলো, হয়ে মদ মাংস খেতে আরম্ভ কল্লেন।' —বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অনেক ইংরেজীশিক্ষিত যুবক খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে চায়। কেদার একবার খৃষ্টান হ'তে গিয়েছিল। আবার অনেকে ব্রাহ্মসমাজেও যেত। সুবোধ ঐ রকম। কেশববাবু খৃষ্টানের মত সাজ পোষাক পরেন ব'লে তিনি খৃষ্টান হয়েছেন এ রকম সন্দেহ কালি ও দোয়ারি করে। কেশববাবু এবং ব্রাহ্মধর্ম হওয়ায় এখন পাদ্রীদের সুবিধা হচ্ছে না, আর বেশী কনভার্ট হচ্ছে না—এটা সত্য।

তৎকালীন থিয়েটারের মধ্যে জোড়াসাঁকোর থিয়েটার বেশ জমকাল ছিল ব'লে কালির মুখে শোনা যায়। আবার তখনকার নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দোয়ারি এবং কেদারের মুখে যা শুনি তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ নট নটীর আমদানি, কবিতার বকুনি প্রভৃতি লক্ষণ সত্যই পাওয়া যায়।

অসম বিবাহই যে বেশ্যাসৃষ্টির কারণ তা আমরা হরকালির মুখে শুনি। তার উক্তি 'বিয়ে হলো একটা বুড়োর সঙ্গে। বচর ফিরে আস্‌তে না আস্‌তেই বুড়ো গেল মরে।' আবার স্ত্রী থাকলেও যে অনেকে বেশ্যাসক্ত হয় তাও তার কথায় বুঝা যায়। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কামিনী সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতিনিধিরূপে সমাজে তাদের স্থান নির্দেশ ক'রে বলে, "আমাদের যত দুঃখু সমুদয় কাগচে লিখ্‌ব। আমাদের মা বাপ যার তার সঙ্গে বিয়ে দেন, আমাদের ইচ্ছে আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন না। শশুর বাড়ীতে আমাদের চাকরাণির মত ব্যবহার করে। আমাদের কখন বাইরে বেরুতে হলে আমাদের উপহাস করে······বিধবাদের বনের জন্তুর চেয়েও কষ্ট দেয়······আমাদের এই সকল দুঃখু যখন দেশ দেশান্তরে জানাব, তখন কি কেউ আমাদের দুঃখু দূর করতে চেষ্টা কর্ব্বে না?" এটি তার পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ। তারকবাবু ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি পছন্দ করেন কারণ পাত্রের বয়স চব্বিশ ও পাত্রীর

বয়স চোদ্দ পনের ব'লে এই বিবাহে সুখলাভ হয়।

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক এবং প্রথম তিন অঙ্কে দুটি-ক'রে এবং শেষ দুটি অঙ্কে তিনটি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। নাটকটির মূল বিষয় সুবোধের সঙ্গে কামিনীর অবৈধ প্রণয়। তা ৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে সূচনা হয়েছে। প্রথম দু অঙ্কে দোয়ারি, কালীকুমার ও কেদারের চরিত্রহীনতার বিষয় প্রকাশিত। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির কুফল দেখাতে নাট্যকার এক স্বতন্ত্র পথ দেখিয়েছেন। দোয়ারি কুৎসিত ও চরিত্রহীন ব'লে কামিনী সুবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুবোধের ন্যায় দুর্বোধ যুবককে সকলেরই চিনতে ভুল হয়। সে বিবাহিতা কামিনীর স্বামিসহবাসবঞ্চিত জীবন উপভোগ করে অথচ অনূঢ়া নলিনীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। তাকে পাষণ্ড অথবা বিড়ালতপস্বী বলা যায়। এদের মধ্যে কেদার অনেক ভাল। সে স্বাধীনচেতা। তার বেশ্যাগমনের সমর্থনে সে বলে, 'আমার স্ত্রী নাই যে অন্য স্ত্রীলোকের নিকট গেলে আমার স্ত্রীর প্রতি অনফেৎফুল হওয়া হবে, কিম্বা আমার স্ত্রী মনে দুঃখু পাবে। আর আমাদের মনে ন্যাচুরেলি যে সকল এ্যাপিটাইট্‌স্ আছে, তাদেরও স্যাটিশফ্যাকশান চাই। আর যদিও আমি অন্য স্ত্রীলোকের নিকট না যাই তথাপি আমার মনকে সম্পূর্ণরূপে মন্দ-ভাব থেকে বিরত রাখ্‌তে পারি না। আর আমার মতে মনে ভাবা আর কর্ম্ম করা প্রায় সমান।' এই হিসাবে তার বেশ্যাগমন সমর্থন করলেও বিবাহিত দেয়ারি ও কালী-কুমারের বেশ্যাগমন সমর্থন করা যায় না। মদ্যপায়ী কালীকুমার স্ত্রী কুসুমকে একদিন জোর ক'রে মদ্যপান করায় ব'লে তাদের বিচ্ছেদ। সুবোধের প্রতি ঈর্ষায় সে প্রতিশোধ নিতে প্রবৃত্ত। সুবোধের প্রতি বাহবা তার আত্মধিক্কারের নামান্তর মাত্র। 'আমার কামিনীও নেই কিছুই নেই। যদিও এক কুসুম আছেন বটে, আগে আগে কাছে গেলে একটু একটু গন্ধ পাওয়া যেতো; কিন্তু এখন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছেন।' তার মুখে এ কথা শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করি কুসুম শুকাল কেন তা কি সে একবারও ভেবেছিল? সুবোধ যে রকম দুশ্চরিত্র কুসুমের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল।

এই গ্রন্থে কেন্দ্রীয় প্রধান পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র হিসাবে সুবোধ এবং

কামিনীর নাম করতে হয়। হরিশবাবু নিজে ইংরেজী শিক্ষিত অথচ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। মদ্যপায়ী ও লম্পট পুত্র কালীকুমারকে ত্যাজ্য-পুত্র করলেও তিনি তাকে পুলিশের হাত হ'তে ছাড়িয়ে আনেন। কালী-কুমারের বিবাহ নিজে দিয়ে তার কুফল দেখে ও সুবোধও নলিনীর বিবাহ দিতে এত উৎসাহ কেন?

হরিহরবাবু কেদারের সঙ্গে নলিনীর বিবাহ দিলেন না কেন? মদ্যপায়ী ও চরিত্রহীন ব'লে না গহনা কম হওয়ার জন্য? কালীকুমার ত্যাজ্যপুত্র ব'লে সমস্ত বিষয় সুবোধের হবে এটিই কি তার আসল উদ্দেশ্য নয়?

যে কামিনী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তাকে স্বাগত জানাই আর যে কামিনী ব্যভিচারিণী তাকে আমরা ধিক্কার দিই। তবে মাতাল ও লম্পটের স্ত্রীর ব্যভিচারিণী হওয়াই স্বাভাবিক। বামসুন্দরীর মত সে ভাগ্য বা সমাজের বা নিয়তির খেলা ব'লে স্বীকার করতে চায় না। হরকালী, তার মা, লক্ষ্মী, ভব, নিমে চাকর প্রভৃতি গৌণ চরিত্রগুলি বেশ উজ্জ্বল।

২/২ এ হর, কালীকুমার, দোয়ারি প্রভৃতির যে সব গান আছে তাতে রাগিণী এবং তালের উল্লেখ আছে। বেশ্যার সঙ্গে আমোদে গানগুলি উপযুক্ত।

নাটকটিতে 'অনেকস্থলে ইংরাজিকথা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে আধুনিক অবস্থাতে এ দেশের লোকেরা যে প্রকার কথা কহিয়া থাকেন, কথিত নাটকে তাহার যথার্থ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য।' —ব'লে নাট্যকার জানিয়েছেন। ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারে লেখকের দক্ষতা প্রশংসার যোগ্য।

প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বন ক'রে তিনি গ্রন্থরচনা করেন নাই বটে কিন্তু 'সাক্ষাৎ দর্পণ' বিশেষ কোন সামাজিক ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচার ব্যবহার প্রতিফলিত করে নাই। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি প্রথমে মূল বিষয় মনে হ'লেও সুবোধ ও কামিনীর ব্যভিচার এর মুখ্য বিষয় হ'য়ে গেছে। এটি সামাজিক দোষ নয়—ব্যক্তি বিশেষের দোষ। যদি কামিনী, দোয়ারি, কেদার, কালীকুমার, কুসুম প্রভৃতির বিষয়ে

'সাক্ষাৎ দর্পণ' হয় তা হ'লে এটি সচরাচর উপাখ্যান অবলম্বনে ত হ'য়ে যাবে।

দোয়ারির মাধ্যমে নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস এবং কামিনী ও সুবোধের মৃত্যুতে বীভৎস রসের পরিবেষণ করা হয়েছে। কামিনীর মৃত্যুতে আমাদের যদিও কিছু সহানুভূতি আসে, সুবোধের আত্মহত্যা আমাদের মোটেই নাড়া দেয় না। নাটকটিতে সধবার একাদশীর প্রভাব স্পষ্ট। আবার এর প্রভাব জামাই বারিকের উপরও কম নয়।

২৪। গিরীবালা—শ্রীফ্ল্যাটারার

'শ্রীফ্ল্যাটারার কর্তৃক প্রণীত' গিরীবালা নাটক ১২৭৮, ১লা ভাদ্র প্রকাশিত হয়। লেখক বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন—'বারাঙ্গনাদিগের বিনা-শার্থে ক্রমাগত তুইমাস একটী নূতন সভ্যা বারাঙ্গনার সঙ্গে মিসিয়া অতি যত্ন সহকারে সকল গুপ্ত ও প্রকাশ্য কার্য্যগুলি সংগ্রহ করিয়া এই "গিরী-বালা" নামধারী ক্ষুদ্র প্রহসনটি জনসমাজে প্রকাশ করিলাম।' এর কাহিনী এ রকম—রাজা গোলকদাস তাঁর কন্যা গিরীবালার বিবাহের বিষয়ে রাণী, দাস ও মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অন্য পাড়ার তিনুর সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব হ'তেই গিরীবালার প্রাণধন দে নামে এক ব্যক্তি উপপতি। সুতরাং সে এই বিবাহে সুখী না হ'য়ে প্রাণধনের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়। এক অভিসারের সময় প্রাণধনের সঙ্গে বড়-দাদা নামে এক ব্যক্তির ধাক্কা লাগে। প্রাণধন ঐ কথা গিরীবালাকে বললে সে তার প্রিয় দাসী ভূতিকে ডেকে প্রাণধনের ইয়ার সামপ্রসাদ ও রাম-প্রসাদকে ডেকে আনে এবং প্রাণধন তাদের সাহায্য চায়। অন্যদিকে বড় দাদা, মেজোদাদা প্রভৃতিও প্রাণধনের বিরুদ্ধে হারুবাবু, ভূদেববাবু ও ইয়ার রঘোবীরের সঙ্গে পরামর্শ করে। উভয় দলের নির্দিষ্ট দিনে যুদ্ধ বাধলে প্রাণধনের দল হেরে যায়। দাদাদের সঙ্গে গিরীবালার মীমাংসা হয় এবং মেজোদাদা তাকে প্রাণধনের সংসর্গ ছাড়তে অনুরোধ করে; কারণ সে নেশাখোর। গিরীবালা তাতে অসম্মত হ'লেও সে দাদাদের কথা শুনবে এবং তাদের সঙ্গে বিবাদ করবে না বলায় তারা সন্তুষ্ট হয়।

নাটকটির বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সার্থক নয়। গিরীবালাকে কুলটা-

রূপে চিত্রিত করা হ'লেও বারাঙ্গনারূপে দেখান হয় নাই। বারাঙ্গনা গমনের দোষ যে ধন, মান, এমন কি প্রাণ বিনাশ পর্যন্ত হয় তারও বিবরণ এখানে নাই। লেখক ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন কেন বুঝা গেল না। বারাঙ্গনার সঙ্গে ছ মাস ছিলেন বলে কি? গিরীবালা এর নায়িকা। তার নামানুসারে গ্রন্থটির নাম সার্থক। তবে একে নাটক না বলে প্রহসন বলাই যুক্তিযুক্ত।

গ্রন্থটির ছুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে চারটি এবং দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক রাজার নাট্যশালায় রাজা ও অপরাপর সভাসদ আসীন—এই ভাবে আরম্ভ ক'রে নটনটী প্রভৃতির দ্বারা নাটকের বিষয়বস্তু আরম্ভ এক নতুন রীতি। ১/১ এ রাজার নাট্য-শালায় কাহিনী আরম্ভ কিন্তু এতে মূল বিষয়ের কোন কথা নাই। ১২ এ রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক প্রভৃতির চোর ধরার প্রসঙ্গে কথা হয় এবং প্রাণ ধন, রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদের জরিমানা হয়। ১/৩ এ গিরীবালার বিবাহ, ১/৪ এ গিরীবালা ও প্রাণধনের গোপন মিলন। ২ ১ এ প্রাণ ধনকে জব্দ করতে দাদাদের পরামর্শ, ২ ২ এ উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও দাদাদের জয় এবং ২/৩ এ দাদাদের সঙ্গে গিরীবালার বোঝাপাড়া।

রাজা, মন্ত্রী, রাজসভা প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের জ্ঞানের অভাব লক্ষণীয়। মন্ত্রীকে বিদূষক জানে না? মন্ত্রী তাঁর কন্যার বিবাহে চিন্তিত হ'লেও রাজা তাঁকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবেন না কেন? চোর সভাস্থলে অপমান করতে সাহস পায় কি ক'রে? গিরীবালা পিতাকে বলে, 'তোমরা বিবাহের স্থির করে এই বেলা বিয়ে দিয়ে ফেল।' —একথা কোন কন্যা পিতাকে বলতে পারে কি না বিচার্য। 'তিনু বামুন' এর দাস পদবী কি করে হয়? দাসের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ বিষয়ে পরামর্শ করাও কি সম্ভব? রাজা ও রাজকন্যার শয়নাগারের পাশে গোশালা! সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতেও থাকে কিনা সন্দেহ। ২/১ এ 'দাদাদের রিডিং এণ্ড ইয়ারকি রুম', General আড্ডা বুঝাতে G. আড্ডা এবং General ওস্তাদ বুঝাতে G. ওস্তাদ প্রভৃতির ব্যবহার হাস্যকর। রাজারাজড়ার ব্যাপারে যুদ্ধ না থাকলে মানাবে না ব'লেই কি নাট্যকার ছু দলে যুদ্ধ বাধিয়েছেন? মেজোদাদা গিরীবালাকে

খারাপ হ'য়ে যাওয়ার ভয়ে প্রাণনাথকে ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু গিরীবালার কক্ষে প্রাণনাথ যখন আসে তখন যে সে খারাপ হয়েগেছে সে কি এটি জানে না? পক্ষান্তরে গিরীবালা প্রাণনাথের সঙ্গ কামনায় যা বলেতা সম্ভব কি? শেষ পর্যন্ত নাট্যকার আনন্দিত হয়ে—

'পূর্ব্বদোষ ঢেকে গিয়ে, এক দোষ রয়ে গিয়ে,
মিলিতেছে বৈকুণ্ঠের শোভাতে।' —লিখলেও আমরা

'পূর্ব্বদোষ ঢেকে' যাওয়া বুঝলাম না। তার উপর পৌরাণিক নাটকের প্রভাবে প্রভাবিত হ'য়ে নেপথ্যে গীত—

ইহাতে মোহিত হয়ে বনপুষ্প করে লয়ে,
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে বিমানেতে।
অপ্সরিরা নৃত্ত কোরে, কিন্নরেরা সঙ্গিত স্বরে,
মোহিত হোতেছে এই সভামণ্ডলীতে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে কোন্ সভামণ্ডলীতে পুষ্পবৃষ্টি, অপ্সরীর নৃত্য ও কিন্নরের গীত হচ্ছে? যদি এটি রাজসভা হয় তা হ'লে দুশ্চরিত্রা কন্যার গর্বে গর্বিত রাজা আনন্দে জামাতাকেও আমন্ত্রণ করবেন না? সামাজিক নাটকে দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, অপ্সরীর নৃত্য এবং কিন্নরের গীত?

নাটকীয় কাহিনী দৃঢ় সংবদ্ধ না হওয়ায় নানা ত্রুটি ঘটেছে। গ্রন্থকার তাঁর পরিচিত কোন গিরীবালার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবুও বিবাহ বিষয়ে কন্যার মতামত গ্রহণ না করলে অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক দোষ ঘটে এটি এই নাটকে স্পষ্ট। গ্রন্থটিতে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব আছে। কয়েকটি গর্ভাঙ্কে বকাসুরের প্রবেশ এবং তার বিশেষ সংলাপ-বিশিষ্ট পরিচয় আছে। গানগুলিতে রাগিণী এবং তালের উল্লেখ থাকায় নাট্যকারের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। নটের রাগিণী পরজ এবং তাল ঢিমে তেতালায় এবং নটীর রাগিণী ঝিঝিট, তাল আড় খেম্‌টায় গানে গতানুগতিক রীতি অনুসৃত। তাড়াতাড়ি আসার সময়ে প্রাণধন ও বড়দাদার ধাক্কা লেগে শব্দ হওয়ায় গিরীবালা পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'না পিতা কোই কিছুই না; আমাদের গোরুটা বুঝি ভয় পেয়ে ছুটপাট্ কোরে উঠেছে, ওসব কিছুই নয়, তুমি শোও।' এ রকম ঘটনা কাদম্বিনী ও বিধবাবিলাস নাটকে পাওয়া যায়।

১৫। কুলপ্রদীপ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে।

মদ্যপান বিষয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে প্রণীত 'কুলপ্রদীপ নাটক' সন ১২৭৮ সালে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। এর কাহিনীতে পাই—বংশ রক্ষার জন্য সন্তান কামনায় বৃদ্ধ সদানন্দ ঘোষ দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং যজ্ঞাদি দৈবকর্মে মন দেন। সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধে দ্বিতীয়া স্ত্রী মালতী গর্ভবতী হয় এবং সপত্নীবিদ্বেষবশতঃ প্রথমা স্ত্রী পাগল হ'য়ে যায়। মালতীর পুত্রের নাম রাখা হয় কুলপ্রদীপ। তাকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা হয় এবং দীননাথ বসুর কন্যা চন্দ্র-কামিনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিন্তু সংসর্গদোষে কুলপ্রদীপ মদ খেতে শিখে। সদানন্দ তাকে সুপথে আনতে না পারায় দুঃখে শয্যাশায়ী হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুতে কুলপ্রদীপ আরও অধঃপাতে গেল। একদিন সে যখন ইয়ারদের নিয়ে মনোহর কুসুমোদ্যানে মদ্যপান করছিল তখন তাদের একজন পুষ্করিণীতে প'ড়ে মারা যায়। শাস্তির ভয়ে সে ভাগীরথীতে ডুবে মরতে যাওয়ায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাকে আশ্বস্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকামিনীর সঙ্গে তার মিলন হয়।

নাটকটিতে সাতটি অঙ্ক আছে। প্রথম হ'তে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে ৪টি, ষষ্ঠ অঙ্কে ৫টি গর্ভাঙ্ক আছে কিন্তু সপ্তম অঙ্কে কোন গর্ভাঙ্ক নাই।

কাহিনীর ভিন্নমুখিতা নাটকটিতে এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। সদানন্দ ঘোষের বৃদ্ধ বয়সে সন্তান-কামনায় দ্বিতীয় বিবাহ এবং সপত্নীকলহ ইত্যাদি নিয়ে নাটকটি আরম্ভ করায় আমাদের মনে হবে এটিই বিষয়বস্তু। কিন্তু মদ্যপান ও তার কুফলই মূল বিষয় হ'য়ে গেল। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রমাপতির মুখে মদ্যপানের কুফল বর্ণিত হওয়ার পর হ'তেই মদ্যপান বিষয় এসে উপস্থিত। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিলে ভাল হ'ত।

কুলপ্রদীপ নায়করূপে চিত্রিত। তার জন্মের পূর্ব হ'তেই তাকে অলৌকিকত্বে মণ্ডিত করা হয়েছে। যে পিতার মৃত্যুর কারণ, মাতার চরিত্রে সন্দিগ্ধ, স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণ সে বন্ধুর মৃত্যুতে ট্রান্সপোর্টের ভয়ে আত্মহত্যা করতে যাবে ব'লে মনে হয় না। অনুতপ্ত কুলপ্রদীপ

নিজের নামের প্রতি ধিক্কার দিয়ে নিজেকে কুল নষ্ট করার জন্য জন্ম বলেছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের পূর্বে কুলপ্রদীপকে আ.র। দেখতে পাই না। তার শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ব'লে হরগোবিন্দ তাকে 'ওয়াইন ইউজ' করতে বলে। কুলপ্রদীপ তাতে আপত্তি জানায়। কিন্তু শেষ পযন্ত হরগোবিন্দের 'ওষুদের মোতোন' খেতে সম্মতি দেয়। তার মদ্য-পান নিয়ে নাটক অথচ সে বিষয় সংক্ষিপ্ত এবং পারম্পর্যহী ন।

চন্দ্রকামিনী নায়িকা। তাকে নেপথ্য বিশেষণে বিশেষিত করলে ভাল হয়। সুমতি এবং মালতী ছাড়া আর কেউ তার বিষয়ে কথা বলে না। যে নায়িকা তাকে একেবারে শেষ অঙ্কে এনে দুঃখ প্রকাশ ও অজ্ঞান করলে চলবে কি? গদ্যে পদ্যে দুঃখপ্রকাশ ক'রে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে সস্তায় বাজিমাৎ করা যায় না। নিদারুণ শোকেও তার আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ ভাল লাগে না। বীরভূমনগরে মনোহর দত্তের বাড়ীতে তাদের মিলন ঘটিয়ে নাট্যকার মিলনাত্মক করলেন বটে কিন্তু চন্দ্রকামিনীর পিতা দীননাথ বাবুর সঙ্গে মনোহর দত্তের কি সম্পর্ক বুঝা গেল না। এমন কি নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের তালিকায় মনো-হর দত্তের স্থান নাই।

সদানন্দ, কৃষ্ণকান্ত, হরগোবিন্দ, কবি প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র এবং আদুরী, কুসুম, গোলাপী, যামিনী, কামিনী প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্র গৌণ হ'লেও বেশ পরিস্ফুট। মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধে বহুজন বলেছে। এমনকি সুমতীও বিদ্বেষ ভুলে সপত্নী পুত্রের মদ্যপানের বিষয়ে চিন্তিত হয় এবং মালতীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার সঙ্গে সদ্ভাব করে।

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দীননাথ বসুর অন্তঃপুরে গোলাপী, কুসুমী, যামিনী ও কামিনীর রসিকতা বেশ উপভোগ্য। সেকালের সামাজিক রীতির এটিও আর এক দিক।

ষষ্ঠাঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মনোহর কুসুমোদ্যানে কুলপ্রদীপ, হর-গোবিন্দ, কান্তিরাম এসে উপস্থিত হ'লে চারজন ইয়ারের রাগিণী সিন্ধু তাল যৎ এ গীতে এবং শ্যামের রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান ঠেকায় দ্বিতীয় গীতে কুলপ্রদীপের মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত আছে। সঙ্গীতধর্মী সংলাপ মালতী, সুমতী, জগন্নারায়ণ, কবি প্রভৃতির মুখে শুনি।

এমন কি সদানন্দের মৃত্যুকালেও পয়ারে মনোবেদনা প্রকাশিত—

যাগযজ্ঞাদি হোমাদি করিয়া অনুষ্ঠান।
হয়েছে কুলের দীপ এই কুসন্তান॥

আত্মহত্যা করতে গিয়ে ত্রিপদীতে কুলপ্রদীপ অনুশোচনা করে—

শুন শুন ওহে কাল, নাহি তব কালাকাল,
ওহে কাল কর আগমন।

গদ্যে পদ্যে মনোভাব প্রকাশ সেকালের যাত্রা রীতির প্রভাব।

২৬। ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে—হরিশ্চন্দ্র মিত্র

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' প্রহসনে মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির ভিন্নতর চিত্র প্রকাশিত। এর কাহিনীতে আমরা জানি—রসিকবাবু ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখে ইংরেজদের অনুকরণে ইংরেজী বুলি, মদ্যপান প্রভৃতিতে অভ্যস্ত। সে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী প্রমীলাকে ত্যাগ ক'রে বারবনিতা বুঁচির প্রতি আসক্ত। স্ত্রীর গলা টিপে সাতনরী হার এবং নত নিয়ে সে আমোদ করতে যায়। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড সেই বুঁচি অন্য পুরুষকে নিয়ে আমোদে মগ্ন। রসিকবাবু তাদের বিঘ্ন সৃষ্টি করলে বুঁচি তাকে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করিয়ে পাহারাওয়ালা ডেকে ধরিয়ে দেয়।

রসিক, মোহন, মাখন প্রভৃতি বাবুর দল গতানুগতিক রীতিতে সৃষ্ট। তবে প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মাখন বাবু যখন 'এয়ার বিনা দেল ফাঁক' এ কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তখন আমরা মদ্যপান ও বেশ্যাগমনে ইয়ার বন্ধুর মূল্য বুঝতে পারি। রসিকবাবু নায়ক এবং প্রমীলা নায়িকা। প্রমীলা ও যামিনীর সংলাপে আমরা বুঝতে পারি না বাল্যবিবাহ অথবা ইংরেজী শিক্ষা কোনটি বেশী ক্ষতিকারক হয়েছিল। রসিকবাবু প্রমীলার অলঙ্কার নিলে সে চিৎকার করে উঠলে রসিকবাবু বলে, 'তোমরা না বল, সোমত্ত বৌ তা ও গুখোরবেটী এখনো কচী খুঁকী রয়েছে, আমি কেমন করে ঘরে থাকি?' এ কথা প্রমীলার শেলতুল্য হ'লেও সে প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করতে পারল না। এর উপর গয়না লুকিয়ে রাখার মিথ্যা অভিযোগে ননদ তাকে তিরস্কার এমনকি শারীরিক নির্যাতনও করেছে। এ রকম জীবন নিয়ে প্রমীলার মত কত কুলবধূ

উনিশ শতকে বেঁচেছিল তার সংখ্যা নাই।

সমাজ সংস্কার প্রহসনের উদ্দেশ্য ব'লে এই প্রহসনটি বেশ উল্লেখযোগ্য। নামকরণও সার্থক। এতে দুটি অঙ্ক এবং প্রত্যেক অঙ্কে দুটি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। তবে ভ্রমক্রমে দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্কেই দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক লেখা আছে। রসিকবাবুর বার বাড়ী অংশটি প্রথম গর্ভাঙ্কে ও গল্লার পথ, কিয়দ্দূরে বঁচির বাড়ীর অংশটি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য গর্ভাঙ্ক বানান গর্ব্ভাঙ্ক লেখা আছে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রসিকবাবুর পিতা ও পিতৃবন্ধুদের সম্বন্ধে বক্তব্য ' যেমন একটা শেয়াল হোয়া হোয়া করে উঠ্লে পালের সবগুলই হোয়া হোয়া করে উঠে, তেন্নিতর য বেটা এসে জুটেছিল, সববেটাই যেন কলকাতার কেশব সেন আর ডব সাহেব হয়ে বক্তৃতার বার ঝাড়তে লাগ্লো।' —শুনলে আমাদের হাসিও আসে দুঃখও পায়। প্রমীলা সমাজ সম্পর্কে আলোকপাত করে—'আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে সবই ছিল, স্বয়ম্বরাও ছিল, বিধবা বিয়েও ছিল, মনমেলাও ছিল, এক জাতের মেয়ে আর এক জাতের বরকেও বিয়ে কত্তে পাত্ত। পণ পেলে এখানকার অনেক মা বাপ, কানাই হোক আর কুজই হোক, মেয়েটা সুখে থাকুক বা না থাকুক একটা যেমন তেমন বরের হাতে সোঁপে দেয়।' সেই অবস্থায় তার দুঃখ বর্ণনাতীত। হিন্দু যৌথ পরিবারে ননদ এক তাজ্জব জীব। চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মাখনবাবু, রসিকবাবু প্রভৃতি গান গেয়ে আনন্দ করতে থাকে। এই গানগুলি চরিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। ২/২ এ রসিকবাবু ভালবাসার গান গেয়ে বঁচির ভালবাসা পেতে চায়। কিন্তু বেশ্যার ভালবাসার স্বরূপ রসিকবাবু না জানায় বঁচির— যামিনী অধিক হল, এল না সে গুণমনি
তাহার বিরহে প্রাণ বাঁচে না গো স্বজনি !

এ গান তার উদ্দেশ্যেই ব'লে মনে করেছিল। বারবার ডাকাডাকিতেও যখন বঁচি দরজা খুলে না তখন রসিকবাবু রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী তাল-জত এ—

ঘরে আছ কি মরেছ রে প্রাণ কপাট খুলে দেও

আমি তোমার পুষ্যপুত্র এসে খবর নেও। —গান ধরে। এতে একদিকে হাসি অন্যদিকে অশ্রুর পরিচয় আছে। সঙ্গীত যোজনায় গ্রন্থকার বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

কয়েকটি বাংলা প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার বেশ সার্থক হয়েছে। প্রমীলার 'থাকতে গরু বয় না হাল, তার দুঃখ চিরকাল,' ও 'জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডাইন,' যামিনীর 'সিন্নি দেখে এগোয়; আবার কোৎকা দেখে পেছোয়।' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রসিকবাবুর মুখে 'থ্যাঙ্ক ইউ,' 'ওল্ড ফুল,' প্রভৃতি ইংরেজী বুলি এবং 'হাম কিস্‌কা তোয়াক্কা রাখতে?' —প্রভৃতি ভাঙ্গা হিন্দী কথা ব্যবহারে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে।

গ্রন্থটির শেষে নেপথ্য ভাষণ শোনা যায়—

বাইরে খায় নিত্য ঝাটা, গায় ফোস্কা হয় না।

বাড়ীতে ফুলের টোকা, তাও গায় সয় না।

ঘরে আছে সতীলক্ষ্মী তারে মনে লয় না।

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে ইয়েকেই কয় না?

এতে নীতি উপদেশ ব্যক্ত হ'লেও মূল বিষয় সুপরিস্ফুট। তবে প্রথমেই গ্রন্থকার কবিবাক্য ব্যবহার ক'রে এবং তার অনুবাদ

ভগবতী ভারতীকে বানরীর মত।

ফিরিতেছে দ্বারে দ্বারে নাচায়ে নিয়ত। —লিখে উদরপূর্তির উদ্দেশ্যে গ্রন্থরচনা করার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করায় আমরা দুঃখিত।

২৭। মনোরমা—মদনমোহন মিত্র।

১৭৯৩ শকাব্দাতে (১২৭৮ সাল, ৬ই চৈত্র) প্রকাশিত শ্রীমদনমোহন মিত্র রচিত মনোরমা নাটক মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির এক উজ্জ্বল চিত্র। এর কাহিনী এ রকম—চুনিলাল, হরিহর ও মতিলালের সঙ্গে মনোরমার স্বামী মন্মথ মদ্যপান করে। মন্মথ মনোরমাকে ভালবাসে না। তার বাক্স ভেঙ্গে গহনা নিয়ে চলে যায়। চুনিলাল মন্মথর বিষয় সম্পত্তি কোবালা নিতে চেষ্টা করে। সারদা, বসন্ত, কেদার সুরাপান নিবারিণী সভা ক'রে চুনি, হরি, মন্মথ প্রভৃতিকে সংশোধন করতে

চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়। মতিকে চুনি মেরে ফেলে। বসন্ত তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিছু করতে পারে না। মন্মথ চুনিবাবুর কথায় গহনার বাক্স সরাতে গিয়ে মেয়াদ খাটে। মনোরমা এ সংবাদ জানে না। যখন হরি লোকজন নিয়ে মনোরমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে আসে তখন মুক্তকেশী প্রকাশ করে। ফলে সে দুঃখে বিষ খেয়ে জীবনের অবসান ঘটায়।

মনোরমা কেন্দ্রীয় প্রধান নারী চরিত্র এবং তাকে কেন্দ্র ক'রেই নাটকটি রচিত। মদ্যপায়ী ও বেশ্যাগামীর স্ত্রীর আত্মহত্যা শেষ উপায়। মনোরমার পিত্রালয়ে যখন সে প্রিয়মিলনের আনন্দ উপভোগের জন্য মশ্‌গুল তখন তার স্বামীর রূঢ়, অভদ্র আচরণ বেশ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। তবে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার গ্রহণ করতে পারেন নাই। তার পিতা, সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি জীবিত থাকা অবস্থায় হরিহর লোকজন নিয়ে তাকে ধ'রে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে —এ রকম পরিকল্পনা যথাযথ নয়। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার পূর্বে বিধাতা, স্বামী, সুরা, মা, কেদার, গোলাপ, মুক্তকেশী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সংলাপে তার মনোবেদনা প্রকাশ পেলেও স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করেছে। এ বিষয়ে কামিনী নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মন্মথ এর নায়ক। সে শিক্ষিত, মদ্যপানে আসক্ত। তার মতে ইংরেজী পড়লে মন এক রকম প্রশস্ত হয়, মদে আর এক রকম হয়। সে শুধু মদ্যপানই করে না তার স্ত্রীর ঠান্‌দিদি এলোকেশীকে বিদ্যাসাগরের 'পতিরন্যো বিধীয়তে'—বিধান দেখিয়ে বশীভূত করতে হরিহরকে উৎসাহ দেয়। মনোরমার গহনা নিয়ে সে মনমোহিনীকে দিতে যায়। তার মদ্যপান পরিত্যাগের কথা নিতান্তই মাতালের প্রস্তাবের মত অবিশ্বাসযোগ্য।

চুনিলাল ঘোষ এক ক্রূর চরিত্র। তার প্রথমা স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। প্রথমার কন্যার মুখ দিয়ে গাঁজা উঠায় সে মারা গেছে। এ বিষয়ে দ্বিতীয়া কিছু খাইয়েছে ব'লে ভাবিনীর সন্দেহ। সপত্নীবিদ্বেষ ও মদ্যপান তার সংসারে অশান্তির কারণ। ৫ম অঙ্কে বসন্তের মুখের সংলাপ শোনার পর তার সম্বন্ধে আর কিছু জানতে বাকি

থাকে না। নাটকে তার শাস্তি দেখান হয় নাই; তবে পারিবারিক জীবনে কিছু প্রতিক্রিয়া তাকে সহ্য করতে হয়। তার 'ছোট গিন্নী' অন্যের প্রতি আসক্ত হ'য়ে তার ঋণ শোধ করেছিল।

নাটকটিতে ছ'টি অঙ্ক আছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ঘটনার চরম উন্নতি। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে কোন গর্ভাঙ্ক নাই। প্রথম প্রথম অঙ্কটি প্রস্তাবনা এবং দ্বিতীয় প্রথম অঙ্কটি প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক আছে। কিন্তু প্রথমাংশ প্রথম গর্ভাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কটিকে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক এবং দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটিকে তৃতীয় গর্ভাঙ্ক করা যেত। চতুর্থ অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ও চতুর্থ গর্ভাঙ্ক না হয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ গর্ভাঙ্ক করা চলত। পঞ্চমাঙ্কে কেবল দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের উল্লেখ আছে। এখানেও প্রথমাংশ প্রথম গর্ভাঙ্ক ধরতে পারা যায়। ষষ্ঠ অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্কে থাকলেও অনুরূপ বিচারে চতুর্থ গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত সন্নিবেশিত করা যেত। ঘোষেদের বাড়ী, বিনোদবাবুর বাড়ী, সারদার বাড়ী প্রভৃতি এক পাড়াতে এবং ঘটনাকাল মোটামুটি ভাবে একদিনের ব'লে স্থান ও কাল ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। গতি ঐক্যও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

নাটকটির প্রথমাঙ্কে মনোরমার জন্য এলোকেশীর ত্রিপদীতে দুঃখ প্রকাশ এবং সৌদামিনীর ছড়াতে সেকালের নাটকের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তৃতীয় অঙ্কে রাগিণী বসন্ত বাহার তাল কাওয়ালিতে নেপথ্য সঙ্গীত এবং রাগিণী ঝিঁঝিট তাল আড়াঠেকাতে রমণীর সঙ্গীত এই দুটিতে মনোরমার ভাবী স্বামীমিলনের ইঙ্গিত দেয়। ৪/৩ এ আড্ডায় গোপাল্র উড়ের গান এবং সুরাপ্রশস্তি বেশ উপভোগ্য। ষষ্ঠ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মনোরমার দুঃখে এলোকেশী বলে—

'সেই যে লাবণ্য আজ কোথা লুকাইল ?
না উঠিতে শশধর জলদে ঘেরিল ?'

সে কালের যাত্রার প্রভাব এতে লক্ষ্য করা যায়। দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী প্রভৃতির প্রভাবও এতে আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের পক্ষের যুক্তি এলোকেশীকে ব্যভিচারিণী করতে প্রয়োগ করা হাস্যকর এবং দুঃখের বিষয়। তার উপর পৌরাণিক কাহিনীকে বিকৃত করা বা মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তিকে পৌরাণিক আলোকে

পরিস্ফুট করা সেকালের নাটক ও প্রহসনের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই নাটকে মহাদেবের মদ্যপানের বিষয় উপস্থাপনা ক'রে মদ্যপায়ী হরিহর পৌরাণিক যুক্তি খুঁজেছে। সুতরাং লেখক 'মনোরমা নাটককে "ভাটফুলের স্বরূপ" ব'লে নিজের দীনতা স্বীকার করলেও আমরা 'মানব দুষ্প্রাপ্য পারিজাত পুষ্প' রূপে একে মনে না করলেও গোলাপ, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের সহিত সমগোত্রীয় রূপে পরিগণিত করতে পারি। 'মনোরমা নাটক ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহাও ন্যাশনাল থিয়েটারের সমকালিক একটি বৈতনিক থিয়েটার ছিল……।' [১৩]

২৮। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—অজ্ঞাত

সন ১২৭৮ সালে অজ্ঞাতব্যক্তির 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু' প্রহসন প্রকাশিত হয়। অর্থলোভী বৃষধ্বজ অর্থলালসায় বসন্তকুমারকে ভুবন-মোহিনীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত করতে চেষ্টা করে। সে চড়া সুদে টাকা দিয়ে লাভবান হয়। এমন কি বন্ধকের টাকা পরিশোধ করলেও সে অস্বীকার ক'রে দ্বিতীয়বার টাকা আদায় করে। পিতার জীবদ্দশায় তাঁর শ্রাদ্ধে দলাদলি করে। শ্বশুরের সম্পত্তি লাভে জাল উইল ক'রে রঘুরামকে দিয়ে শ্বশুরকে হত্যা করাতে যায়। রঘুরাম ধরা পড়ে, সে দ্বিতীয় আসামী রূপে অভিযুক্ত হয় এবং বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়।

প্রহসনটিতে তিনটি অঙ্ক আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি ক'রে এবং তৃতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। বৃষধ্বজ প্রধান চরিত্র। বসন্ত-কুমার ও ভুবনমোহিনীকে না দেখিয়ে লেখক ত্রুটি করেছেন। মাইকেল মধুসূদন বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ তে এ বিষয়ে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা এখানে পাওয়া গেল না। বৃষধ্বজ একক চরিত্র হ'য়েও যেন সে অনেকের সংমিশ্রণ। দীনবন্ধুর হোঁদল কুৎকুতে, রাজীবলোচন, মদন-মোহন মিত্রের মনোরমার চুনিলালের সে সমন্বয়। শেষের দিকে তার 'আমি সব দোষে খালাস পেয়ে. শেষে খুন করে প্রাণ হারালেম্। এরিরই নাম—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' —উক্তিতে নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন। অর্থলোভই বৃষধ্বজের পতনের কারণ। সুতরাং লাম্পট্য, জালিয়াতি প্রভৃতি গৌণ। অর্থলোভ সামাজিক দোষ নয়

১৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—বঙ্গাব্দ ১৩৩৮। পৃ ২১২

—ব্যক্তিগত দোষ মাত্র। এ বিষয়ে তার উপদেশ কতদূর কার্যকরী বলা যায় না।

বিদ্যাবাগীশের বিদ্যার দৌড় দেখে আমরা না হেসে থাকতে পারি না। এ রকম চরিত্র পুনর্বিবাহ নাটকে দেখা যায়। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের সুধা না গরল নাটকের বিষয়ও এতে জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর প্রভাব স্বীকার ক'রে তৎকালীন সাহিত্যের বিষয়ে এতে বলা হয়েছে।

একদিকে বাংলা প্রবচন অন্যদিকে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার এই প্রহসনে দেখা যায়। গোপীনাথের মুখে ইংরেজী কথা বসিয়ে লেখক সাহস পেয়েছেন। ২/৩ এর স্থল 'A court of Justice.

Enter the Judges, 5 Jurors. Pleaders, Inspectors, বৃষধ্বজ, রঘুরাম and others' এ রকম লেখার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ১২৭৮ সালের পূর্বে অনেক সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচিত হয়েছিল, অথচ সেগুলি আদর্শ কেন হ'ল না বুঝা গেল না। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র যখন স্ব স্ব নামে প্রহসনাদি রচনা করেছিলেন তখন এই গ্রন্থের লেখক কেন নাম প্রকাশ করলেন না? অনুমান করতে হয়—গ্রন্থকার ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য ক'রে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

২৯। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী প্রহসন—

শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সন ১২৭৯ সালে প্রকাশিত শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' প্রহসনে মদ্যপান ও বেশ্যাশক্তির পটভূমিকায় পোষ্যপুত্র লওয়ার বিষয় আলোচিত। এর কাহিনীতে আমরা পাই—জমিদার জগচ্চন্দ্র বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণ করতে চান। মাতুল প্রিয়নাথ ভাল পোষ্যপুত্রের অভাবের কথা বলেন। মেয়ে দুটির সন্তান সন্তুতি হ'লে পোষ্যপুত্র লওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু জগচ্চন্দ্র জামাইদের সহ্য করতে পারেন না। তিনি শরচ্চন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলে বড় জামাই পরেশ এবং জানকীনাথ তাকে

মদ্যপায়ী করে তুলে। জগচ্চন্দ্র মৃত্যুশয্যায় তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

লেখক সংস্কৃত ও ইংরেজী উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। জগচ্চন্দ্র নিজে মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত। তাঁর পোষ্যপুত্র নির্মল চরিত্রের হবে কি করে? শরচ্চন্দ্রকে সৎ করার কোন চেষ্টা নাই; শুধু মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং নামকরণ তার দিকে সার্থক না হ'য়ে সার্থক হয়েছে জগচ্চন্দ্রের দিকে। গ্রন্থটি মহারাণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীর উদ্দেশ্যে উপহৃত। 'পোষ্যপুত্র গ্রহণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অধুনাতন জনগণের যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন' করাই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব'লে লেখক জানালেও মদ্যপানই এর মূল বিষয়।

ডাক্তার জানকীনাথের চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষা পানাসক্তি ও ব্যভিচারের দিকে বেশী উৎসাহ। এই চরিত্রে 'এঁরাই আবার বড়লোক' নাটকের জয়কুমার ডাক্তারের প্রভাব স্মরণীয়। দুই জামাই পরেশ ও ভূপেন্দ্র চরিত্রের বৈপরীত্য চমৎকার। পরেশ ইংরেজী শিক্ষিত সুতরাং ইংরেজী বুলি, মদ্যপান এ সবই তার আয়ত্তে। ভূপেন্দ্রের পত্নীপ্রেম পরেশের নিকটে স্ত্রৈণতা ব'লে উপহাস্য। পরেশের পত্নীপ্রেমের অভাব, টাকার লোভ, মদ্যপানে অনুরাগ, কর্তার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণে পোষ্যপুত্রকে 'young Bengal' তৈরী করার অভিপ্রায় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট। পক্ষান্তরে প্রমদা এবং জ্ঞানদাও ঐ রকম বিপরীত মনোভাবাপন্ন। জ্ঞানদা ও হৃষীকেশের স্ত্রী জগৎমোহিনীর চারিত্রিক বৈপরীত্য লক্ষণীয়। কিন্তু জ্ঞানদার বাইরে যাওয়ার বাধা কোথায় বুঝা গেল না। সর্বাপেক্ষা অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে জগচ্চন্দ্রের স্ত্রী হৈমবতীর চরিত্র কল্পনায়। তাঁর দুই কন্যা—তাদেরও সন্তান হওয়ার বয়স হয়েছে। তাঁর আর সন্তান হওয়ার আশা নাই ব'লেই জগচ্চন্দ্র পোষ্যপুত্র নিতে চান। অথচ এই বিগতযৌবনা ২/২ এ টুলের উপর ব'সে স্বগত যা বলেন তা যুবতী নিঃসন্তানার পক্ষে শোভনীয়। এর পর উজ্জ্বলা ও ভোলার দ্বারা ঔষধ সাহায্যে স্বামী বশ করতে তিনি যে ছেলেমানুষি করেছেন তা হাস্যকর। মনে করতে হয় ২/১ এ কামিনীর গৃহে জগচ্চন্দ্র ও জানকীনাথের বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া তাঁর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রকাশ

করাতে লেখকের এ রকম পরিকল্পনা।

মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, ব্রাহ্মদল ও রক্ষণশীল দলে দলাদলি, ভট্টাচার্যের পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে এই প্রহসন আলোকপাত করেছে। প্রহসনটিতে কলকাতার কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের গালি এবং মদ্যপান ও গোপালন প্রভৃতির বিষয় রূপায়িত ব'লে একে ও এইরূপ রচনাকে এর রচনাকারকে নিন্দা করা হয়েছে।[১৪] কিন্তু নিরুচির হ'লেও এ বিষয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রহসনটিতে চারটি অঙ্ক ও নটি গর্ভাঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে দুটি ক'রে গর্ভাঙ্ক আছে। তবে মূল পরিকল্পনায় কাহিনীগত এটি উচ্চাঙ্গের হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় জগচ্চন্দ্রের সান্ত্বনা যে শরৎচন্দ্রের কোন ভাই-টাই—ভাই থাকলে সে এসে জুটত এবং বিষয় ও সুনাম নষ্ট করত। কিন্তু শরচ্চন্দ্রই কি বিষয় ও সুনাম নষ্ট করলে না।

কামিনীর বাড়ীতে কামিনী ও জানকীনাথের গানের সঙ্গে প্রহসনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, এটি কেবল ব্যভিচাররূপে চিত্রিত। তবে কামিনী ও জানকীর সঙ্গীতে বিশুদ্ধ মনযোগানো দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। জগচ্চন্দ্র, কামিনী ও জানকীনাথ তিনজনে যখন জুঁই ফুলের মালা গলায় দিয়ে খড়দার গোঁসাই ও সোনার বেনেদের মেয়ে হ'য়ে দর্শকদের দিকে তাকাবে, তর্কালঙ্কার দশটাকার জন্য মার খাবেন এবং পরেশ হৃষীকেশের দুটি কান ধ'রে গালে ঠাস ক'রে চড় মারবে তখন দর্শকদের হাসির খোরাক জোগাবে। আবার চড় খেয়েও যখন হৃষীকেশ বলবে, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন"—তখন আর হাসির অন্ত থাকবে না।

পোষ্যপুত্র লওয়ার ব্যাপারে দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটকের প্রভাব এতে আছে। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নীলদর্পণ প্রভৃতি নাটকের প্রভাবও এতে লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানদা জগৎমোহিনীকে তার স্বামীর সম্বন্ধে বলে, 'আহা! ওতো তোমার স্বামী নয়, ঠিক যেন কার্ত্তিক, ময়ূর ছেড়ে এয়েচে।' অনুরূপ সংলাপ নীলদর্পণে শোনা যায়। জ্ঞানদা

১৪। বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন, ১২৮০—পৃ ৫২৮

তার নিজের সম্বন্ধে বলে, 'ওরা গরিবের ছেলে আমরা জমিদারের মেয়ে, আমাদের বিয়ে করেচে বলে কি চোর দায় ধরা পড়িচি নাকি? যখন যা বলব তাই শুনবে, না শুনে তো দরোয়ান দিয়ে বার করে দেব।' জামাইবাবুদিকেও ঐ রকম উক্তি করে। আবার পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটকের প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়।

৬০। ভারত দর্পণ—শ্রীপ্রিয়লাল দত্ত ও শ্রীললিতমোহন শীল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীলের ভারতদর্পণ নাটক মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির কুফল নিয়ে লিখিত। এর কাহিনীতে আমরা জানি হরবিলাস ঘোষের পুত্র পূর্ণচন্দ্র কলকাতায় চৌদ্দ আইনের ভয়ে তার রক্ষিতা বেশ্যা নিস্তারিণীকে ফরাসডাঙ্গায় নিয়ে এসে বন্ধু অমলচন্দ্র ও রামকুমারের সাহায্যে আমোদে দিন কাটায়। কিন্তু হরবিলাস বাবুর চিঠি পেয়ে পূর্ণচন্দ্র নিস্তারিণীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে চৌদ্দ আইনের জন্য নদেরচাঁদ ও ফটিকচাঁদের সাক্ষ্যে তাকে রেজিষ্টার্ড করায়। অন্যদিকে টাকার অভাবে পূর্ণচন্দ্র অফিসের টাকা তছরুপ করায় তার ছ মাস কারাদণ্ড হয়। তার যুবতী স্ত্রী উমাবতী স্বামীর দুশ্চরিত্রতায় ও কারাদণ্ডের সংবাদে বিচলিত হয় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেবতী নাপিতানীর সাহায্যে চারুচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তাতে গর্ভবতী হয়। পূর্ণচন্দ্রের বেশ্যাসক্তিতে তার পরিবারের সকলে দুঃখিত ছিল আবার তার স্ত্রীর অবৈধ গর্ভসঞ্চারে সমস্ত পরিবারটি কলঙ্কিত ও সমাজ পরিত্যক্ত হ'ল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের 'The Indian Contagious Diseases Act 1868' এই নামে গভর্নমেন্ট গেজেটে ৫ই মে যে চৌদ্দ আইন প্রকাশিত হয় তার পটভূমিকায় নাটকটি লিখিত। বিজ্ঞাপন হ'তে জানতে পারি গ্রন্থটির প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছিল। চৌদ্দ আইনে বেশ্যাদের ও বেশ্যাগামীদের যে বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল তা বুঝা যায়। কামিনী, কুসুম, জ্ঞানদা আজ বেশ্যা হয়েছে ব'লে আমরা তাদের দোষ দিই কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে তাদের সংলাপ শুনলে আমাদের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে কৌলীন্য, অসমবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি

প্রচলিত থাকায় এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়ায় বেশ্যার দল বৃদ্ধি পেয়েছে। কামিনী চৌদ্দ আইনের জন্য নিজেদের দায়ী করে। বেশ্যারা ফরাসডাঙ্গায় চলে যায় বটে কিন্তু সেখানে কলকাতার বাবুদের মত বাবু না থাকায় রোজ রাত্রে ৬ টাকা ৮ টাকা ক'রে উপায় করতে পারে না। সেজন্য কুসুম আক্ষেপ ক'রে কামিনীকে বলে, 'হেতায় যেমন এক-জামিনের ভয়, সেথায় তেমনি না খেতে পেয়ে প্রাণ হারাবার ভয়, তা কিছু জান?' নবম অঙ্কে আমরা উমাবতীর গর্ভের বিষয় জানতে পারি। এর জন্য হরবিলাস বাবু সেকালের যুবকদের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এখনকার পুত্রদের প্রথমাবস্থাই মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বেশ্যাসক্তি. মদ্যপান, চুরি প্রভৃতি অশ্লীল কার্যগুলি তাহাদের দ্বারা অকাতরে নির্ব্বাহিত হয়,......।' কত সম্পন্ন সুখী পরিবার অধঃপতিত হয় তা এই ঘোষ পরিবারে আমরা দেখতে পাই। দশম অঙ্কে নাটকটির শেষে অমলচন্দ্রের 'চল আমি একবার সমাজে যাবো।' এই কথা ব্রাহ্মসমাজের ইঙ্গিত দেয়। তার চারিত্রিক পরিবর্তনে আমরা আনন্দিত। এ রকম যদি পূর্ণচন্দ্র হ'ত তা হ'ল আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

গ্রন্থটিতে মোট দশটি অঙ্ক আছে; কিন্তু গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের কোন উল্লেখ নাই। সে রকম নির্দেশের সুযোগও এতে নাই। কলকাতা ও ফরাসডাঙ্গা ঘটনাস্থল হওয়ায় স্থান ঐক্য মোটামুটিভাবে রক্ষিত। তবে পূর্ণচন্দ্রের ফরাসডাঙ্গায় যাওয়া, সেখান হতে আসা, তার মেয়াদ হওয়া, তার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার প্রভৃতি সময় সাপেক্ষ হওয়ায় কালঐক্য বিঘ্নিত। গতিঐক্যে শেষ অঙ্কটি বাধা স্বরূপ—ঐটি বাদ দিলেও চলত। উমাবতীর গর্ভপ্রকাশে সমস্ত পরিবারের আক্ষেপ আমরা নবম অঙ্কে শুনেছি। দশম অঙ্কে অমলচন্দ্রের বৈঠকখানায় হরবিলাস বাবুকে উপস্থিত ক'রে তাঁকে দিয়ে পরামর্শ দিয়ে নাট্যকারদ্বয় নাটকটির পরিণতি ঘটাতে চেয়েছেন। আবার দ্বিতীয় অঙ্কে শারদার চৌদ্দ লাইন, তৃতীয় অঙ্কে উমাবতীর বার লাইন, পঞ্চম অঙ্কে কামিনীর বত্রিশ লাইন এবং সপ্তম অঙ্কে উমাবতীর কুড়ি লাইন ও রেবতীর ছত্রিশ লাইন কবিতা প্রাচীন যাত্রা রীতির অনুসরণে স্থান পাওয়ায় গতিঐক্য ক্ষুণ্ণ।

# ভারত দর্পণ

নাটক।

শ্রীপ্রিয়লাল দত্ত
ও
শ্রীললিতমোহন শীল
প্রণীত।

"Courage uncertain dangers may abate,
But who can bear the approach of certain fate"

কলিকাতা।

মির্জাপুর হলওএলস লেন ২নং ভবনে
প্রাকৃত যন্ত্রে
শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৪। ইং ১৮৭২।

মূল্য ৶৹ আনা মাত্র।

ভারত দর্পণ নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ

মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত পূর্ণবাবু এই নাটকের নায়ক। তবে তার চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব না থাকায় সে টাইপ চরিত্রে পরিণত। নায়িকা উমাবতীর চরিত্রে কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, স্বামী নিয়ে সে সুখের সংসার পাততে পারত কিন্তু স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতায় তার সব কিছু নষ্ট হয়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে তার স্বগত ভাষণে সে দুঃখ প্রকাশ করেছে। তার স্বামীভক্তি ব্যর্থ হওয়ায় সে যৌবনকালে চুপ ক'রে না থেকে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। সে চৌদ্দ আইনের ভয়ে বাইরে না গিয়ে ঘরে ব'সে মজা করে। কিন্তু গর্ভসঞ্চারের পর বিন্দুবাসিনীর তিরস্কারে এবং হরবিলাসবাবু ও গিন্নীর গর্ভপাতের পরামর্শে সে নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছে। সম্পন্ন গৃহস্থের কর্তারূপে হরবিলাসবাবু চিত্রিত। বিপদের সময়ে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। পুত্রবধূর গর্ভসঞ্চারে তিনি চারুচন্দ্রকে শাস্তি দিতে চান কিন্তু তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন হ'লেও গিন্নীর জ্ঞান প্রশংসার যোগ্য। গিন্নীর পরামর্শ 'এখন আপ্‌নার ঘর আগে শাসিত কর তারপর পরের ছেলেকে বলতে সাহস করো', তার দোষ দেওয়া বৃথা।' সেজন্য অসহায় হরবিলাস বাবু জানালা গাঁথিয়ে, নাপিতানীকে বাড়ী আসতে নিষেধ ক'রে, দরজায় দারোয়ান বসিয়ে সকলকে বধূর প্রতি নজর রাখতে নির্দেশ দেন। বিধবা বিন্দুবাসিনী, কুটনী রেবতী নাপিতানী, বেশ্যা নিস্তারিণী, মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত নদেরচাঁদ, ফটিকচাঁদ প্রভৃতি চরিত্র স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে চিত্রিত।

নাটকটির নামকরণ সার্থক। নবম অঙ্কে বৃদ্ধ হরবিলাসবাবু পুত্র-বধূর চরিত্র নষ্ট হওয়ার জন্য পুত্রকে দোষী ক'রে মাতা ভারতভূমির নিকট মনোবেদনা জানিয়েছেন। দশম অঙ্কে অমলচন্দ্র ফটিকচাঁদ ও নদের চাঁদকে পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে বলেছে, 'আহা রাঁড় আর ভাঁড় এ দুটিতেই আমাদের এই সোনার ভারতকে ছারখার কল্লে।' ভারতবর্ষে মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি যে অবনতির কারণ তা এই নাটকে বর্ণিত। তবে বাংলা দেশে বেশী অধঃপতন ঘটিয়েছে ব'লে নামকরণ 'বঙ্গদর্পণ' হ'লে আরও ভাল হ'ত।

চতুর্থ অঙ্কে অমলচন্দ্রের অনুরোধে রাগিণী বাহার ও তাল আড়া-ঠেকায় নিস্তারিণী—

সুখদা প্রণয় বীজ, রোপিয়ে হৃদি মাঝারে।
সিঞ্চি আকিঞ্চন বারি, পালিনু যতন ভরে॥

—এই গান গায়। কিন্তু বারবনিতার প্রেম যে কি অদ্ভুত তা একটু পরে আমরা বুঝতে পারি। পূর্ণচন্দ্র ও রাজকুমারের অজ্ঞান হওয়ার সুযোগে অমলচন্দ্রকে নিয়ে নিস্তারিণী শয়নাগারে যায়। নাটকটির মধ্যে একটিও গান না দিলে মানায় না ব'লে এই গান দেওয়া। তবে চৌদ্দ আইনে যে বেশ্যাদের সুখের পথে কাঁটা এনেছিল এই গানে তা প্রকাশিত।

নাটকটিতে নীলদর্পণ, বিধবাবিবাহ, সধবার একাদশী, বাহবা চৌদ্দ আইন প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উমাবতী ও চারুচন্দ্রের গোপন মিলন পদ্ধতিতে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব লক্ষণীয়। নীলদর্পণের প্রভাব পরবর্তী নাটকে লক্ষ্য করা যায়। নবম অঙ্কে গিন্নী পূর্ণচন্দ্রের জন্য আক্ষেপ ক'রে বলেছে, 'বাড়ির আহার আদি উত্তম কোরে তৈয়ারি কোরে দিতেম, তা খেয়ে তার তৃপ্তি বোধ হোতো না। আমার যাদুধন না জানি সেথ কি খেয়ে দিন কাটাচ্চে······' এ প্রসঙ্গে নীলদর্পণের নবীনমাধবের জন্য তার মাতার এবং ক্ষেত্রমণির কাকার জন্য রেবতীর আক্ষেপ স্মরণীয়। এই নাটকের রেবতী নাপিতানী বিধবাবিবাহ নাটকের রসবতী নাপিতানীর প্রতিরূপ।

গ্রন্থটিতে কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় অঙ্কে বাড়িওয়ালী দুর্গমণির মৃদুস্বরে জ্ঞানদাকে উদ্দেশ্য ক'রে সংলাপের পরে শারদামনি ও অন্যান্যের সঙ্গে সংলাপ থাকা সত্ত্বেও তার প্রবেশ উল্লেখ নাই। সপ্তম অঙ্কে রেবতীর নিকটে উমাবতীর সংলাপে আমরা জানি পূর্ণচন্দ্র ফরাসডাঙ্গা হ'তে প্রায় ১৫ দিন এসেছে এবং আসবার পরদিনই তার ছমাস হরিণ বাড়িতে মেয়াদ হয়েছে। দশম অঙ্কে 'ফটিক চাঁদের সংলাপে আমরা জানতে পারি পূর্ণচন্দ্র তার পিতার চিঠি পেয়ে নিস্তারিণীকে নিয়ে কলকাতায় এসে তাকে রেজিষ্টার্ড করায়। কিন্তু তাকে নিয়ে উন্মত্ত হওয়া এবং টাকার জন্য অফিসে গোলমাল হওয়ায় তার মেয়াদ হয়। এ সব নিশ্চয়ই কলকাতায় আসার পরের দিনে হ'তে পারে না। অষ্টম অঙ্কে আমরা জানি কলকাতায় অমলচন্দ্রের দুই শত

টাকার মাহিনায় চাকুরি হওয়ায় সে কলকাতায় এসেছে। 'সেখানে শুধু নিরামিষ্য গাওনা বাজনা হয় না আমিস্যও চলে থাকে।' অথচ দশম অঙ্কে অমলচন্দ্রের বৈঠকখানায় সে রকম কোন লক্ষণ দেখি না।

হাস্য, করুণ, বীভৎস রসের পরিবেষণ হ'লেও পূর্ণচন্দ্রের মেয়াদ এবং তার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারে ঘৃণার ভাব স্থায়ী হওযায় বীভৎস রস প্রধান হয়েছে।

নাটকটি কোথাও অভিনীত হয়েছে ব'লে জানা নাই। তবে সেকালের বিশেষ সামাজিক কুরীতি দমনে এ নাটকের অভিনয় সধবার একাদশীর মত যথেষ্ট সাহায্য করত। [১৫]

---

১৫। ভারতদর্পণ নাটক বিষয়ে আমার আলোচনা পূর্বেই প্রকাশিত। গণনাট্য পত্রিকার বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ সংখ্যাতে (৮ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই ১৯৭২) প্রকাশিত আমার লিখিত 'একশ বছর আগের একটি নাটক' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য

# নবম অধ্যায়

## স্ত্রীস্বভাব ও স্ত্রীআচার বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

বিশ্বস্রষ্টা পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্টি করলেও পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে জগতে নতুনত্ব আসে। নারী শুধু পুরুষের ভোগ্যা নয়; তারও নিজস্ব সত্তা আছে। একে অস্বীকার করলে অর্ধেককে ত্যাগ করতে হয়। স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী পুণ্যকর্মের অর্ধেক অংশীদার। সাংসারিক নিয়মেও দেখা যায় পুরুষ তার বাহ্যিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন দিতে পারে না। অন্তঃপুরে অন্তঃপুর-চারিণী অন্তর দিয়ে সুষ্ঠুভাবে সব কিছু পরিচালনা না করলে সংসার অসার। কথায় বলে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' বালিকা ধীরে ধীরে যুবতীতে পরিণত হয়। বালিকা বয়সে তাকে উপযুক্তভাবে যত্ন ক'রে লেখাপড়া না শেখালে বয়স্কা হ'য়ে সে নানা অসুবিধায় পড়ে। অথচ শাস্ত্রবাক্য পুত্রকন্যাকে সমদৃষ্টিতে দেখার উপদেশ দিলেও পুন্নাম নরক হ'তে মুক্তিদাতা পুত্রই। সামাজিক দৃষ্টিতেও উভয়কে পৃথক ভাবে দেখা হয়। 'পুত্রের আদরই বা কত? প্রায় কোলে কোলেই বেড়ায়, কোলে কোলেই থাকে, ......মেয়ে আপনি কাঁদে, আপনি চুপ করে, আপন মনে খেলা করে, আপম মনে হাসে।'[১] এর বিপরীত ঘটনা ব্যতিক্রম।

পুত্রকন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রধান বাধা কন্যা শিক্ষিত হ'য়ে কি করবে? যদি সে অর্থ উপার্জন করে তবে তা কি সে পিতাকে দিবে? কন্যা শিক্ষিত হ'লে জামাতা শিক্ষিত দেখতে হবে। একদিকে শিক্ষার খরচ অন্যদিকে বিবাহে বেশী খরচ। পুত্রকে বেশী খরচ ক'রে লেখাপড়া শেখালে অলাভ নাই। আর কন্যার বেলা? ঘরের কড়ি দিয়ে বিদায় করতে হবে। এর উপর যদি কন্যা অর্থোপার্জন ক'রে জামাতার সংসারে দেয় তা হ'লে কন্যার শ্বশুরকুলের অনেক লাভ। কিন্তু আর্থিক লাভালাভ অপেক্ষা কন্যার সুখ দুঃখের বিষয়ই চিন্তা করা

---

১। প্রবন্ধরত্ন—শ্রীজটাধারী শর্ম্মা। পৃ ৫২

উচিত। 'বিবাহ কালীন কন্যার বিদ্যা পরীক্ষা করা কর্তব্য যেহেতু এরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে সকলে স্বীয় বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে উৎসাহান্বিত হইতে পারেন্।'[২]

বালিকা লেখাপড়া শিখলে বিবাহের পর নতুন পরিবেশে নিজেকে ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারবে। স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্য প্রেম বর্ধিত হবে —সুখ দুঃখের শরিকান হ'য়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সাংসারিক জীবনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। বিশেষতঃ শিশু-সন্তান লালনপালনে জননীর শিক্ষা খুবই উপকারী। শিশুমনস্তত্ত্বে মাতার স্থান যে সকলের উপরে তা বলাই বাহুল্য। মাতার স্নেহভাল-বাসা, আচারব্যবহার সবই শিশুর অনুকরণীয়।

বিদুষী স্ত্রীলোক বাড়ীতে শিশু সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারে; বাড়ীতে থেকে অন্য বাড়ীর শিশু সন্তানদেরও শিক্ষা দিতে পারে। প্রয়োজন হ'লে চাকুরি ক'রে অর্থোপার্জন করতে পারে। পুঁথিগত শিক্ষার কথা বাদ দিলেও বৃত্তিমূলক শিক্ষায়ও অর্থোপার্জন করা যায়। বিদুষী স্ত্রীলোকের দ্বারা কুল উজ্জ্বল হয়। প্রমাণ স্বরূপ মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা প্রভৃতির নাম করা যায়। যারা বলে যে স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখলে দ্বিচারিণী হয় তাদের বিরুদ্ধে বলা যায়—লেখাপড়া শিখলে সুশীলা হয়। আর যে দ্বিচারিণী হবে সে লেখাপড়া শিখলেও হবে না শিখলেও হবে। আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ নিষেধ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দেশাচার প্রচলিত কুপ্রথার নিরসন বিদ্যার দ্বারাই সম্ভব। 'যদবধি অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বিদ্যাবান্ না হইবেক তদবধি কোন প্রকারেই ঐ সমস্ত জঘন্য প্রথা নিরস্ত হইবার উপায়ান্তর নাই।'[৩]

পক্ষান্তরে লেখাপড়া না শিখলে বালিকার চিত্তবৃত্তির উন্নতি ঘটে না। তারা আলস্যে, পরচর্চায়, পরনিন্দায় রত হয় এবং কোন্দলপ্রিয় হয়। গৃহকর্মে নিযুক্ত না হ'লে তাদের উন্মার্গগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ রকম বালিকার বিবাহোত্তর জীবন সুখের হয় না। আবার শিক্ষিতা হ'লে বালিকা পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয়ে সম্মানীয়া হয়—স্বামীর

২। The Zenana opened or A Brahmin advocating female emancipation P 45

৩। স্ত্রীশিক্ষাবিধান—শ্রীদ্বারকানাথ রায়। পৃ-১৩

প্রেমাধিনী হয়। 'স্বামী যদি অত্যন্ত গুণবান ও সদাশয় হন, আর স্ত্রী যদি বিদ্যাহীনা, দুঃশীলা ও কুটিলা হয়, তবে কি রূপে পরস্পর প্রণয় জন্মিয়া সংসারের সুখ সাধন হ'তে পারে '[৪] শিক্ষিতা নারী বিপথ-গামিনী যে হ'তে পারে না বা হবে না তা বলা যায় না। এরূপ কামিনী নিয়ে সংসারে অনেক অশান্তি ঘটে এবং তার হাত হ'তে রেহাই পেতে অনেক সংসারকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়।

বাংলা নাটকের প্রথম যুগে বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়েও নাটক প্রহসনাদি লেখা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতা এসে উপস্থিত হয়েছে। যে স্ত্রী শিক্ষিত তার পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকে। আচারব্যবহার, চরিত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্ম, আচারব্যবহার প্রভৃতির গোঁড়ামি দূর করতে নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় অগ্রণী হয়েছিলেন কিন্তু তাদের উন্মার্গগামিতা ও যথেচ্ছাচার এই দেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে রকম পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত হ'য়ে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার জন্যও আন্দোলন কম হয় নাই। স্ত্রীস্বভাব ও স্ত্রীআচার এই সব আন্দোলনের ফলে পরিবর্তিত হয়। নব্যশিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মসমাজ এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে বেথুন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চিন্তা বাস্তবায়িত হ'ত না। এমন কি শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ উদারপন্থী ব্রাহ্মগণের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি নিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের মতান্তরও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে আধুনিক ক্রিয়াকলাপের গতি এবং তা উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কি না বিচার্য। তবে এ কথা বলা যায় সমাজের প্রয়োজনে, ব্যক্তির প্রয়োজনে, চিন্তা এবং কার্যধারা চিরপরিবর্তনশীল। 'certainly no mere prejudice, however strong, can long maintain its ground before the rising tide of free enquiry and independent thought.'[৫]

---

৪। স্ত্রীধর্ম বিধায়ক—শ্রীরামসুন্দর রায়। উপক্রমণিকা পৃ ৩

৫। The Bengal Magazine 1872. p 209

১। কামিনী গোপন ও যামিনী যাপন—শ্রীনিমাইচাঁদ শীল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নিমাইচাদ শীলের 'কামিনী গোপন ও যামিনী যাপন' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রচয়িতা 'কামিনী গোপন ও যামিনী যাপন'কে 'কাব্যদ্বয়' বলেছেন। এর মধ্যে নাটকীয় প্লট তেমন কিছু নাই। এতে গদ্য সংলাপও নাই। পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীতে গ্রন্থটি লিখিত। কামিনী গোপনের কাহিনী এ রকম—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে এক কামিনী তার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মিলনের আশায় ব্যাকুলা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের মিলনে বাধা। শেষে পবন, যমুনা প্রভৃতির নিকট অনুরোধে সকলই রইল কেবল 'সেই নেই' ব'লে আক্ষেপ। 'যামিনী যাপন' অংশে 'পতি; নিরুপমা প্রধানা রমণী, এবং মনোরমা, সুভাবিকা, রতি, শশী, মল্লিকা, গোলাপ, চাঁপা, মতি, ষোড়শী সহচরীবর্গ' প্রভৃতির উপস্থিতিতে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পতির অনুরোধে নৃত্য, গীত, বাদ্য চলে। আদিরসে মত্ত হ'য়ে যামিনী যাপন হওয়ায় সকলের আশা পূর্ণ হয় এবং সকলে ঢুলতে ঢুলতে চলে যায়। স্বতন্ত্র দুটি গ্রন্থ ধ'রে বিচার করতে হবে। কারণ প্রথমটির শেষে 'সমাপ্তঃ' এবং দ্বিতীয়টির শেষে 'গ্রন্থ সমাপ্তঃ' লেখা আছে। প্রথমে কামিনী নিজের মনোবাসনা গোপন রাখতে পারছে না আবার সে গোপন ভাবে কান্তের সঙ্গে মিলনের আশায় এসেছে এ রকম অর্থও ধরা যায়। দ্বিতীয়াংশে সকল সাধ মিটিয়ে আদিরসে মত্ত হ'য়ে যামিনী যাপন করে সুতরাং দুই অংশেরই নামকরণ সার্থক। তবে কামিনী গোপনের প্রথমে কোলরিজের উদ্ধৃতিতে 'Love' ই যে গ্রন্থের মুখ্য বিষয় তার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু love না হ'য়ে 'আদিরস' বাড়াবাড়ি হওয়ায় এটি অশ্লীল।

গ্রন্থটিতে বিদ্যাসুন্দর এবং কৃষ্ণকমলের যাত্রারীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতগুলি সহচরীর আগমন না ঘটালে ভাল হ'ত। আর যে কামিনীকে নিয়ে গ্রন্থটি রচিত তার সঙ্গে ক্রিয়ার প্রাধান্য না পাওয়ায় ত্রুটিপূর্ণ।

২। বিদ্যাসুন্দর নাটক—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর কাব্য অবলম্বনে যতীন্দ্র-

মোহন ঠাকুর বিদ্যাসুন্দর নাটক রচনা করেন। এটি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। জনপ্রিয়তার জন্য এটি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হ'য়ে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। কাহিনী সেই পরিচিত বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের বিদুষী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে কুলশীলধন্য কাঞ্চীপুরের বিদ্বান রাজপুত্র সুন্দরের গোপনে মিলন এবং বিবাহ। বিদ্বান ও বিদুষীর মিলন যে কত সুখের তা আমরা বিদ্যাসুন্দর হ'তে জানতে পারি।

নাটকটিতে তিনটি অঙ্ক আছে। দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক নাই; প্রস্তাব আছে—প্রথমাঙ্কে চারটি, দ্বিতীয়াঙ্কে তিনটি এবং তৃতীয়াঙ্কেও তিনটি। প্রথমাঙ্কে বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, রাজার অভিপ্রায় ( ১ম প্রস্তাব ), সুন্দরের আগমন, সুন্দরের সঙ্গে হীরার পরিচয় ( ২য় প্রস্তাব ), হীরার বাড়ীতে সুন্দরের গমন ( ৩য় প্রস্তাব ), হীরার চেষ্টায় বিদ্যার সুন্দর দর্শন ( ৪থ প্রস্তাব )। দ্বিতীয়াঙ্কে সুন্দরের সঙ্গে বিদ্যার গোপন মিলন এবং গান্ধর্ব বিবাহ ( ১ম প্রস্তাব ), রাজসভায় এক সন্ন্যাসীর আগমন সম্ভাবনায় বিদ্যার উদ্বেগ ( ২য় প্রস্তাব ), সুন্দর ও বিদ্যার রঙ্গ রসিকতা ( ৩য় প্রস্তাব )। তৃতীয়াঙ্কে সুন্দর ও হীরার বন্দীদশা ( ১ম প্রস্তাব ), বিদ্যার দুঃখ ( ২য় প্রস্তাব ), বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের বিবাহ (৩য় প্রস্তাব)।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ সময়ে গ্রন্থকারের ভূমিকায় লেখা আছে 'ভারতচন্দ্র রচিত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান, ইতস্ততঃ ঈষৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নাটকের পরিচ্ছদে "আজকের এই নূতন" বলিয়া পাঠকগণের সমীপে সমর্পণ করিতেছি।' কিন্তু কয়কটি ত্রুটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যখন অন্তঃপুরে বিদ্যাসুন্দরের মিলনে হুলুধ্বনি দেওয়া হ'ল তখন রাণী শুনতে পেলেন না কেন? তিনি কোন সূত্রে জানতে পারলেন তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে তা স্পষ্ট। দ্বিতীয়াঙ্কের তৃতীয় প্রস্তাবে বিদ্যা ও সুন্দরের রসিকতায় অশিক্ষিত নরনারীর সংলাপ শুনি। গঙ্গাভাট কথা কইবার সময় অনুস্বারযোগে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে কেন? রাজা, বিদ্যা ও সুন্দরের বিদ্যা পরীক্ষা না ক'রেই বিবাহ দিলেন কেন? এতে তিনি কন্যাকেও হেয় করেছেন এবং নিজেও হেয় হয়েছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের তৃতীয় প্রস্তাবে বিদ্যা সুন্দরকে বলছে 'হাঁ যা বলচো সত্যি, কিন্তু নাথ,

এই ভাবটী চিরকাল থাকলে হয়।' কিন্তু ঐ প্রস্তাবেই একটু পরে বিদ্যা ও সুন্দর পরস্পর 'ভাই' বলছে। এই রকম 'ভাই' বলা 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' ও 'সপত্নী' নাটকে দেখা যায়। তবে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে উৎকট আদিরসের বাহুল্য ছিল এই নাটকে তা না থাকায় লেখক সুরুচিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

আলঙ্কারিক ভাষা—প্রয়োগ এবং গানের ছড়াছড়ি কিছু ত্রুটি ঘটিয়েছে। নাটকটিতে ১৩টি গান আছে এবং প্রত্যেক গানেই রাগিণী ও তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। গানে হীরা এবং বিদ্যার প্রধান ভূমিকা। নাটকটির শেষে রাগিণী সোহিনী বাহার তাল খেমটায়—

হায় কি সুখের আগমন।
অশেষ হরষে, পূর্ণ ভূপের ভবন ॥

—এই নেপথ্য সঙ্গীতটি কার বুঝা যায় না।

বিশেষ কোন সমাজচিত্র এতে নাই। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ভাব-ভালবাসা হওয়ার পর তাদের বিবাহ হ'লে ভাল হয়। বিদ্যাসুন্দরের লৌকিক প্রেম কাহিনী নিয়ে এই নাটকটি রচিত। নায়িকা নায়ক চরিত্র অনুসরণে নামকরণ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী—অন্নদা-মঙ্গলের অংশ ব'লে মনে করতে হয় কিন্তু একে সে রকম মনে করার কোন কারণ নাই।

প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে 'পাঠকবর্গ ইহার আদ্যো-পান্ত পাঠ করিলেই আমরা চরিতার্থ হইব।' নাটকের সার্থকতা অভিনয়ে। প্রকাশকগণ অভিনয় দেখতে চাইলেন না কেন? কিন্তু এটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বরে একবার এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দু বার অভিনীত হয়েছিল। পরেও এর অভিনয় হয় ব'লে জানা যায়।

৩। বাসর কৌতুক নাটক—শ্রীশ্যামাচরণ দে।

বাসরঘরে বর ও অন্য স্ত্রীলোকদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে শ্রীশ্যামা-চরণ দে'র বাসর কৌতুক নাটক ১২৬৬, ২৪ অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হয়। এতে কোন বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা নাই তবুও আমাদের দেশে বাসর ঘরের হাস্য পরিহাস যে অনেক সময় শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করত

তাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রীশিক্ষার অভাবই এই নিম্নরুচির কারণ। তৎকালীন স্ত্রীস্বভাব ও স্ত্রীআচার প্রসঙ্গে এই নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর কাহিনী এই—

বিবাহ সুসম্পন্ন হ'লে বরের বাসরালয়ে গমন। সেখানে কয়েকজন যুবতী তাকে নিয়ে রসিকতা করে। বরের রূপের একজন প্রশংসা করলে রসবতী তাকে নিবৃত্ত ক'রে বরের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। বর ও রসবতীর আলাপ পরিচয় চললে সুলোচনা একে সুনজরে দেখে না। একে অন্য পুরুষে আসক্তি বলে। এর পর প্রেমবিলাসিনীর ইচ্ছানুসারে কামিনী বরের দক্ষিণে, সে নিজে বামে এবং প্রমদা সম্মুখে গিয়ে বসে এবং তাদের রঙ্গরস চলতে থাকে। প্রৌঢ়া ঠাকুরাণী দিদি বরের কান মলে দিতে বললেন। সৌদামিনী তা করলে বর তার ঐ কাজের জন্য স্ত্রীজাতির পরতি সা, পরদ্রোহ স্বভাব ব'লে অভিযোগ করে। চম্পকলতা জানায় যে কষ্ট ক'রে বিবাহ করলে স্ত্রীর প্রতি প্রণয় প্রগাঢ় হয়। এর পর বাসরঘরে নায়ক নায়িকাদের পর্যায়ক্রমে গান চলতে থাকে। সকাল হ'যে যাওয়ায় চম্পকলতা, তিলোত্তমা প্রভৃতি দুঃখ প্রকাশ করে এবং বর অঙ্গনাগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করে।

প্রমদা ও বরের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অসম বিবাহ, কৌলীন্য এবং অকাল বৈধব্য প্রভৃতি যে নারীর কলঙ্কিনী হওয়ার কারণ তা আমরা জানতে পারি। আবার বরের প্রশ্নের উত্তরে প্রেমবিলাসিনী রমণীর অযত্নলাভের কারণ বর্ণনা করে। বর যখন স্ত্রীজাতির স্বভাবের কথা বলে তখন 'সাজতির বর্ত্ত' করার ফলে স্ত্রীজাতির এই স্বভাব হয়েছে বলা হয়। সপত্নী বিদ্বেষ বাল্যকাল হ'তেই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

নাটকটির প্রথমদিকে রসবতী, অঞ্জনা, সুলোচনা প্রভৃতি অঙ্গনার সংলাপে বাসরঘরে সেকালের রঙ্গ রসিকতা প্রকাশিত। পরিচয়ে বাসরালয়ে প্রথম প্রবিষ্ট নায়িকাগণের যে রকম বর্ণনা আছে নাটকটির মধ্যেও তাদের প্রায় সে রকম ভাবেই দেখান হয়েছে। রসবতীর রসজ্ঞানের পরিচয় পেলেও অঞ্জনার সুরুচির অভাব আছে। ঠাকুরাণীদিদির মধ্যে মুন্সীয়ানা থাকলেও আমাদের রুচির সঙ্গে ঠিক মিলে না। বাসরঘরে বরই নায়ক; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে গৌণ হয়ে যায়।

এই নাটকে বরকে নায়কের মতই চিত্রিত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় বাসরঘরে রাত্রি শেষ হ'ল কিন্তু কাকে ব সাক্ষাৎ পেলাম না। কনেটির নাম 'কাদী' বলে জেনেছি। এটি কাদম্বিনীর ডাক নাম মনে হয়।

পূর্বের গদ্য সংলাপে যা বলা হয়েছে পরে পদ্যের আকারে আবার তা বলায় প্রাচীন যাত্রার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকটিতে মোট ১২টি গান আছে। বর বা নায়কের পর্যায় ৬ এবং নায়িকাদের ৬। প্রত্যেকটি গানে রাগিণী ও তালের নাম লিখিত। এতে নাট্যকারের সঙ্গীতে জ্ঞানের পরিচয় পেলেও যখন সঙ্গীতের বন্যা বইতে থাকে তখন আমরা ভুলে যাই যে আমরা কোন বাসরঘরের দৃশ্য দেখছি। আমাদের মনে হয় যেন কোন অধিকারী তার দল নিয়ে কোন ধনীর বাড়ীতে পালা গাইতে এসেছেন। নাটকবিচারে এটি নাট্যপদবাচ্য না হ'লেও তৎকালে এরকম রচনাও নাটক নামে চলত।

৪। পুনর্বিবাহ নাটক—গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গার্হস্থ্য কুপ্রথার অশ্লীল ব্যাপার—উদ্ঘাটন বিষয়ে গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুনর্বিবাহ নাটক' রচনা করেন। এটি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এর কাহিনীতে আমরা পাই—এক সন্ন্যাসী দীর্ঘ দিন সন্ন্যাস জীবন কাটালে তাঁর মনে হয় গার্হস্থ্য ধর্মই ভাল। সংসারী বলাইয়ের মতে সন্ন্যাস জীবনই ভাল। সন্ন্যাসী তার দ্বারা কুলটা ও লম্পটের দৃশ্য দেখেও আরও দৃষ্টান্ত দেখতে চান। সেজন্য বলাইচাঁদ তাঁকে তার বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে সেজ বৌ মালতীর প্রথম ঋতুমতী হওয়ার জন্য খুদ চাওয়ার দৃশ্য, টপ্পা গাওয়া, কাদামাটি করা এবং অশ্লীল সঙ্গীত প্রভৃতি দেখে শুনে সন্ন্যাসী স্বীকার করেন—'জীবগণের কুত্রাপি সুখ নাই।' স্ত্রীস্বভাব ও স্ত্রীআচারে এ রকম অশ্লীল নাটক এর পূর্বে আর পাওয়া যায় না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম অশ্লীল বিষয় লুপ্ত। শিক্ষিত অনঙ্গও চিন্তিত এবং লজ্জিত। কারণ যে বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে লজ্জা বোধ হয় তা প্রকাশ করতে গ্রামস্থ লোকেরা খুবই উৎসুক। পুরোহিত শাস্ত্র বচনকে বিকৃত ক'রে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের নিকট হ'তে কিছু আদায় করে। পুরোহিত—

সোমে ঋতুমতী নারী পক্ষান্তে বিধবা ভবেৎ।
দেবরো যাতি মাসান্তে যমস্থ সুভমালয়ং ॥

—ইত্যাদি ব'লে ভয় দেখায়। কিন্তু অনঙ্গ জানে 'আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা।' পুরোহিতের বিদ্যাবুদ্ধি সে ধ'রে ফেলে। কিন্তু তবুও ভাই ফোঁটার বচন এবং আংটী নিয়ে ক্রিয়াকলাপে অনঙ্গ রেগে চ'লে যায়।

অন্য সামাজিক দিকেও নাট্যকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথমাঙ্কে অসম বিবাহের দুঃখের কথা সৌদামিনী প্রকাশ করেছে, '…এ পোড়া দেশের এম্‌নি কুরীতি যে পাঁচ বচরের মেয়ের সঙ্গে পাঁচ দশে পঞ্চাশ বচরের পাত্রের সঙ্গে বে হয়।' বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ের অভিমত সকলে গ্রহণ করল না—অভাগা দেশের লোকের জন্য বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'ল না। সরস্বতী মনের দুঃখে বলে, 'আহা! আবার পাড়ার কতগুলি নব্য আছেন, তাঁরা দুদিন না ইস্কুলে পড়ে বাড়ীর মেয়েদের কাছে বলে "পরমেশ্বর পরম দয়ালু" তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।" আহা তাদের মুখে আগুন! তারা কি আর আমাদের এই দুর্গতি দেখতে পায় না? কেবল তাঁকেই দয়ালু বলে' এই উক্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ অনেক করেছিল।

নাটকের তৃতীয়াঙ্কে 'নাপ্তেনী' রামনারায়ণ ও মহাভারতের বিষয়কে বিকৃত ক'রে ঠাট্টা তামাসা করে। মৃচ্ছকটিকের শকারের প্রভাব বাংলা নাটকে লক্ষ্য করা যায়। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনে এ লক্ষণ আছে। স্ত্রীলোকদের সংলাপের মধ্যে শশিমুখী ও সৌদামিনীর বাংলা প্রবচন পাওয়া যায়। অন্যত্র গদ্য চলিত ভাষা স্ত্রী ও পুরুষের মুখে ব্যবহৃত।

নাটকটিতে সাতটি অঙ্ক আছে কিন্তু দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের ভাগ নাই। প্রথমাঙ্কে সন্ন্যাসীর সংসার জীবন ভাল ব'লে ধারনা, দ্বিতীয়াঙ্কে সন্ন্যাসীকে লম্পট ও কুলটার দৃশ্য দেখালেও তিনি আরও দেখতে চান, তৃতীয়াঙ্কে ভৈরব দত্তের সেজ বৌ মালতীর প্রথম ঋতু হওয়ার বিষয়, চতুর্থাঙ্কে খুদ মাগা ও অন্যান্য সংস্কার, পঞ্চমাঙ্কে তীরঘরের বিষয়,

ষষ্ঠাঙ্কে কাদামাটি ও সপ্তমাঙ্কে পুরোহিত দ্বারা নানারূপ সংস্কার। এই ভাবে অঙ্ক ভাগ হ'লেও তৃতীয় অঙ্কের বিষয় মধ্য এবং এই বিষয়েই নামকরণ করা হয়েছে তবে এটি নাট্যপদবাচ্য হ'তে পারে না। তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠাঙ্ক কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল।

৫। কুমার কামিনী নাটক—অজ্ঞাত।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অজ্ঞাতনামার কুমার কামিনী নাটকে এর বিপরীত চিত্র পাই। মোট ১৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থে স্বামী ও স্ত্রী কুমার ও কামিনীর মধুর বিশ্রম্ভালাপ বর্ণিত। ঘটনাকাল 'নিশা শেষে কোন যুবকের আপন নবযৌবনা স্ত্রীর সহিত কথোপকথন' এ আরম্ভ এবং কুমারের 'তুমি বড় দুষ্ট, বেল হলে আমি যাই ' ব'লে প্রস্থানে যবনিকা পতন। পাত্রপাত্রী মাত্র দুজন। 'কামিনীকুমার' নামে আদিরসাত্মক গ্রন্থের বিপরীতে এই গ্রন্থ বেশ উপভোগ্য। সংলাপ গদ্যে এবং পদ্যে বিরচিত। লেখক সুরুচির গণ্ডী অতিক্রম করেন না ব'লে ধন্যবাদ। শিক্ষাই যে নায়ক নায়িকাকে সুরুচিপ্রিয় করেছে তা বলাই বাহুল্য। তবে ঠাকুরঝি নিয়ে কামিনীর রসিকতা একটু স্বতন্ত্র।

কা। দেখ, তুমি চারটের পর এসে আর ঘুমিও না—তুমি ঘুমুলেই ঠাকুরঝি বলে, হ্যাঁলা বোউ, তুই দাদাকে অত করে রাত জাগাস্ কেন। তা আমিও তাকে খুব বলি, বলি কি, ঠাকুর জামাই এলে তুই ঠাকুরঝি যত রাত জাগিস, আমরা তার সিকিও জাগি না।

কু। আমি যাই।

কা। আঃ একটু থাক না, ঠাকুরঝির কথা বুঝি ভাল লাগে না; তা আজ আমি তাকে বলবো "ঠাকুরঝি তোর ভাই বলেছে কি, 'কুমুদকে, ভাবতে বারণ কোর, আমি নবীনকে, নিয়ে যেতে, পত্র লিখবো।" পৃ-১৭

ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও গ্রন্থকার 'ষষ্ঠীবাঁটা, উপলক্ষে 'মুখুয্যেদের বাড়ীর গোলাপ আর ভুবনের দুটি গান উল্লেখ করেছেন। কামিনী গোলাপের

'নাথো, হবে কি সদয়,
এ প্রাণো বিয়োগ হলে, হবে কি সদয়।'

এ গানটি এবং কুমার ভুবনের—

'তারে সাধ্‌বো কেনে প্রাণ,
তাহাতে আমাতে সখি উভয়ে সমান।'

গানটি গেয়ে তাদের দাম্পত্য প্রীতির পরিচয় দিয়েছে।

৬। লীলাবতী—দীনবন্ধু মিত্র।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটক প্রকাশিত। এর কাহিনীতে আমরা জানি—জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অরবিন্দ ভ্রমক্রমে তার স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনী মনে ক'রে হরবিলাস বাবুর কাশীতে মহাতাপমুখী নামে রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যা চাঁপাকে আলিঙ্গন করে। লোকাপবাদ হয় যে অরবিন্দ চাঁপার সতীত্ব নষ্ট করেছে। ফলে অরবিন্দ গৃহত্যাগ করে এবং চাঁপা বহিষ্কৃত হয়। দীর্ঘ দিন অরবিন্দের কোন সন্ধান না পাওয়ায় হরবিলাসবাবু তাঁর পালিত ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করতে চান। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাও কাশীতে অপহৃতা হয়েছে ব'লে জমিদারবাবুর মনস্তাপের অন্ত নাই। তিনি তাঁর লীলাবতীকে কুলীনশ্রেষ্ঠ নদের চাঁদের হস্তে সম্প্রদান করতে চান। কিন্তু তাঁর এই দুইচ্ছাতেই বাধা পড়ে। অরবিন্দ ও চাঁপা এসে উপস্থিত হয়। ভোলানাথ চৌধুরীর স্ত্রী অহল্যাই তারা। তখন নেশাখোর নদেরচাঁদের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ না হ'য়ে ললিতের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে ৪টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ২টি, তৃতীয় অঙ্কে ৪টি, চতুর্থ অঙ্কে ৩টি এবং পঞ্চম অঙ্কে ৩টি গর্ভাঙ্ক আছে। ঘটনার দিকে অঙ্কগুলি ঠিক হ'লেও ২য় অঙ্কের ২টি গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্ক এবং ৫ম অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্ক দীর্ঘ হয়েছে। বিশেষতঃ ২ ১ এ লীলাবতীর এবং ৩,৪ এ ললিত ও লীলাবতীর দীর্ঘ পদ্য সংলাপ বিরক্তিকর।

শ্রীরামপুর এবং কাশীপুর এই দুই স্থান ঘটনাস্থল হওয়ায় স্থান ঐক্য রক্ষিত। তবে ১/২ এ শ্রীরামপুর হেমচাঁদের শয়নঘর এবং ২/১ কাশীপুর শারদা সুন্দরীর শয়নঘর কিভাবে হয়? শ্রীনাথকে হরবিলাস বাবুর আশ্রিত ব'লে আমরা জানি। সেই হিসাবে তার কাশীপুরে

থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ৪/৩এ ভোলানাথ চৌধুরীর শ্রীরামপুরের বৈঠক খানায় সে নদের চাঁদ এবং ইয়ার চতুষ্টয়ের সঙ্গে প্রবেশ ক'রে মদ্যপান ও ইয়ারকিতে মত্ত হয়। এখানে তার উপস্থিতিতে নাট্যকার একটু বেশী হাস্যরস পরিবেষণ করতে এরকম করেছেন।

দম্পতীর শিক্ষা, কৌলীন্য, মদ্যপান, ধনীর পোষ্যপুত্র গ্রহণ এই ক'টি বিষয় নাটকটির মধ্যে আছে। ভোলানাথ চৌধুরী, হেমচাঁদ, নদের চাঁদ মদ্যপায়ী ও লম্পট। হরবিলাসবাবু মদ্যপান করেন কিনা জানি না। তবে তাঁর রক্ষিতা ছিল। ভোলানাথ কুলীনশ্রেষ্ঠ ব'লে ভাগিনেয় হেমচাঁদ, নদেরচাঁদের সঙ্গে মদ্যপানে আপত্তি নাই? সে অনেক সতীর সতীত্ব নষ্ট করেছে। সে বলে, 'ঘট্‌কাটি জুটেছে ভাল, কিন্তু আর সতীত্ব নষ্ট কত্তে প্রবৃত্তি হয় না—বিশেষ অমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি।' হেমচাঁদ নদের চাঁদের কৌলীন্যের পরিচয় বিশেষ দিব না। হেমচাঁদ শারদাসুন্দরীর মত স্ত্রী পেয়েও নদের চাঁদের আড্ডা ছাড়ে না; এমন কি খরচের টাকার জন্য সে শারদার ট্রাঙ্ক হ'তে জোর ক'রে টাকা আনে। নদের চাঁদের মত মূর্খ, অসভ্য কুলীনে কন্যাদান করতে হরবিলাসবাবু সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন এটিই আশ্চর্য। তার পোষ্য-পুত্র গ্রহণ যত জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অরবিন্দের গৃহত্যাগের তথ্যানুসন্ধান তিনি করেন নাই কেন? নিজে রক্ষিতা রেখেছিলেন—আর পুত্র যদি সেই রক্ষিতার কন্যার সতীত্ব নষ্ট ক'রেই থাকে তাতে কৌলীন্যে কি ক্ষতি হয়? কুলীনদের এর চেয়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটে। লীলাবতীর সঙ্গে ললিতমোহনের বিবাহ দিয়ে তাঁর সম্পত্তির মালিক হ'লে কি ক্ষতি ছিল? ব্রাহ্মসমাজের কথা এই নাটকে মুখ্যস্থান গ্রহণ না করলেও হেমচাঁদের চারিত্রিক পরিবর্তনে সিদ্ধেশ্বর ও শারদা সুন্দরীর প্রভাব যথেষ্ট। সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েছে।

নাটকটির প্রধান চরিত্রগুলি ভাল হয় নাই। হরবিলাসবাবুর চরিত্রে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট নয়। যোগজীবন ও আসল অরবিন্দ এসে উপস্থিত হ'লে যখন জটিলতা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি অনেকটা নিস্পৃহভাবে মেজ খুড়োর উপর ছেড়ে দিলেন। ললিতের চরিত্র ছককাটা। তার দীর্ঘ বক্তৃতা (গদ্যে ও পদ্যে) বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিলেও তার মনে কোন

দ্বন্দ্ব নাই। লীলাবতীর কিছুটা দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু দীর্ঘ ভাবপ্রবণ পদ্য সংলাপও সে দ্বন্দ্ব প্রকাশে অক্ষম। লীলাবতীই নায়িকা। তার নামানুসারেই নাটকের নাম। শিক্ষিত ললিত ও শিক্ষিতা লীলাবতীর প্রণয় এবং মিলন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। রঘুবংশের অজ ইন্দুমতীর বিষয় উদ্ধৃত হওয়ায় ললিত ও লীলাবতীর মহত্ত্ব প্রকাশিত।

নাট্যকার উৎসর্গপত্রে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাসকে লিখেছেন 'অপরিমিত আয়াস সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি। বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ সমীপে আদর ভাজন হয় ঐকান্তিক আশা।' কিন্তু অপরিমিত আয়াস সহকারে নাট্যকার হওয়া যায় না। 'ইহাতে দোষ অল্প' নাই। তাঁর নদের চাঁদ হেমচাঁদ, শ্রীনাথ, প্রভৃতি অত্যন্ত নিম্নরুচির হাস্যরস পরিবেষণ করেছে। এমন কি এই দোষ হ'তে লীলাবতী এবং শারদা সুন্দরী ও বাদ যায় না। তবে শারদা লীলাবতীর মত ভাবের ফানুসে পরিণত হয় নাই ব'লে আমরা একটি জীবন্ত চরিত্র পাই। লীলাবতীর রচনাকালকে বঙ্কিমচন্দ্র 'দীনবন্ধুর কবিত্ব সূর্যের মধ্যাহ্ন কাল' বলেছেন। সেই জন্যই কি এই নাটকে পদ্যসংলাপ এত বেশী? কবিত্ব প্রকাশে নাটকীয় গতি ক্ষুণ্ণ। প্রাচীন যাত্রারীতির বৈশিষ্ট্যও এখানে লক্ষণীয়।

রঘুয়ার সংলাপে পাণ্ডিত্য থাকলেও আমাদের দুর্বোধ্য। তার উড়িয়া ভাষায় গানটি কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক হ'লেও নাটকের দিকে কোন সঙ্গতি নাই। ৫/২ এ লীলাবতীর বিরহের গান এবং তার দুঃখে দুঃখিতা শারদাও দাম্পত্য জীবনে অসুখী ব'লে তারও বিরহের গান বেশ যুক্তিযুক্ত। আবার ৪/৩ এ ভোলানাথ, শ্রীনাথ, নদের চাঁদ ও চারজন ইয়ারের রাগিণী শঙ্করা তাল আড়খেমটায়—

'নেশার রাজা মদের মজা,
না খেলে কি বল্‌তে পারি—
বিমল সুধা বিনাশ ক্ষুধা
পান করিয়ে বাদশা মারি।' —ইত্যাদি গানটি

তাদের চরিত্রের উপযোগী। আধুনিক যুগে 'বিপিন বাবুর কারণ সুধা মেটায় জ্বালা, মেটায় ক্ষুধা' গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৭। কলির বউ হাড় জ্বালানী—শ্রীযুত মুন্সী নামদার।

শ্রীযুত মুন্সী নামদার প্রণীত 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' গ্রন্থ সন ১২৭৫ সালে প্রকাশিত। এর কাহিনী এই—বউ সকাল বেলায় বাসি কাজ না ক'রে বসে থাকায় শাশুড়ী চিন্তিত হ'য়ে তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। সে বউকে নিজের মেয়ের মত দেখলেও বউ অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাকে পৃথকভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে। শাশুড়ী এর জন্য চিন্তিত হ'য়ে অদৃষ্টের দোহাই দিতে থাকে। সে তার পুত্রের নিকট পত্র পাঠায় অন্যদিকে বধূর মাতার আগমন ঘটে। কন্যার মুখে সব শুনে সে কন্যাকে সমর্থন করে। সেও জামাইকে পত্র লিখে। কর্ত্তাবাবু দুটি পত্র পেলেও শাশুড়ীর পত্র পড়ে এবং তার মাতার পত্র রেখে দেয়। ক্রোধে কর্ত্তাবাবু বাড়ী এসে গিন্নির মানভঞ্জন করে এবং বুড়ী বাড়ী হ'তে চলে গেছে ব'লে ভাল হয়েছে—এই ভাব প্রকাশ করে। বুড়ী প্রতিবাসিগণের মুখে পুত্রের সংবাদ পেয়ে নিজদুঃখ জানাতে আসে। কিন্তু বধূর প্ররোচনায় কর্তা মাতাকে বহিষ্কার করে দেয়। ফলে বুড়ীর ভিক্ষা ভিন্ন অন্য পথ নাই। পাছে বুড়ী তাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করতে আসে এই জন্য বউ তার ছেলেকে দ্বার বন্ধ ক'রে রাখতে বলে।

গ্রন্থটিতে অঙ্ক বিভাগ ও দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের নির্দেশ নাই। কথোপকথনের রীতিতে নাটকীয় গুণ প্রকাশিত। এতে একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ পাওয়া যায়। দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের স্থান এতে বসতে পারত।

কলিকালের বউ হয়েছে মস্ত জমিদার।
শাশুড়ী হয়েছে গোয়াল কাড়ুনী
শ্বশুর হয়েছে চৌকিদার॥'—এই ছড়ার প্রভাব লক্ষণীয়।

নাটকটির আরম্ভে রাগিণী নূতন বউ। তাল ভিন্ন হাঁড়ি উল্লেখে—

বউ অভাগী ভাল থাকি ভিন্ন খাবার একখানি।
আপ্নি হয়ে বড় গিন্নি শাশুড়ী বুড়ীর হাড় জ্বালানী।

—এই গানটি নাটকের মূল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।

শাশুড়ী, বউ, কর্তা প্রভৃতির সংলাপে গদ্য থাকলেও পদ্যে পয়ারও ব্যবহৃত। শাশুড়ীর পয়ারে সংলাপ লক্ষণীয়। তবে তার পত্র পড়বার পূর্বের গীতে এবং পত্র পড়বার পর পয়ারে নাটকীয় রীতি লঙ্ঘিত।

নাটকে লেখকের ঐ রকম বক্তব্য প্রকাশ করার রীতি নাই। পুত্রের আগমন সংবাদে বুড়ীর আনন্দ পয়ারে না বললেই ভাল হ'ত।

গ্রন্থকার গ্রন্থ সমাপ্ত করবার পূর্বে বলেছেন—

সমাপ্ত হইল এই রসের কাহিনী।

তাই বলি কলির বউ বড হাড় জ্বালানী।

এতে কলির বউদের চরিত্র বেশ বুঝা যায় এবং নামকরণের ও সার্থকতা পাওয়া যায়। রসের কথা বলতে বীভৎস রসের পরিচয় আছে এবং বুড়ীর দুঃখে কিছু করুণরসের সঞ্চারও হয়েছে।

বধূর শাশুড়ীর প্রতি বিরূপ মনোভাব, কর্তার স্ত্রৈণতা এবং নিজের মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার সামাজিক দিক। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্র গুলি বিকশিত নয়। প্রথম হ'তে নাটকের বিষয় বুঝতে পারা যায়। কর্ত্তা, গিন্নি ও শাশুড়ী এই তিন প্রধান চরিত্র ছাড়া বধূর মাতা আর একটি চরিত্র এসেছে। তার জামাইকে পত্র লেখা অপেক্ষা বধূর কর্ত্তাকে পত্র লেখা আরও যুক্তিযুক্ত হ'ত। নাটকের প্রথমে বধূর পুত্র আছে ব'লে বুঝা যায় না। গ্রন্থকার বধূর মাতাকে যেভাবে গ্রন্থে প্রথম প্রথম চিত্রিত করছিলেন শেষ পর্যন্ত তা রাখতে পারেন নাই। গ্রীক নাটকের মত ( পয়ারে ২২ লাইন লিখে ) নাটক শেষ করা হয়েছে। অভিনয় যোগ্যতা নাই ব'লেই এর কোন অভিনয় হয় নাই।

৮। কলির বৌ ঘর ভাঙ্গনী নাটক—শ্রীহরিহর নন্দী।

হরিহর নন্দী প্রণীত কলির বৌ ঘর ভাঙ্গনী নাটক * ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনীতে আমরা জানি—শুভঙ্কর দাসের স্ত্রী মেঘমালা শুভঙ্করের ভাই মাধবের প্রতি অসন্তুষ্ট। খাওয়াদাওয়ার সামান্য বিষয় নিয়ে তাদের কথাকাটি হয়। মেঘমালা তাকে ঝাড়ু মারতে উদ্যত হ'লে সে জমিদারের নিকটে নালিশ করে। জমিদার নীলাম্বর মুন্সি শুভঙ্করকে তার স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের কথা বললে শুভঙ্কর মাধবের দোষের কথা ব'লে স্ত্রীকে সমর্থন করে। কিন্তু জমিদারবাবু মেঘমালার /. জরিমানা করে। শুভঙ্কর বাড়ীতে স্ত্রীকে সব বললে মাধব

* শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুকুমার সেন 'কলির বৌ ঘর ভাঙানী' নাম লিখেছেন। ( বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড ৩য় সং—পৃ ৯০

# কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী।

নাটক।

শ্রীহরিহর নন্দী প্রণীত।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

শ্রীমুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার।

সন ১৮৭৭। ১লা জুলাই।

মূল্য /০ আনা মাত্র।

কলির বৌ ঘর ভাঙ্গনী নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ

বাড়ীতে এলে মেঘমালা তাকে তিরস্কার করে এবং পিছা নিয়ে মারতে যায়। মাধব পুনরায় জমিদারের নিকটে যায় এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা অপমানিত হওয়ায় মিছারাম দাসের আক্রায় ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হ'তে চলে যায়।

নাটকটিতে একটি অঙ্ক ও তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। প্রথম গর্ভাঙ্কটি না থাকলেও চলত। কারণ ৩য় গর্ভাঙ্কে আন্ধা পুকুরে কৈ মাছ আনতে যাওয়ার জন্য মেঘমালাকে জলপান চাইলে নাটকীয় কাহিনীর আরম্ভ। দ্বিতীয়তঃ মাধব ও ভৃত্যের কথাবার্তার সময় তিনবার ভৃত্য ও একবার ধনা ব'লে উল্লেখ আছে। এই ভৃত্যের নামই যে ধনা তা অনুমান করতে হয়। আর এতে সংলাপ মাত্র এক পৃষ্ঠারও কম। ২য় ও ৩য় গর্ভাঙ্কে কাহিনী বেশ সুগ্রথিত। তবে ৩য় গর্ভাঙ্কে জমিদার বাবুর মাধবের নিকটে ঘুষ চাওয়া ঠিক নয়। দয়াল নামে ব্যক্তিটিকে আমরা জানি না। সে-ই বা অযাচিতভাবে মাধবকে উপদেশ দিল কেন তার তাৎপর্য বুঝলাম না। জমিদারবাবু ও শুভঙ্করের আলাপ জমিদার প্রজার আলাপ নয়; দু বন্ধুর আলাপের মত। উনিশ শতকে জমিদার বাবুর সম্মুখ দিয়ে কোন প্রজার 'খড়ম পায় পাখা হস্তে গুণ ২ স্বরে গান করিতে ২' গমন একে বারে অস্বাভাবিক। অর্থলোভী জমিদারের /. জরিমানা অবিশ্বাস্য। আরও কিছু বেশী জরিমানা ক'রে মাধবের ঘুষও তুলে নিতে পারতেন। জরিমানা দিয়ে শুভঙ্করের বাটীতে গমন। শুভঙ্করের বাটী। এই স্থলে একটি গর্ভাঙ্ক এবং পিছা খেয়ে জমিদারের নিকট মাধবের গমন এই সময় আর একটি গর্ভাঙ্ক—এই অতিরিক্ত দুটি গর্ভাঙ্ক দিলে ভাল হ'ত। আসল কথা নাটকটির মূল বিষয় যৎ সামান্য ব'লে এক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক রচনা ক'রে নাট্যকার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গর্ভাঙ্ক সান্নিবেশে সেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই।

গ্রন্থটির শেষে মাধবের তাল একতালায় একটি গান আছে—

ভেক নিব আর রব না ঘরে, জ্বালা সৈতে নারি মমান্তরে।
ভ্রাতা আমার ভালবাসি, বল্‌ত সদা মিষ্টভাষী
তাতে পরের ঝি উড়ে আসি, দিল ভেয়ের মন গরল ভরে।

বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কেউ বৈষ্ণব হতে পারে—জানা নাই। বরং মারামারি ক'রে মোকর্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত হ'য়ে দেশত্যাগী হয়েছে—এ রকম শোনা যায়।

নাটকটির নামকরণ সার্থক। অনেক বধূ দেবরকে নিয়েও সংসার চালাতে অরাজী। এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নাই। কলির বৌ ঘর ভাঙ্গনী মিথ্যা নয়।

রসের দিকে জমিদার ও মাধবের সংলাপে কিছু হাস্যরস পরিবেষিত হয়েছে। বীররস, বীভৎস রসও এতে পাওয়া যায়। তবে বীভৎস রসেরই প্রাধান্য। 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' অপেক্ষা 'কলির বৌ ঘর ভাঙ্গনী' বেশী নাট্যগুণান্বিত। তবে অভিনয়ের সংবাদ জানা নাই।

৯। ভ্যালারে মোর বাপ অর্থাৎ স্ত্রী বাধ্য প্রহসন—

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্যালারে মোর বাপ অর্থাৎ স্ত্রী বাধ্য প্রহসন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এতে কলিরকাপকে তার স্ত্রী বিজয়কালীর অত্যন্ত বাধ্য দেখান হয়। কলির কাপের মা রাধামণি তাদের নিকটে ভাল ব্যবহার পায় না। স্ত্রীর কথায় কলিরকাপ মাকে রাত্রে চাকর মোদোকে দিয়ে তার মেয়ে নবীনকালীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। স্ত্রীর মন জোগাতে সে তার পায়ে ধরে এবং বিষয় সম্পত্তি ২৫০০০ টাকার কোবালায় লিখে দেয়। সিতুর মা বিজয়কালীর স্বামী-ভাগ্যের প্রশংসা ক'রে 'মেগের কাছে ভাতার ভ্যাড়া' দেখাতে বলায় সিতুর ভ্যাড়ার চামড়া মোদোকে দিয়ে আনিয়ে বাবুকে ভেড়া সাজানো হয়। গোপনভাবে কলিরকাপের মা, বোন ও জামাই বরেন্দ্রবাবু সমস্ত ব্যাপার উপলব্ধি করে। নবীনকালী কলিরকাপ ও বিজয়কালীকে তিরস্কার করে এবং বরেন্দ্রবাবু কলিরকাপকে মরতে বললে রাধামণি কালের মাহাত্ম্যের কথা ব'লে কলিরকাপকে আশীর্বাদ ক'রে তার দীর্ঘ জীবন কামনা করে।

প্রহসনটিতে দুটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে রাধামণিকে বাড়ী হ'তে তাড়ানো এবং দ্বিতীয় অঙ্কে তার পর হ'তে শেষ পর্যন্ত। কলির-কাপের অন্তঃপুরে দুটি অঙ্কই ঘটেছে এবং সময়ের দিকে একদিন এবং

এক রাত্রির মধ্যেই সব শেষ। সুতরাং স্থান ও কালঐক্য বজায় আছে। গতিঐক্যও অক্ষুণ্ণ।

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নটনটীর মাধ্যমে বিষয়ের অবতারণা, সজ্জনগণের প্রশংসা, অভিনেয় বিষয়ের উপস্থাপনা প্রভৃতি আছে। এই অংশে 'ভ্যালারে মোর বাপ' এর পরিবর্তে 'স্ত্রীবাধ্য বিষয়ই স্থির হয়েছে' নট বলে। নট 'স্ত্রীবাধ্য বিষয়' স্থির ক'রে গীতাভিনয় করতে চাইলে নটী বলে, 'তাতে আর আশ্চর্য্য কি হবে? শঙ্কর শঙ্করির বাধ্য, নারায়ণ কমলার বাধ্য, ব্রহ্মা সাবিত্রির বাধ্য, ইন্দ্র সচীর বাধ্য, তা তুমি সামান্য মানবের আর এ বিষয়ে কি বোলবে?' কিন্তু নট তার নিজের পক্ষ সমর্থনে সামাজিক বিষয় পরিস্ফুট ক'রে 'এ বিষয়ে যে অনেকেই জননীকে অসীম কষ্ট প্রদান কচ্চেন, সেটীত সহজ ব্যাপার নয়, আর এ দোষটী এখন কেমন প্রবল হয়ে উঠেছে তাত দেখতে পাচ্চ। ......বোধ করি ইহাতে সজ্জনগণের সহজেই মনোরম্য ও স্ত্রীবাধ্যগণের সংশোধন হতে পারবে।' এ কথা বলে। কিন্তু নটীর মত আমরাও সন্দেহ করি 'সজ্জনগণে তুষ্কর্ম্মান্বিত স্ত্রীবাধ্যদিগের কদর্য্য আচরণের কথায় কি কর্ণপাত কর্ব্বেন? আর স্ত্রীবাধ্যগণের কি আপনার সামান্য উপদেশে চরিত্র সংশোধন হতে পারবে?' এর কারণ স্ত্রীবাধ্য কোন সামাজিক সমস্যারূপে আমাদের দেশে দেখা দেয় নাই। এটি বিশেষভাবে ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক।

গ্রন্থকার স্ত্রীবাধ্য প্রহসন লিখতে ব'সে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যে গ্রন্থটির নাম 'ভ্যালারে মোর বাপ' দিয়েছেন। সুতরাং মা রাধামণিকে দিয়ে কালের দোষ দিয়ে কলিরকাপকে আশীর্বাদ করিয়ে 'ভ্যালারে মোর বাপ' বলিয়েছেন। কলির ছেলে কলিরকাপ শুধু একাই নয় কিন্তু তার মত স্ত্রীবাধ্য কেউ নয়। আসল কথা অশিক্ষিতা বিজয়কালীর বাধ্য হ'য়ে কলিরকাপ কেমন হয়েছিল তা-ই এতে রূপায়িত। বিজয়-কালী লেখাপড়া জানলে এ রকম ঘটত কিনা সন্দেহ। আবার মিতিন ও মিতিনের স্বামীকে নিয়ে যে উপকাহিনী আছে তাতে মিতিনের স্বামী অফিসের পঁচিশ হাজার টাকা ভাঙ্গায় তাকে ধরে নিয়ে যায়। মিতিনের হাতে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা থাকলেও সে দিতে চায় না।

অথচ 'মূল মন্ত্র এই—ছেলে, মেয়ে, বৌ জামাই, বাড়ী, বাগান, ধন, জন, সকলই তোমার—আমিও তোমার—ওসব তোমার বলেই আমার।' ৬ হওয়া উচিত।

চরিত্রচিত্রণের দিকে বিজয়কালী ও সিতুর মা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। অর্থলোলুপা বিজয়কালীর পাশে পতিপ্রেমপরায়ণা সিতুর মাকে ভালই লাগে। বরেন্দ্রবাবু ও নবীনকালী এই প্রহসনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণের তালিকায় মোদোকে 'আদ পাগলা ভৃত্য' ব'লে পরিচয় দিলেও সে তা নয়। সে নানাভাবে তার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে—পাগলামি প্রকাশ করে নাই। তার কাজে আমরা বেশ আনন্দিত। নবীনকালীর বিজয়কালীকে তিরস্কার সুরুচির পরিচায়ক না হ'লেও সংযোপযোগী। ভ্যাড়াকান্ত বাবুর মোদোর কানমলা, বরেন্দ্রবাবুর ভেড়াটি নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় বিজয়কালীর ফ্যাসাদ প্রভৃতি বেশ উপভোগ্য। মোদোর উক্তিতে 'কিছু কিছু বুঝি,' 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,' 'বুঝলে কিনা,' 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রভৃতি প্রহসনের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটিতে কলির বউ হাড় জ্বালানীর প্রভাব স্পষ্ট। সাধারণতঃ নট পূর্বে এসে নটীকে আহ্বান করে। কিন্তু এই প্রহসনে নটীর প্রথমে আগমন আছে। প্রস্তাবনায় নটীর ২টি এবং নটের ১টি গানের মধ্যে নটীর প্রথম গানে নব রসের উল্লেখে শ্লেষ অলঙ্কার প্রকাশিত হ'লেও নটি রস এতে পরিবেষিত হয় নাই। ১ম অঙ্কে বিজয়কালীর ৪টি এবং রাধামণির ১টি ও ২য় অঙ্কে কলিবকাপের ১টি গান আছে। বিজয়কালীর গান তার চরিত্রের দ্যোতক। রাধামণির গদ্য সংলাপের পর একই বিষয়ে গান প্রাচীন যাত্রারীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কলিরকাপের গানে—

'যারা গো অল্প বুদ্ধি জন,
স্ত্রীরতনে অযতনে করে জ্বালাতন' —ব'লে নিজের

দোষ ঢাকবার চেষ্টা করলেও অযতনের পরিবর্তে অধিক যতন করলে কি হয় ত'ও তার জানা উচিত ছিল।

৬। পারিবারিক প্রবন্ধ—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পৃ ১৭

পুস্তকটির প্রকাশ কাল ১২৮৩ কিন্তু '১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দোল পূর্ণিমার দিন আহিরীটোলাস্থিত জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের বাড়ীতে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।' ৭

১০। হিন্দু পরিবার—রামকালী ভট্টাচার্য্য।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রামকালী ভট্টাচার্য্যের হিন্দু পরিবার নাটক প্রকাশিত হয়। হিন্দু পরিবারের বহু বিষয় এতে চিত্রিত। শিবশঙ্করের স্ত্রী হরমণি তার কন্যা সারদাকে বকাবকি ক'রে বিবাহের পরের কর্তব্য শিখতে বলে। তাকে সেজ বৌয়ের কাছে সাঁজুতি করতে পাঠায়। সেজবৌ হেমলতা তাকে ব্রত শিখায়, মেজ বৌ চম্পকলতা সাঁজুতির মন্ত্র শুনে হাসে এবং দেশের কুপ্রথার জন্য মনস্তাপ করে।

মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় চাকুরি করতে যাওয়ায় তার স্ত্রী হেমলতা দুঃখিত। কাঞ্চনলতার ছেলের অসুখে বালসার বন্দোবস্ত করে; ঝাড়ফুঁকের ও ব্যবস্থা হয়। লোচন যুগীর হাতি শুঁড়োর পাতার রস নাকে দিতেই ছেলেটি মারা যায়।

স্বামী প্রিয়নাথ বিক্রমলতার কথায় পৃথক হ'তে এবং সহোদরাদের তাড়াতে রাজী হয় না ব'লে ঔষধ খাইয়ে তাকে সে বশ করতে যায়; ফলে সে পাগল হয়। বিক্রমলতা এ দোষ মেজবৌ এবং ছোটবৌয়ের উপর দেয়। মেজকর্তা আগেই মারা গেছে ব'লে বড়বৌ মেজবৌকে বাড়ী হ'তে তাড়ায়। মোহিত এসে উপস্থিত হ'লে হেমলতা তাকে সব বলে। মেজবৌকে বাড়ীতে রাখা হয় এবং মোহিত তার ছেলের ভার নেয়। কিন্তু হেমলতা আপোষে বড়বৌয়ের সঙ্গে থাকতে চায় না। সে কুলত্যাগ করতে চায়। তাতে মোহিত এবং সে মেজবৌয়ের সঙ্গে এক হ'য়ে বড়বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পৃথক হয়।

কাঞ্চনলতার স্বামী তাকে ভালবাসে না; সে বেশ্যাবাড়ী যায়। সেজন্য কাঞ্চনলতাও শরৎ নামে এক রসিক পুরুষের সঙ্গে দৈনিক রাত্রি ৯টার সময় মিলিত হয়। হেমলতা তাকে সাবধান ক'রে দেয় বটে কিন্তু চুড়ি কিনতে আটটি পয়সাও চাকুরি না থাকায় দিতে পারে না ব'লে সেও সেই পুরুষকে দেহদান করতে মনস্থ করে। সে স্বামীকে

৭। [illegible]—শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। পৃ-৭৫

বঁটি দিয়ে কেটে মন্দিরে ঐ উদ্দেশ্যে যায়। সেখানে আশাভঙ্গ হওয়ায় স্থানত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার সময় পাহারাওয়ালা তাকে ধরে ফেলে। ঘুষ দিয়ে মুক্ত হ'তে চেষ্টা ক'রেও সে ব্যর্থ হয়।

নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের মত সূত্রধারের প্রবেশ, সভার অবস্থা দেখে প্রিয়াকে আহ্বান এবং তার উপস্থিতি সবই আছে। তবে অভিনয়ের বিষয় বলা হ'ল না—আভাস দেওয়া আছে মাত্র। এতে ৭টি অঙ্ক আছে। অঙ্ক নির্দেশ যথাযথ। গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য নাই, হিন্দু পরিবারের সামগ্রিক চিত্র এই নাটকে পাওয়া যায়। সেজন্য নামকরণ সার্থক।

প্রায় প্রত্যেক চরিত্র যথাযথভাবে পরিস্ফুট, তবে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলি উজ্জ্বল। চম্পকলতা সাধুভাষায় কুমারীদের জন্য খেদ প্রকাশ ক'রে, স্ত্রীশিক্ষার অভাবে গুরুগম্ভীর ভাষায় আক্ষেপ ক'রে স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করেছে। তুলনায় হরমণির ভাষায় নিম্নরুচির পরিচয় থাকলেও তা স্বাভাবিক। দারোগা সব ব্যাপার শুনে ভূ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী যে গুরুগম্ভীর ভাষায় স্বগত ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি পুলিসের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সমাজ সংস্কারকের দায়িত্ব গ্রহণ করলে ভাল হ'ত।

স্থানঐক্য ও কালঐক্য বজায় থাকলেও গতিঐক্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ। হিন্দু পরিবারের সামগ্রিক রূপের পরিচয় দেওয়ায় অনেক ঘটনা এবং অনেক চরিত্রের উপস্থাপনা। এই নাটকের বিষয়বস্তুও পারিবারিক। নায়ক মোহিতমোহন ও নায়িকা হেমলতার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই; প্রিয়নাথ ও মোহিতের মধ্যে ছিল কিন্তু বিক্রমলতা ও হেমলতা তা ঘটবার সুযোগ দেয় নাই। হেমলতা যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়েছে তখন নাটকও শেষ। তার চরিত্রে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির বীজ ছিল; তা নষ্ট হ'য়ে গেছে। রসের দিকে বাৎসল্য, শৃঙ্গার, বীভৎস, করুণ এই ক'টি রসের পরিবেষণ ঘটলেও করুণ রস প্রধান হয়েছে।

১ম অঙ্কে হেমলতা সেজবৌ ব'লে মনে হয় কিন্তু ৬ষ্ঠ অঙ্কে আমরা জানতে পারি হেমলতা ছোটবৌ। আবার ১ম অঙ্কে চম্পকলতা মেজবৌ ব'লে বুঝা যায় কিন্তু ষষ্ঠাঙ্কে মল্লিকামঞ্জরীকে মেজবৌ মনে হয়। আখ্যাপত্র, পরিচয় ইত্যাদি না থাকায় অসুবিধা ঘটেছে।

২য় অঙ্কে মোহিতমোহন হেমলতাকে 'ভাই' সম্বোধন করেছে। এ রকম স্বামী স্ত্রীতে সম্বোধন অনেক নাটক ও প্রহসনে পাওয়া যায়। পঞ্চম অঙ্কে মল্লিকামঞ্জরীর স্বামী মৃতপ্রায়, কিন্তু সে পয়ারে দীর্ঘ উক্তিতে আক্ষেপ করতে থাকে। এটি প্রাচীন যাত্রারীতি। ষষ্ঠাঙ্কে কিছু নেপথ্য ভাষণ আছে—এগুলি কার সংলাপ বুঝা যায় না। স্ত্রী-শিক্ষার অভাবই যে হিন্দু পরিবারে যত অনিষ্টের মূল তা অনেকের মুখে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার অভাবে স্বামীকে বশে রাখা, দেওর ভাশুরের মুখ না দেখা, শ্বশুরের মুখ না দেখা, শ্বশুর শাশুড়ীর উপর গিন্নিপনা করা—তাদের উচিত নয়। কুমারীদের শ্বশুর বাড়ীর সকলের মনোহরণকারী আচরণ না শিক্ষা দিয়ে, বিশুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক আত্মভরণ পোষণ করতে শিক্ষা না দিয়ে, নীতি বিষয়ক শিক্ষা প্রদান না ক'রে তাদের জঘন্য হিংসাদ্বেষ পরিপূরিত তুষ তুষুলি যমপুকুর প্রভৃতি ব্রতের মন্ত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য চম্পকলতা দুঃখিত। হেমলতা লেখাপড়া না জানায় মোহিতমোহনকে সে চিঠি লিখতে পারবে না এবং তার চিঠিও সে পড়তে পারবে না ব'লে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে মোহিত আক্ষেপ করতে থাকে। প্রিয়নাথ তার স্ত্রী বিক্রমলতা অশিক্ষিতা হওয়ায় দুঃখিত। ষষ্ঠাঙ্কে মোহিতের 'আমার মতে যতদিন ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক প্রকারে প্রচলিত না হয়, ততদিন কাহারো দারপরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে।'—মন্তব্য বাস্তবে রূপায়িত হয় না—এটিই পরিতাপের বিষয়।

১১। কিঞ্চিৎ জলযোগ—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রহসন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী এই—পেরুরাম নামে এক বেকার পাওনা-দারের তাড়া খেয়ে পূর্ণবাবুর স্ত্রী বিধুমুখীর পালকিতে ঢুকে পড়ে। মাতাল বেয়ারারা তাকে বিধুমুখী মনে ক'রে বাড়ী নিয়ে আসে। বিধু-মুখীকে মন্দিরের প্রচারক প্রেমনাথবাবু বাড়ী পৌঁছে দেন। পূর্ণবাবু বিধুমুখীও প্রেমনাথবাবুর মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহ করে। কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না। কারণ সে বিধুমুখীকে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং নিজে কামিনী বেশ্যার অনুরক্ত। এরপর পেরুরামকে নিয়ে স্বামী-

স্ত্রীর রঙ্গ চলতে থাকে। তাকে প্রেমনাথবাবু সাজিয়ে বিধুমুখী স্বামীর সন্দেহ বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে পূর্ণবাবুও তাকে বাগানে পাঠিয়ে দুটি তলোয়ারে ঠোকাঠুকি করতে ব'লে নিজে আর্ত্তনাদ ক'রে বিধুমুখীকে ভয় দেখায়, শেষ পর্যন্ত পেরুরাম নিজের বুদ্ধিকৌশলে তাদের মিলন-সুখে সুখী করে এবং নিজে ঐ বাড়ীতে একটি চাকুরি লাভ করে।

এক অঙ্কের গ্রন্থটিতে তিনটি মাত্র গর্ভাঙ্ক আছে এবং তিনটিই পূর্ণবাবুর বৈঠকখানাতে। একটি রাত্রের ঘটনা এই প্রহসনটিতে সন্নি-বেশিত। চারজন পাত্র পাত্রী নিয়ে এটি রচিত। কাহিনী সুগ্রথিত এবং চমৎকার। পেরুরামকে নিয়ে প্রথমে বিধুমুখীর এবং পরে পূর্ণবাবুর কৌতুকপূণ অভিনয় বেশ উপভোগ্য। বিধুমুখীর প্রথমে জলযোগের বন্দোবস্ত এবং পূর্ণবাবুর তা নিষেধ, আবার পূর্ণবাবুব আদেশ এবং বিধুমুখীব নিষেধ এবং শেযে সকলের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' মন্দ নয়। যখন বিধুমুখী থালা হস্তে দর্শকগণের প্রতি বলে,

> 'মিটিল ঝগড়া ঝাঁটি আর গোলযোগ !
> সুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ !
> তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্ম্মভোগ !
> এখন দর্শকগণ খ্যাঁটে দেও যোগ।'

তখন আমরা না হেসে থাকতে পারি না; কিন্তু দর্শকদের জলযোগের বন্দোবস্ত বিধুমুখী কি করেছে?

স্ত্রী স্বাধীনতা এবং মহিলাদের ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান প্রভৃতির ইঙ্গিত আছে। বিধুমুখী পূর্ণবাবুর নিকট নিজের স্বাধীনতা আদায় করেছে। অবশ্য কামিনীর বিষয়ে দুর্বলতা থাকায় পূর্ণবাবু তাকে মীর্জাপুরের গীর্জায় যেতে অনুমতি দিয়েছিল।

নায়ক পূর্ণবাবু মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রেও সে মদ ছাড়তে পারে না। এ বিষয়ে বিধু-মুখীর নিকটে সে দোষ স্বীকারও করে। তাকে তুষ্ট করতে সে সব করতে পারে, কারণ সে বলে, 'তুমিই তো আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি তাই শুনি।' সে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা দেখালেও বেশ্যা-সক্ত ব'লে স্ত্রীস্বাধীনতার সুযোগে ব্যভিচার চালায়।

নায়িকা বিধুমুখী চরিত্রেও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। সে চরিত্র-হীন স্বামীর প্রতি অভিমান ক'রে চলে যেতে চায়, আবার কামিনীর নিকটে তাকে তাড়াতাড়ি পাঠাতেও চায়। দুই আপাতবিরোধী মনোভাবে তার চরিত্র স্পষ্ট নয়। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে স্বামীর মনোমোহিনী হওয়ার জন্য সে গালে আলতা, খোঁপায় এক ছড়া মালা, পান খেয়ে ঠোঁট লাল ইত্যাদি চায়। অথচ সে পূর্বে বলেছে, 'আর আমি ধরে রাখব না। পাপ কল্লে ঈশ্বরের কাছে তুমিই দায়ী হবে, আমার কি?'

মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি নিয়ে এক সার্থক গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি রচনার উপাদান এতে ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে হাস্যরসাত্মক প্রহসন রচনা করায় মুস্কিল ঘটিয়েছে। বিশেষতঃ ঐ সব বিষয়ে ব্যঙ্গ করা অনুচিত ব'লে লেখক পরে বুঝেছিলেন। তবে প্রহসন-টিতে পেরুরাম যদি বুদ্ধি খরচ ক'রে কামিনীকে লেখা পূর্ণবাবুর চিঠিকে মিথ্যায় পরিণত না করত তা হ'লে পূর্ণবাবু ও বিধুমুখীর দাম্পত্য জীবনে ভাঙন ধরত। 'পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।' ৮

সমগ্র কাহিনী জুড়ে হাস্যরসের ছড়াছড়ি। কামিনীর উদ্দেশ্যে 'প' স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি পত্র দেওয়ায় পেরুরামের দুঃখের অন্ত নাই। সে 'পদীরে! তবু আমি আছি তোর।' ইত্যাদি ব'লে মনের দুঃখ গানে প্রকাশ করে। বিধুমুখীর পক্ষে সে যখন প্রচারক প্রেমনাথবাবুর অভিনয় করে তখন আমরা হেসে গড়াগড়ি দিতে থাকি। এই অংশ রামনারায়ণ তর্করত্নের চক্ষুদানের নাপিতানী ও বসুমতীর অভিনয়ের তালিমের সঙ্গে তুলনীয়।

পুরাতন ভৃত্য ভোলা নতুন রীতি নীতি বুঝে না। সে পূর্ণবাবুকে বিধুমুখীর পায়ের তলায় দেখে বলে, 'আমাদের স্যাকালে স্বামীর পায়ের ধূল পালে, ম্যায়েগুলা বর্ত্তায়ে য্যাত! এর কি আস্পর্দ্ধা! জগদম্বার মত মূর্ত্তি করে দাঁড়ায়ে রয়েছেন দ্যাহ না!' সে বিধুমুখীকে এই জন্য

৮। বঙ্গদর্শন। ১২৮৯ চৈত্র। পৃ ৭৮০।

তিরস্কার করায় বাবু ক্রুদ্ধ হ'য়ে তিরস্কার করলে সে আক্ষেপ করতে থাকে, 'দ্যাহ ইস্ত্রী আর ক্যুণ্ডরে নাই ত্যালেই ঘাড়ে চড়ে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি যে কি মন্ত্র তোমার কানে পড়িল, সেই অবধি তোমার ইস্ত্রি স্তাধিনতা স্তাধিনতা করি আপনিও যেহানে সেহানে নাচি বেড়ায় ও তোমারেও নাচায়।' সূক্ষ্ম রসিকতা তার বোধগম্য নয়—সেজন্য জল-খাবার নিয়ে পূর্ণবাবু ও বিধুমুখী যখন পরস্পর বিপরীত আদেশ করে তখন সে হতভম্ব হ'য়ে যায়। ভাবে 'সবাই খ্যাপে গেল নাকি।' ভোলা চাকর 'ভ্যালারে মোর বাপ' এর মোদো চাকরের সহিত তুলনীয়।

১২। নাগাশ্রমের অভিনয় প্রহসন—কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র।

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গমূলক প্রহসন কিঞ্চিৎ জলযোগে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। 'যখন ব্রাহ্মিকার সতীত্ব পক্ষে কোনো ব্যাঘাত বা বিদ্রূপ করা হয় নাই, ......তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ প্রহসন কিসে হইল, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।'[১] ব্রাহ্মধর্ম, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে ব্যঙ্গ একটু বেশী মাত্রায় লক্ষ্য করা যায় নাগাশ্রমের অভিনয় প্রহসনে। এটি মধ্যস্থ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। পরে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হ'য়ে মহর্ষি খগেন্দ্রভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু শিখীন্দ্র চন্দ্র নাগেন্দ্র মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে শ্রীকেঁড়েল চন্দ্র ঢাকেন্দ্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

রক্ষণশীল গোড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে যেমন ব্রাহ্মধর্ম সচেষ্ট হয়েছিল তেমন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খৃষ্টানদের সঙ্গে অভিন্ন ব'লে রক্ষণশীল হিন্দুদেরও সমালোচনার বিষয় হয়। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে অবতারবাদ, বিশেষ বিধান, দলগত স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি নিয়ে ব্রাহ্মপন্থীদের যে বিরোধ চলে তা এই প্রহসনে রূপায়িত।

সংস্কৃত নাটকের মত প্রস্তাবনায় নটের কথায় আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তায় আশ্চর্য হই। নট কপির বাসুকি কীর্তি দেখাতে চায়। এর পর দুটি অঙ্কে নাগাশ্রমের অভিনয়। প্রথম অঙ্কে নাগাশ্রমের অন্তরালে ব্রাহ্মসমাজের নানারকম বিবরণ এবং দ্বিতীয় অঙ্কে স্ত্রীশিক্ষা ও

১। মধ্যস্থ। ৮ই পৌষ, ১২৭৯ সাল। পৃ ৫৮৫''

স্ত্রীস্বাধীনতার নামে ব্যভিচার ও যথেচ্ছাচার। প্রথম অঙ্কে তিনটি এবং দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক সন্নিবেশিত।

মহারাজ বা মহাপুরুষ বাসুকি, রাজভ্রাতা বা যুবরাজ অনন্ত, রাজমন্ত্রী বা সম্পাদক তক্ষক, এবং পূর্ব্ববঙ্গজ পরমভক্ত রামমাণিক্য বা পুঁয়েবোড়া প্রধান প্রধান পুরুষ চরিত্র। ঢোড়ানী, বোড়ানী, স্বর্ণ-গোধানী প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্রের সঙ্গে ঢোড়া, বোড়া, স্বর্ণগোধা প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র এসে জুটেছে। রামমাণিক্য বা পুঁয়েবোড়া এবং নকুল এই প্রহসনে হাস্যরস পরিবেষণ করেছে।

নাগাশ্রম বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী। পুঁয়েবোড়া বিধবাবিবাহে ইচ্ছুক। কিন্তু পাত্রী মেথরানী বলা হ'লে সে, 'হ্যাক্ থু!' বললে নকুল এ রকম সংস্কারের জন্য দোষ দেয়—'মেথর জাত কি মানুষ নয়? তাদের গায় কি পশুর রক্ত? তারা কি তোমাদের সেই ব্রহ্মপিতার সন্তান নয়? বড়লোক দেখে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে দেখে—ভ্রাতা বগ্নী ব'লবে, ছোট জাতকে বল্‌বে না—তাদের নামে হ্যাক্ থু!'

তক্ষক যখন বৃত্তান্ত পাঠ করে 'কলিযুগে রামমোহন ঋষি কশ্যপ অবতার। তিনিই আদি সমাজ নামা খগকুল, আর ভারতসমাজ নামা এই আমাদের মহানাগকুল, এ উভয়েরই মূল। কলিযুগে খগেন্দ্রের অবতার দেবেন্দ্র; বাসুকি মহারাজের অবতার এই আমাদের প্রধান আসনোপবিষ্ট মহাপ্রভু!' —তখন আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি ও শাখাপ্রশাখা বুঝতে বাকি থাকে না।

ঢোঁড়ার মুখে 'ভুজঙ্গ কুলের স্বধর্ম্মতত্ত্ব, মুখদর্পণ, নাগিনী বান্ধব প্রভৃতি হলাহল প্রবহণের যত মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক লিপি সব ছাপা হয়' এই কথা এবং নেপথ্যে বউলের সুরে—

'তারে কে ভাই পারে চিন্তে?
ও যার হাজার খানা, ধর্ম্মের ফণা, বক্তৃতাতে,
মরি মরি, বক্তৃতাতে ফোঁস্ ফোসন্তে!'

শুনি তখন আমরা তৎকালীন ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বুঝতে পারি।

বাসুকির 'আমার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝে লও; স্বাধীনতা আর কুসংস্কার হীনতা গুণের বিচার কালে বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ এবং পূর্ব্বরাগ

অর্থাৎ কোর্ট সিপজনিত বিবাহ; অসবর্ণ বিবাহ: খুড়তুতো জ্যাঠ্‌তুতো পিস্‌তুতো মাস্‌তুতো মামাতো ভাই ভগ্নীর বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন আর অনুষ্ঠানকে উচ্চ ধরনের গুণ বলেই আগে ধর্তব্য করা যায়!' —এই উক্তি সামাজিক সমস্যার দিকে গুরুতর।

ঢোঁড়ার ছাপাখানা, স্বর্ণগোধার স্কুল প্রভৃতি আশ্রমের নিজস্ব সম্পত্তি হওয়া, গোখুরো নাগিনীর ঢোঁড়ার সঙ্গে এবং মেটে গিড়্গিড়ির সঙ্গে বেত আছড়ার ব্যভিচার প্রভৃতি বিভিন্ন দিক এতে প্রকাশিত।

# দশম অধ্যায়

## বিবিধ বিষয়ক সমাজচিত্র ও নাটকগুলির আলোচনা।

হিন্দুসমাজের প্রথা ও রীতিগত আচার আচরণ অবলম্বনে পক্ষে এবং বিপক্ষে নাটক প্রহসনাদি রচিত হয়েছিল। শ্রেণীগত বৈচিত্র্যও তাদের কম নয়। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে কৌলীন্য, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, অসমবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয় অবলম্বনে নাটক-গুলির আলোচনা করেছি। এগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি নাটক আছে যাদের ঐ রকম কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। শ্রীযুক্ত নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির কলিকুতূহল নাটক এবং কলিকৌতুক নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক, অর্ধ পৌরাণিক, সামাজিক নানাবিষয়—এমনকি সামাজিক ইয়ং বেঙ্গল সৃষ্টি, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যরীতি প্রভৃতিও এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

এর পর দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের কথা বলতে হয়। রায়তের উপর নীলকরদের অত্যাচার এর মুখ্য বিষয় হ'লেও 'The drama is a favourite mode with the Hindus for describing certain state of society, manners and customs. ···The evils of Kulin Brahminism, widow—marriage prohibition, quackery, fantacism have been depicted by it with great effect, nor has the system of Indigo planting escapad notice;······'[১] এর প্রভাবে পরবর্তীকালে অনেক নাটক রচিত হয়। জাতীয় রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণের অভিনয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ দুর্ভিক্ষ পীড়িত সাধারণ লোকের চিত্র এবং জনদরদী সেবকগণের সেবা ও সাহায্যের চিত্র দুর্ভিক্ষদমন নাটকে রূপায়িত। এ সব কারণে এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে 'বিবিধ' শ্রেণীতে আলোচনা করা গেল।

---

১। History of Indigo Disturbance in Bengal—Compiled by Lalit Chandra Mitra. P 6

১। কলিকুতূহল—শ্রীযুক্ত নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি।

'বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভাবধি অদ্য পর্য্যন্ত লোক সকলের যেরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে তাহা সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে অনুবাদ পুরঃসর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্ত্তৃক গদ্য পদ্যে রচিত' কলিকুতূহল নাটক ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। গদ্য এবং ত্রিপদী, বক্রচতুষ্পদী, পয়ার প্রভৃতি পদ্যছন্দ এতে আছে। 'কলিকৌতুক' সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ কল্পে নাট্যকারের বাংলাভাষায় 'কলিকুতূহল' ও 'কলিকৌতুক' এ দুটি নাটক রচিত। কিন্তু পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে সমাজ পরিবেশের যোগস্থাপনে নাটকীয় সংলাপের অভাবে গ্রন্থটি নাটক হ'তে পারে নাই। রাজা পরীক্ষিৎ, অধর্ম্ম মন্ত্রী, মায়া, মোহ, ক্রোধ সেনাপতি এবং দ্বেষ, দম্ভ, সহকারী সেনাপতি হওয়ায় পৌরাণিক নাটকের প্রভাবে প্রভাবিত।

কলির ভারতে আগমন, বেদবিরোধী বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকলাপ, কৌলীন্য ও তার আনুষঙ্গিক কুফল—অসমবিবাহ, অকালবিবাহ, বহু-বিবাহ, বেশ্যাসৃষ্টি, আদিশূরের মহিষীর গর্ভে কলির অংশে বল্লাল সেনের জন্ম এবং তার জন্য কুলীনদের পিতৃপরিচয় নষ্ট, কৃষ্ণের নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে শচীর গর্ভে জন্ম এবং হরিনাম সঙ্কীর্তনে কলুষতা দূরীকরণ, বৈষ্ণব ও শাক্তের কলহ, কলির ক্লাইভ রূপে কলকাতায় আগমন, নানাবিধ পাপানুষ্ঠান, মিশনারীগণের যীশুবীজ বপন, ইয়ংবেঙ্গলের সৃষ্টি, রামমোহনের আবির্ভাব—অন্ধ ইংরেজ অনুকরণ বন্ধ, সতীহত্যা নিবারণ, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসভা স্থাপন, জাতিভেদ দূরীকরণ, তাঁর ম্লেচ্ছ দেশে গমন এবং সেখানে মৃত্যু, বিধবাবিবাহের আয়োজন প্রভৃতি এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

কাহিনীর ব্যাপ্তি এবং বিষয়বাহুল্য এর ত্রুটি। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক প্রভৃতি এতে নাই। প্রত্যেকটি স্থলে বিষয়বস্তু নির্দেশিত। গ্রন্থারম্ভে লেখক ব্রজগোপালের বন্দনা ক'রে তাঁর অনুমতিক্রমে কলিকুতূহল গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমন কি তাঁর নিজের পরিচয়, বাসস্থান সবই জানিয়েছেন। এ স্থানে দিগ্বিজয়াবসরে বসন্ত বর্ণনায় নারীগণের কামোদ্ভাবে এবং আদিশূরের মহিষীতে কলির উপগতি-কালে সংস্কৃত ও

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি হিরা ও বীরার পরিকল্পনায় এবং কলির আদিসূর মহিষীর উপগতি বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট।

গ্রন্থারম্ভে শ্রীমন্মহারাজা পরীক্ষিতের যশোবর্ণনা, অথ মুনিগণের নিকটে রাজার প্রশ্ন, অথ মুনিদিগের মুখে রাজার কলি-বৃত্তান্ত শ্রবণ এই ভাবে কাহিনীর অগ্রগতি। পৌরাণিক ও সামাজিক চরিত্রের সংমিশ্রণ এবং নায়ক কলির চরিত্রে পরিণতির অভাব নাটকটিতে বাধাস্বরূপ।

তবে বৈষ্ণব শাক্তে দ্বন্দ্ব, ইয়ংবেঙ্গলগণের সৃষ্টি এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণের কলহ এই তিনটি অংশে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দুলানন্দের দুঃখদুর্দশার চিত্র শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মত চরিত্র মারফত রূপায়িত হ'লে আরও ভাল হ'ত। লেখকের হিন্দুধর্মের প্রতি এবং বিধবাবিবাহের প্রবর্তনে সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্ম ও বর্ণাশ্রমী বিপ্রের কলহে ব্রাহ্ম পরাজিত হয়েছে এবং গ্রন্থ সমাপ্তিতে লেখক জানিয়েছেন—

'গুণনিধি কহে কেন ভাব রামাগণ।
বাঞ্ছাসিদ্ধি হবে কিছু কর বিলম্বন ॥'

ইংরেজী শিক্ষার কুফল লেখকের বর্ণনায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত। কিন্তু এতে কলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় তাঁর আনন্দিত হওয়ার কথা; তা না হ'য়ে 'কলির বাড়য়ে রাগ লুপ্ত হয় যোগযাগ
ম্লেচ্ছপ্রায় হয় বহুনরে ॥ —এ রকম বর্ণনায় অসঙ্গতি দেখা যায়।

গ্রন্থটিতে শৃঙ্গার ও হাস্যরস বেশ সুন্দরভাবে পরিবেষিত। আদি-সূর রাজার বেশে কলির তন্মহিষীতে উপগতি বর্ণনায় শৃঙ্গার রসের এবং শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বে হাস্যরসের সঞ্চার হয়। মোহচর মিশনারীদের ধর্মযুদ্ধে লেখক ইংরেজদের বাংলা ভাষার নমুনা বেশ সুন্দর ভাবে দিয়েছেন "হে ভায়াগণ, টোমরা একানে কি ডেকিতে আসিয়াছ? ডেক টোমরা যাহাকে আপনি গড়াইয়াছ টাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করিটেছ, টোমাডিগের জগন্নাঠ যডি ঈশ্বর হইব টবে টাহাটে ঘুণ

চরিবে কেন ?”

২। কলিকৌতুক নাটক—শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি।

‘কলিকৌতুক নাটক অর্থাৎ নাট্যছলে কলির আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ। সহর শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধরীণ মহাশয়ের কৌতুহলার্থ শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্ত্তৃক বিরচিত।’ গ্রন্থটি ১৭৮০ শকাব্দাতে মুদ্রিত।

নাটকটিতে সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুযায়ী মঙ্গলাচরণ, নান্দ্যান্তে সূত্রধারের প্রবেশ, নটীকে আহ্বান, তাদের রসিকতার পর হরিশ্চন্দ্র দে চৌধুরীর ইচ্ছানুসারে শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির কলিকৌতুক নাটকের অভিনয় করা স্থির হয়। বিষয়বস্তু প্রায় কলিকুতূহল গ্রন্থের অনুরূপ। এতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। অঙ্কের শেষে ‘ইতি কলি নিগ্রহো নাম প্রথমাঙ্কঃ’, ‘ইতি রাজ্য ভূমিকা নাম দ্বিতীয়োঙ্ক,’ ‘ইতি মন্মথ বিজয়ো নাম তৃতীয়াঙ্ক,’ ‘ইতি নিষ্ক্রান্তাঃসর্ব্বে, কুলকীর্ত্তনো নাম চতুর্থাঙ্কঃ,’ ৫ম অঙ্কের শেষে ‘ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে সমাপ্তঃ’ এ রকম লেখা আছে।

কলি, অধর্ম্ম, মহামোহ, বিবেক, কামক্রোধ, কামরতি, অকর্ম্ম, দোষদৃষ্টি প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র সামাজিক নাটকে স্থান পেয়েছে। প্রথমাঙ্কে রাজা পরীক্ষিতের, দ্বিতীয়াঙ্কে বুদ্ধদেবের সংলাপে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধদেবের পয়ারে এবং আগমবাগীশের ত্রিপদীতে সংলাপ এবং তৃতীয়াঙ্কে বসন্ত ও কামের প্রভাব সম্বন্ধে দীর্ঘ চতুষ্পদীতে বর্ণনার আধিক্য ত্রুটিজনক। চতুর্থ অঙ্কে আদিশূরের রাণী যখন ছদ্মবেশী কলির সঙ্গে মিলিত তখন রাজা এসে তাকে ডাকলে তাদের যে সংলাপ চলে তা তাদের অনুপযুক্ত। নিম্নশ্রেণীর মুখের ভাষা এখানে অনুসৃত। এগুলি ছাড়া অন্যত্রও পয়ারের ছড়াছড়ি, প্লটের একমুখিতার অভাব প্রভৃতি নাট্যছলে বিবরণ ব’লে একে মনে করিয়ে দেয়। তবুও কলিকুতূহল অপেক্ষা এতে নাট্যগুণ বেশী।

এই গ্রন্থে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, ইসলাম, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্মের বিবরণে গুণ ছলে দোষ বর্ণিত। বৌদ্ধধর্মের বেদবিরোধী ক্রিয়াকলাপে, বৈষ্ণব ধর্মের কৌলধর্মে, হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি নষ্টে, ব্রাহ্মধর্মে অলীক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য দেবদেবী পূজা আরম্ভে ও কর্মকাণ্ডে মানুষের বিশ্বাস

নষ্ট হয়েছে। সতীহত্যা নিবারণে বেশ্যাবৃদ্ধি এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে বিবরণ এতে পাওয়া যায়। যুবতীর সঙ্গে বালকের বিবাহে যুবতীর আক্ষেপ, কুলীনদের সামাজিক রীতি, বৈষ্ণব সখীচরণের সঙ্গে তার মা গোসাঞ এর ব্যভিচার প্রভৃতিও এতে আছে। রাম ও যদু নামে দুজন ইংরেজিশিক্ষিত ইয়ং ক্যালকাটার চরিত্র ও সংলাপ লক্ষণীয়—

যদু। নান্‌সেনস্‌ ফাদার আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক কোরতে আর আপনাদের মতন ইঁট মাটির ডেবিল পূজা কোরতে অনুরোধ কোরতেছেন।

রাম। ছো! ও সব নাষ্টি কথা গো টু হেল্‌ কর, তুমি সভ্য হোয়ে কেন ওলড্‌ ফুলিশ ম্যানের কথায় ভুলবে?

নাটকটিতে পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়ের মূলভাব বজায় আছে। যেমন—পরীক্ষিতের তক্ষকদংশনে মৃত্যু, কাশীতে কামদেবের যাত্রায় রতির আপত্তি এবং সংশয়, বল্লালসেনের জন্ম সম্বন্ধে কিংবদন্তী, বৈষ্ণব ধর্মের ব্যভিচার, কুলীনদের দোষ উদ্‌ঘাটন, কলকাতার বর্ণনা প্রভৃতি।

হাস্য, করুণ, বীভৎস প্রভৃতি রসের স্ফুরণ ঘটলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনী, ঘটনা, কাল ও গতির অনৈক্য, বহু চরিত্রের উপস্থিতি, দীর্ঘ-কালের বর্ণনা প্রভৃতি ত্রুটিবশতঃ কোন রসই অঙ্গীরস হ'তে পারে নাই। তবুও এতে কৌতুক করা হয়েছে বলে কৌতুকরস অঙ্গীরস হয়েছে বলা যায় এবং নাট্যছলে বিবরণ বা কৌতুক নামে এটি মন্দ নয়।

৩। নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র।

শ্বেতকায় নীলকর সাহেবদের নীলচাষ সম্বন্ধে এ দেশে অত্যাচার বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটক রচনা করেন। এটি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী এই—স্বরপুরের গোলোক চন্দ্র বসু একজন ধনী চাষী। নীলকর উড ও রোগ তাকে নীলচাষে বাধ্য করতে চায়। গত বৎসরের নীলচাষের বাকি টাকা মিটিয়ে না দিলে তার বড় ছেলে নবীনমাধব নীলচাষে অসম্মত। গোলোক বসুর নামে মিথ্যা নালিশ হয় এবং জেলে সে দুঃখে, অপমানে আত্মহত্যা করে। নবীন-মাধব নীলকরদের দ্বারা প্রহৃত ও নির্যাতিত হয়। সে প্রাণত্যাগ করলে তার মা সাবিত্রী পাগল হয় এবং দ্বিতীয় পুত্রবধূ সরলতার গলায়

পা দিয়ে তাকে মেরে ফেলে। পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বিষয়টি বুঝতে পারলে সেও মাটিতে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু ঘটে।

এই মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রতিবেশী চাষী সাধুচরণের উপকাহিনী মর্মস্পর্শী। তারও উপর নীলচাষের জোর জবরদস্তি চলে। সাধুচরণের গর্ভবতী কন্যা ক্ষেত্রমণিকে জোর ক'রে নীলকর সাহেব ধ'রে নিয়ে যায় এবং সেখানে তার প্রতি নির্যাতন চলে। তাকে উদ্ধার করা হয় বটে কিন্তু রোগ সাহেবের পদাঘাতে তার গর্ভপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে।

বিলাতের বাড়ী রং করার জন্য ইংরেজরা এ দেশে নীলচাষ আরম্ভ করায়। নীলদর্পণের বসু পরিবারের বিপর্যয়ের সঙ্গে নদীয়ার গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের সাদৃশ্য আছে। ক্ষেত্রমণি নদীয়ার অনেকা সুন্দরী কৃষককন্যা হরমণি ছাড়া আর কেউ নয়। যদিও হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক এ বিষয় লিখে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন তবুও আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না নাটকের রোগ সাহেব কুলচিকাট্টা নীলকুঠির ছোট সাহেব আর্চিব্যাল্ড হিল্‌স্।[২]

২/২ এ সরলতা মনের দুঃখে বলেছে, 'আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কলেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই,'—এটি কেবল সরলতার খেদোক্তি নয়; পল্লীগ্রামের সকল সরলতারই এই খেদ। সরলতা লেখাপড়া শিখেছে, বিদেশে স্বামীকে চিঠি লিখতে পারে কিন্তু গৃহিণী গোঁড়া হওয়ায় তা পারে না ব'লে বিন্দুমাধব ও সে দুজনেই দুঃখিত। বিধবাবিবাহ, কায়স্থের উপবীত ধারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে এই নাটকে বিবরণ আছে।

কুটনী পদী ময়রাণী, দাসী আদুরী, ক্ষেত্রমণি, তোরাপ প্রভৃতি গৌণ চরিত্রগুলি নবীনমাধব, সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলির পাশে উজ্জ্বলভাবে স্থান পেয়েছে।

নাটকটির পাঁচটি অঙ্কের ১ম অঙ্কে ৪টি, ২য় অঙ্কে ৩টি, ৩য় অঙ্কে ৪টি, ৪র্থ অঙ্কে ৩টি এবং ৫ম অঙ্কে ৪টি গর্ভাঙ্ক আছে। অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক

---

২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ। পৃ ৫২

সন্নিবেশ, স্থান, সময় এবং গতিঐক্য প্রভৃতিতে কোন দোষ পাওয়া যায় না।

এ নাটকে গান নাই বললেই চলে। ২/৩ এ একটি নেপথ্যে গীতের দ্বারা পদী ময়রাণীর স্বামীর স্মৃতি মনে জাগে। এতদ্ব্যতীত কিছু কিছু পয়ারে ছড়া জাতীয় কবিতা লক্ষ্য করা যায়।

আহুরী, ক্ষেত্রমণি, তোরাপ প্রভৃতির ভাষা সরল এবং স্বাভাবিক কিন্তু নবীনমাধব, সৈরিন্ধ্রী, বিন্দুমাধব ও সরলতার মুখের ভাষা গুরু-গম্ভীর। 'যে কবি নীলদর্পণের সামান্য চিত্রগুলির ভাষা দেশকালপাত্র বুঝিয়া, প্রাদেশিকতা বজায় রাখিয়া, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যথাযথ লিখিতে পারিয়াছেন, তিনি যে ইচ্ছা করিলে নবীন, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী, বিন্দু, সাধুচরণ প্রভৃতির মুখে তাঁহার জন্মভূমি নদীয়া জেলার বা যশোহরের ভদ্র পরিবারের কথোপকথনের সহজ সরল ভাষা দিতে পারিতেন না, এমন নহে।' ৩

গ্রন্থকার ভূমিকায় 'নীলদর্পণ' নামকরণের যে যুক্তি দিয়েছেন তা সার্থক। উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাটকে নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব ঘটে। এ দোষ শুধু নীলদর্পণের নয়। নাটকটির শেষদিকে মৃত্যুঃ পর মৃত্যু ঘটায় এটি ট্র্যাজেডি না হ'য়ে প্যাথেটিক হয়েছে। অন্যভাবেও বলা যায়—করুণ রসের অভিব্যক্তিতে ত্রুটি ঘটায় বীভৎস রসের সঞ্চার হয়েছে। অবশ্য স্থানে স্থানে হাস্যরসের পরিবেষণ উপেক্ষার নয়। আহুরী, রায়ত তিনজন, গোপীনাথ দেওয়ান না থাকলে আমরা হাসতে পেতাম না।

নীলদর্পণ নাটক নিয়েই ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সূচনা। এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছাড়াই প্রথম অভিনীত। পরে তাঁর পরিচালনায় এর টাউনহলে অভিনয়। অভিনয়ের ফলে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চারিত হওয়ায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর অভিনয় চলে; কিন্তু এর পর রাজ-দ্রোহিতা ও ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে এর অভিনয় বন্ধ হয়।

নীলদর্পণ নাটকে নবীনমাধবের চরিত্রে গ্রীক নাটকের নায়কের লক্ষণ পাওয়া যায়। নিষ্ঠুর নীলকরদের পীড়ন হ'তে প্রজাকে রক্ষা করার ইচ্ছাই তার পতনের কারণ। ৩,৩ এ তার আক্ষেপ 'পরমেশ্বর

৩। দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তোফী।

তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি?' এটিও গ্রীক নাটকের নিয়তিতাড়িত নায়কের উক্তির সদৃশ। আবার শেষ দিকে বিন্দুমাধবের পয়ারে দীর্ঘ সংলাপ ঠিক অভিনয়োপযোগী না হ'লেও গ্রীক নাটকের শেষে লিরিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তুলনীয়।

নীলদর্পণের প্রভাবে এ দেশে পল্লীগ্রাম দর্পণ, জমীদার দর্পণ, চা-রক দর্পণ প্রভৃতি দর্পণ নাটক লেখা হয়েছিল। এদের মধ্যে চা-কর দর্পণও নীলদর্পণের মত নিষিদ্ধ হয়। নীলদর্পণ নাটকে যেমন বিপিনের জন্য বিন্দুমাধবকে বাঁচতে হয়েছিল পরবর্তী কালে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল নাটকে যাদবের জন্য সুরেশকে বাঁচতে হয়েছিল। ১/৪ এ রেবতী পদী ময়রাণী সম্বন্ধে বলেছে, 'কি বলবো, বিটী সাহেবের নোক তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম।' এই মেয়ে নাতির দাপট অনেক নাটকে লক্ষ্য করা যায়।

ডবলিউ এস সিটনকারের সভাপতিত্বে আর টেম্পল, জেসেল, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং ফার্গুসন এই ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট নীল কমিশন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ ব'সে ২৭শে আগষ্ট রিপোর্ট দেয়। কেবল ফার্গুসন সাহেব অন্য মত পোষণ করায় স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়েছিলেন। বাকি ৪ জনের রিপোর্টে জানানো হয় 'এই ক্ষণে আমরা মিনতি পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টে এই এত্তেলা অর্পণ করিয়া ভরষা করি যে তাহারা পাঠ করিয়া তাহাদের আপন ২ অভিপ্রায় স্থির করিবেন এবং ভদ্র ২ ইংরাজ সাহেবেরা এ সম্বন্ধে এমন সুচারু প্রথা প্রচলিত করিবেন যে এদেশস্থ প্রজাদিগের সহিত তাহাদের সদ্ভাব জন্মিয়া সহজে ব্যবসার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় এবং সরকার বাহাদুর তদ্দৃষ্টে সুখি হত্তেন।'[৪] এই রিপোর্ট এবং নীলদর্পণের মামলা ইত্যাদি হওয়ার জন্য এদেশ হ'তে নীল আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়।

ইংরেজ নীলকরগণের শাসন ও শোষণ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের ওয়াকিবহাল করার জন্য লঙ্ সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে

৪। সন ১৮৬০ সালের ১১ আইনের মর্ম্মানুসারে নীল আবাদের বিষয় তদারক করণ জন্য যে কমিস্যনর মোকরর হইয়াছিলেন তাহারা গবর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট হইয়াছে তাহার তরজমা—নীলকমিসনরদিগের রিপোর্টের ১৯০ দফা। পৃ ৮১

এর ইংরেজী অনুবাদ করান। ভূমিকায় লঙ্ সাহেব লিখেছেন—'that the European may be in the mofussil the protecting Aegis of the peasants, who may be able to set each man under his mango and tamarind tree, none daring to make him afraid'[৫] মাইকেলের কোথাও নাম না থাকায় প্রকাশক লঙ্ সাহেবের বিরুদ্ধে ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মামলা রুজু করেন। ঐ মামলার বিচার করেন—স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলস। বিচারে লঙ্ সাহেবের শাস্তি হয়। এই মর্ডাণ্ট ওয়েলস বিচারাসন হ'তে প্রায়ই বাঙ্গালী জাতি মিথ্যাবাদী বলতেন। এই রকম মন্তব্য এবং লঙের শাস্তি কলকাতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। 'বঙ্গ সমাজের তৎকালীন নেতৃবর্গ এই অবিবেচক বিচারককে যথোচিত শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬ শে আগষ্ট দিবসে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে এক বিরাট সভা আহূত করেন।'[৬] এই সভা তার গৃহীত সিদ্ধান্ত সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যার চার্লস উডের নিকট প্রেরণ করে।

৪। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ—দীনবন্ধু মিত্র।

অন্যদিকে ওয়েলসের ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন ক'রে 'এই সভার অভিযোগ অপ্রমাণীকৃত করিবার জন্য কলিকাতার বণিক্-সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় ইংরাজ ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার স্যার মরডাণ্ট ওয়েল্‌সকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন।'[৭] এই পটভূমিকায় দীনবন্ধু মিত্রের ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' নামে প্রহসন রচিত।

বিচারপতির বলদ পঞ্চাননের সমর্থক ভোদা, গোমা, গাটাগোঁটা, স্বার্থকদাস, সাতহাটের কাণাকড়ি এবং হুতোম পেঁচা। তারা বিচারককে অভিনন্দন পত্র দেয় এবং বলদ পঞ্চাননও অভিনন্দনের উত্তর দেন। অভিনন্দন পত্র সম্বন্ধে হুতোমের উক্তি 'পেঁচা প্যাঁচপোঁচ বোঝে না,

৫। History of Indigo Disturbance in Bengal. Compiled by Lalit Chandra Mitra P. 6

৬। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ। পৃ ৪৫-৪৬

৭। দীনবন্ধু রচনাবলী—সম্পাদক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত। পৃ ৪৯

সহি কত্তে বল্লেন কল্লেন, এতে ভাল হলো কি মন্দ হলো, তা যদি আমার বুঝবের ক্ষমতা থাকৃতো, তা হ'লে আমি পূর্ব্বে যা কিছু করেছি, তা জেনে আপনারা কখনো আমার স্বাক্ষর আন্‌তে যেতেন না।' ভোঁদাবামের বলদ পঞ্চাননকে 'আপনার মিষ্টবাক্যে সকলেই তুষ্ট, কেবল পাঁকুই ধরবের আশঙ্কায সকলে এলেন না, বিশেষ এপি-ডেমিকে মানুষ ক'মে গিযেছে। আপনার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু মধুব বচনে দেশটা শুদ্ধ লোক বশীভূত।' —এ উক্তির মধ্যে যথার্থতা কতখানি আছে তা বিচার্য। তাঁর আসল রূপ 'আপনি আমাদেব চোর বলেছেন, ডাকাত বলেছেন, জালসাজ বলেছেন, মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপনি কালো চামডার এক সাজা দিযেছেন, আপনি আমাদিগকে নীচ জাতি বলিযা গণ্য করেছেন·· ···আপনার ধান ভানতে শিবসঙ্গীত আরো ভালো লাগ্‌তো।' —এটিই আসল বক্তব্য।

বলদ পঞ্চাননও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ স্বীকাব কবেছেন—

গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়।
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয়॥

এতেই নামকরণের সার্থকতা। প্রহসনটি দুটি দৃশ্যে সমাপ্ত। গদ্যে পদ্যে রচিত। এমনকি সংস্কৃত শ্লোক পর্যন্ত এতে ব্যবহার ক'রে নাট্যকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ জোরালো ক'রে হাস্যরস পবিবেষণ কবেছেন।

৫। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি নাটক—শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজাতীয় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বিষয়ে যেমন নীলদর্পণ নাটক রচিত সে রকম পল্লীগ্রামের জমিদারেব পারিবারিক অত্যাচারের বিষয়ে ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট) শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি' নাটক প্রকাশিত। এর কাহিনী এ রকম :—জগদীশপুরেরজমিদার শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠ শ্যামলাল কনিষ্ঠের অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে জানকী ভট্টাচার্যের কথায় পুত্র বিপিনও পুত্রবধূ পদ্মগন্ধাকে জগদীশ-পুরে রেখে বারাণসী যান। এ দিকে এদের উপর বিশ্বনাথের অত্যাচার চলতে থাকে। বিপিন তার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে রেখে আসে।

বিশ্বনাথ বিপিনকে লোক দিয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করলে বিচারে তাদের দ্বীপান্তর হয়। বিপিন বারাণসী ধামে পিতামাতার নিকটে যায় এবং পদ্মগন্ধা তার সঙ্গে মিলিত হ'তে যাত্রা করে ব'লে বিপিনের বন্ধু তার কুচরিত্র বিষয়ে চিঠি দেয। শ্যামলাল বিপিনের আবার বিবাহ দিতে চান কিন্তু জানকী ভট্টাচার্যের দ্বারা তাদের পূর্বসম্পর্ক ফিরে আসে।

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে দুটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে একটি, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি এবং পঞ্চম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক যোজনা যথাযথ; তবে চতুর্থ অঙ্কের উপস্থাপনা না হ'লেও চলত। জগদীশপুরের নদীপথে ঘটনার আরম্ভ এবং বারাণসী ধামে এই নাটকের শেষ। স্থানঐক্য এবং কালঐক্য ক্ষুণ্ণ হ'লেও গতিঐক্য মোটামুটি ভাবে রক্ষিত।

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে প্রস্তাবনায় নটনটীর মাধ্যমে কাহিনীর সূচনা। কিন্তু সামাজিক নাটকে ধর্মের আবির্ভাব যুক্তিযুক্ত নয়। প্রস্তাবনায় নট নটীকে

'তবে চল প্রাণ প্রিয়ে! শীঘ্র সাজি আসি।
সাধ্যমত ব্যাখ্যা করি ধর্ম্ম গুণ রাশি॥
কি তাঁহার সূক্ষ্ম গতি বুঝে উঠা ভার।
রাখিছেন নাশিছেন জীব অনিবার॥' —এ কথা বললেও আমরা দেখি নাটকে বিশুবাবুই 'নাশিছেন'। আর 'রাখিছেন' বংশী মদকের মত সৎ লোক এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের মত কর্মঠ রাজকর্মচারী। চরিত্র বিচারে প্রধান চরিত্রগুলি অপেক্ষা গৌণ চরিত্রগুলি বেশী উজ্জ্বল। শ্যামলাল ও হৈমবতী, বিশ্বনাথ ও দয়াময়ী, বিপিন ও পদ্মগন্ধা অপেক্ষা জানকী ভট্টাচার্য, মদন, পতিত, সীতানাথ, মহানন্দ, বংশীধর, সেথ, দারোগা, মঙ্গলা, ক্ষমা চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত।

পদ্মগন্ধা সংস্কৃত শ্লোক শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে। দারোগাও সংস্কৃত বলেছে; কিন্তু সংস্কৃত ছড়াছড়ি কেন? ১/১ এ ২২ লাইন পয়ারে প্রভাতের বর্ণনা নাটকীয় ত্রুটি। নাটকে গান দেওয়া হয় নাই মনে পড়ায় নাট্যকার ৫/২ এ কয়েকটি গান নায়ক নায়িকাকে দিয়ে গাইয়ে মনের খেদ মিটিয়েছেন। গানগুলিতে অবশ্য রাগিণী ও তালের উল্লেখ

আছে। গদ্য সংলাপ এবং গানে একই ভাব প্রকাশিত হওয়ায় প্রাচীন যাত্রারীতির লক্ষণযুক্ত।

১/১ এ জানকী ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ফলতঃ একথা কিছু অপ্রকাশ থাকিবেক না, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" শ্রীঘরেই যাউন্ বা ফাঁসী কাঠেই চড়ুন, একটা হইবে; ......এমন স্ত্রৈণ ত কখন দেখি নাই ......স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।' এটি ড্রামাটিক আয়রনি রূপে ব্যবহৃত হ'লেও বিশ্বনাথবাবু স্ত্রীর কথায় ঐরূপ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ব'লে স্বীকার করা যায় না। যদি দয়াময়ী পরামর্শ দিতেন তা হ'লে তিনি স্বামীকে তাঁর গত রাত্রের ও সেদিনের সকালের আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করতেন না।

পদ্মগন্ধার সংস্কৃত শ্লোকে ধর্মের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং পয়ারে আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগে তাকে প্রাচীনপন্থী ব'লে মনে হয় কিন্তু 'গৃহ ত্যজি-আইলাম মিলিতে বিপিনে।' এই উক্তিতে তাঁর স্বামীর নাম উচ্চারণে আধুনিকতা লক্ষণীয়।

নাটকটিতে শেষ পর্যন্ত শান্তরস অঙ্গীরস। পদ্মগন্ধা ও বিপিনের, হৈমবতী ও শ্যামলালের, দয়াময়ী ও বিশ্বনাথের শৃঙ্গার রস গৌণ। আবার জানকী ভট্টচার্যের দ্বারা ভয়ানক রস, কবিরাজ, সেখ প্রভৃতির দ্বারা হাস্যরস পরিবেষিত।

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি দেখাতে বিশ্বনাথবাবুর শাস্তি এবং বিপিনের সঙ্গে পদ্মগন্ধার মিলন-কল্পনায় নাটক রচিত। কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূকে বিশ্বনাথবাবুর নির্যাতন সহ্য করতে সেখানে রেখে শ্যামলালবাবু ও তাঁর স্ত্রীর বারাণসী যাওয়া সম্ভব কি? বিপিনের মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, পত্নীপ্রেম কিছুই প্রকাশিত নয়। যে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ ক'রে দণ্ডীর আশ্রয় গ্রহণ করে সে একজনের কথায় স্ত্রীকে গ্রহণ করবে? সে যদিও গ্রহণ করতে চায় শ্যামলালবাবু তাতে রাজী হবেন কেন? বিপিন ইংরেজীশিক্ষিত অথচ ইংরেজী বুলি তার মুখে শুনলাম না। ইংরেজীশিক্ষিত যুবক স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ ক'রে বৈরাগী হতে চায়— আশ্চর্য! পদ্মগন্ধা সংস্কৃত শ্লোক ব'লে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করলেও পল্লী অঞ্চলে স্ত্রীলোকের সংস্কৃত শিক্ষা কতদূর কষ্টকর ছিল তা সহজেই

অনুমেয়। অধ্যাপক জানকী ভট্টাচার্যের এবং তাঁর টোলের ছাত্র গোপালের মুখে নিম্নরুচির ভাষা উপযুক্ত হয় নাই। এ সব ত্রুটি থাকলেও আমরা পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কারে সন্তুষ্ট। তবে ধর্মের নীতিবাক্যে 'অনেক ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করণের পর পদ্মগন্ধা তাহার পতির সহিত পুনর্ম্মিলিত হইল,' —এই শিক্ষা না দিলেও আমরা 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি": বুঝতে পারতাম।

৬। দুর্ভিক্ষ দমন নাটক—যদুনাথ তর্করত্ন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ তর্করত্নের 'দুর্ভিক্ষ দমন নাটক' প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বাংলা দেশে ও উড়িষ্যা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। অনেকেই ১১৭৬ সালের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত ব'লে ভুল করেন। দুর্ভিক্ষ বিষয়েও যে নাটক রচিত হ'তে পারে তা জানা ছিল না। সেজন্য আক্ষেপ করা হয়েছে 'এ মত লোকও বর্ত্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর জ্বর-বিকার উলাউঠা প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না।' [৮] দুর্ভিক্ষ দমন নাটকের কাহিনী এই রকম:— দুর্ভিক্ষ রাজার প্রধান মন্ত্রী হাহাকার স্বীয় প্রভুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ পরিকর; অঘটন, অনশন, রোগ, শোক প্রভৃতি সেনাপতিগণ ঠিক মত কাজ করছেন না—এজন্য হাহাকার তাঁদের উত্তেজিত করেন। ফলে সাধারণ লোকের দুর্গতির অন্ত রইল না। এই দুর্গতির হাত হ'তে মুক্তি লাভের জন্য পূর্ণানন্দবাবু, দাতারামবাবু, অন্নদাবাবু, বৈদ্যনাথ বাবু, শান্তিরামবাবু প্রভৃতি পরামর্শ ক'রে শস্তারামকে পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। শস্তারাম অন্ন বিনা বাকি সব দিতে চাইলেও রাজার পক্ষ তাতে রাজী না হ'য়ে শস্তারামকে বন্দী করে। এই জন্য দাতারাম বাবু, অন্নদাবাবু প্রভৃতি যুদ্ধ যাত্রা করতে প্রস্তুত। হাহাকারের প্রবল প্রতাপে লোকের কষ্টের সীমা রইল না। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর আদেশে শস্য সম্পত্তি দয়া করেন—শস্তারাম নিজ বাহুবলে কারাগার ভেঙ্গে মুক্ত হন— বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তির আনুকূল্যে দুর্গ নির্মিত হয় এবং দুর্ভিক্ষকে দমন করা হয়।

৮। রহস্য সন্দর্ভ—১৯২৩ সংবৎ। পৃ ১৫৯

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নান্দী, নটী ও সূত্রধারের কথোপকথনে নাটকীয় বিষয়ের উপস্থাপনা। নটীর সংবাদে পয়ারে—

'আমার ভাবনা নাথ দেশের ভাবনা।
কেমনে বাঁচিবে দেশ ভাবিয়া বাঁচি না।।

দিনে দিনে কত যায় শমন ভবন।
কিসে হয় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দমন।'

এই কথা বলার পর পয়ারে মন্ত্রী হাহাকারের নেপথ্য ভাবণ ব'লে অনুমান করা যায়। এভাবে নাটকীয় কাহিনীর আরম্ভে চমৎকারিত্ব আছে। নান্দীতে লক্ষ্মীকে প্রার্থনা এবং শেষে সকলে লক্ষ্মীর কাছে বর চাওয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে ভারতীয়গণের প্রার্থনার সদৃশ। গদ্যেপদ্যে রচিত বীভৎস ও করুণরস পরিবেষিত এই নাটক।

এতে ৪টি অঙ্ক আছে। ৩য় অঙ্কে ২য় গর্ভাঙ্ক স্থলে গর্ভাঙ্কের উল্লেখ আছে মাত্র। বিবেক, ধর্ম, পাপ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র এই নাটকে আছে।

নান্দীতে দেশব্যাপী এক চরম দুরবস্থার আভাস পাওয়া যায়। হাহাকারের আবির্ভাব একাত্তরের আশ্বিনে যেদিন ঝড় হয়। নটী দুর্ভিক্ষের বংশ পরিচয় জানতে চাইলে সূত্রধার বলে যে তাঁর মায়ের নাম ঈতি; এগারশ ছিয়াত্তরে জন্ম। দুই কৃষকের কথায়, মাজি ও দাঁড়ির কথায় আমরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় হেষ্টিংসের এবং এই দুর্ভিক্ষের সময় ক্যানিং বাহাদুরের জনহিতকর কাযের উল্লেখ এতে পাওয়া যায়। তবে অন্নদাবাবুর 'একি বিলাত হলে, যে সামান্য ছাগ মেষ প্রভৃতি পশুর মধ্যে হানিকর দুর্ঘটনা উপস্থিত হলে, তার কমিশন নিযুক্ত হবে? এঁরা কি আমাদিগকে পশুর মধ্যেও গণ্য করেন?' —এই উক্তিতে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশিত।

এই দেশের দানশীল ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ দমন করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজেন্দ্র লাল মল্লিক চোরবাগানে, রাইচরণ দত্ত ও শ্যামাচরণ বিশ্বাস প্রভৃতি পটলডাঙ্গায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বীরসিংহে, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ক্ষীরপাইয়ে, ঈশ্বরচন্দ্র রায় চন্দ্রকোনায়, উমেশচন্দ্র রায় রাম-

জীবনপুরে, শম্ভুচন্দ্র রায় শ্যামবাজারে কাজ করেছিলেন।

জাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় 'গ্রামে ও জমিদারীতে অন্নসত্র খুলিয়া দেন। প্রথম প্রথম······অন্নসত্রে ৩/৪ হাজার লোক প্রত্যহ খাইত ······ এই অন্নসত্র প্রায় নয় মাস কাল ধরিয়া চলে। শিবনারায়ণ বাবু তাঁহার অর্থকোষ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। ইহাতে তাঁহার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। হুগলীর তদানিন্তন কালেক্টর শিবনারায়ণবাবুকে রাজা উপাধি দেবার জন্য······রিপোর্ট করিয়াছেন জানিতে পারিয়া শিবনারায়ণবাবু অতি বিনীতভাবে কালেক্টার সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি দেশবাসীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন মাত্র ইহার জন্য তাঁহাকে কোন উপাধিতে ভূষিত করিলে তিনি অতিশয় লজ্জিত হইবেন এবং উহা গ্রহণ করিতে অপারগ হইবেন।' [১]

মফঃস্বলের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের সংখ্যা সব ঠিক না পাওয়া গেলেও কলকাতার হিসাব পাওয়া যায়।

Statement of Paupers fed.

| Locality | By whom fed | No. fed |
|---|---|---|
| Sobha Bazar Street | Unnodalal Das | 150 |
| Musjidbari Street | Obhoy Churn Guho | 60 |
| Rajkishen's Street | Raja Kali Keshen | 150 |
| Pathooria Ghata Street | Hullodhur Duss & others | 5,000 |
| Do Do | Jodoo Lal Mullick | 200 |
| Nimtollah Street | Mittras and Dutts of Nimtollah | 200 |
| Pathooria Ghata Street | Jatendro Mohan Tagore | 300 |
| Prosonno Coomar Tagore's Street | Prsonno Coomar Tagore | 150 |

১। শিবনারায়ণ রায়ের সম্বন্ধে তাঁর বংশধর শ্রীমানস রায়ের পত্র হ'তে উদ্ধৃত।

| | | |
|---|---|---|
| Mooktaram Baboo's Street | Rajendra Mullick | 1,000 |
| Do Do | Dwarkanath Mitter and Brothers | 200 |
| Do Do | Peary Churn Sircur | 800 |
| Baranosy Ghose's Street | Hurro Chunder Ghose | 250 |
| Panchy Dhobany's Lane | Muddon Mohun Chatterjee | 70 |
| Chitpore Road | Radha Kristo Sett. | 75 |
| Dwarkanath Tagore's Street | Debendra Nath Tagore | 100 |
| Nemoo Mallick's Ghat | Hazee Zacharia and Others | 1500 |
| Rajah's Kuttree | Ooma Churn Nundy and others | 1500 |
| Chunah Gully | Gobinda Chand Dhur and others | 500 |
| Rutton Mistry's Lane | Taruck Nath Dutt and others | 800 |
| Mirzapore Street | Ranee Surno Moie and others | 300 |
| Heedaram Banerjee's Lane | Nilcomul Banerjee and others | 450 |
| | Grand Total | 13.755 |

তালিকাটি 'A Lecture delivered by Babu kissory Chand Mittra at the Bethune Society 13th December 1866' হ'তে উদ্ধৃত [১৭০]

১৭০। The Proceedings and Translations of the Bethune Society from Nov. 10th 1859 to Ap.20th 1869. p 168.

# উপসংহার

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ নব জাগরণের কাল। দীর্ঘকাল কুসংস্কার ও কুরীতি এ দেশে প্রচলিত থাকায় নবজাগরণের প্রথম অবস্থায় এ দেশের লোক হতচকিত, বিস্মিত। চিরকাল কোন জাতি নিদ্রিত থাকতে পারে না। সেজন্য ভিতর থেকেই তার জাগৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তবে জাগরণের প্রয়োজনীয় কারণ এর বাহ্যিক উপকরণও আবশ্যক। বাংলা দেশ তথা বাঙ্গালীর নব জাগৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, রীতি-নীতি, ভাবধারা এসে এ প্রয়োজন মিটিয়েছে। সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রথম দিকে সে জন্যই হিন্দু কলেজ স্থাপনে এবং রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিরোধ প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য জাতির সাহায্য ও সহযোগিতা কার্যকরী।

কিন্তু সবেমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি বাইরের আলো সহ্য করতে পারে না। কিছুক্ষণ সে চোখ বুজে আলোর স্বরূপ অনুভব করতে চায়। কিছু লোক এই সংস্কার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে পারে নাই। তারা দেশাচার এবং ধর্মের নামে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুরীতিকে সমর্থন করতে লাগল। এ জন্যই রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন সতীদাহ প্রথা নিষেধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনে আগ্রহী তখন এদেশে তাঁদের বিরোধী লোকের সংখ্যাও কম নয়।

ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুব সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত হ'য়ে আর এক ধাপ অগ্রসর হ'লেন। স্বদেশের সব কিছু মন্দ এবং বিদেশের যা কিছু তাই ভাল এই যাদের মনোভাব তাদের দ্বারা মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ এমনকি শেষ পর্যন্ত বেশ্যাগমনও সমর্থিত। ইয়ংবেঙ্গল বা ইয়ং ক্যালকাটা সম্প্রদায় এ দোষে দুষ্ট হ'লেও তাদের এক বিশেষ গুণ ছিল। তারা যুক্তির দ্বারা, বিচার দ্বারা সব কিছু গ্রহণ করত। এই যুক্তিবোধ ও বিচার শক্তি জাগ্রত করা কম কথা নয়।

রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী ও পরিবর্তনশীল নব্য পন্থীদের মধ্যে সংস্কার-বাদী বা উদারপন্থী ব্রাহ্মগণ যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। উভয়দলের বিরোধের তাঁরা মধ্যস্থ ক'রে রক্ষা করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলনে, বাল্যবিবাহ নিরোধে, মদ্যপান এবং বেশ্যাগমন নিষেধে

ব্রাহ্মপন্থী উদার মতাবলম্বীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মগণ হিন্দুই রইলেন অথচ সংস্কার সাধনে তৎপর। পক্ষান্তরে ইংরেজ ভাবাপন্ন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকেই ধর্মত্যাগী। সুতরাং ব্রাহ্মগণের পক্ষে জনসাধারণের সহযোগিতা সুলভ হ'ল।

নবজাগরণের পরিপূরক সংস্কার। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দুইই সার্থকভাবে স্থান পেয়েছে। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে যে হিন্দুসমাজ আমরা পাই তা প্রথমার্ধের তুলনায় পুরাতন হ'য়েও নূতন। বন্যার জলে নানা রকম আবর্জনা বাহিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত জলস্রোত নির্মল হয়। প্রথম দিকের কুসংস্কার, কুরীতি, কুপ্রথা পরিশীলিত হ'য়ে বাংলাদেশের সমাজজীবন রূপান্তরিত।

সমাজের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। রামমোহন থেকে আরম্ভ ক'রে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ আন্দোলন আমাদের সাহিত্যে রূপ পেয়েছে। এরপর যে তা ঘটে নাই তা নয়। আমার আলোচ্য কাল ঊনিশ শতকের আরম্ভ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ কথা জোর ক'রে বলা যায় যে এই সময়ে যেভাবে সমাজ আন্দোলন ঘটেছিল অন্যকালে বা কোন কালে তা ঘটে নাই। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংঘাত, শৈবপন্থী হিন্দুর সঙ্গে বৈষ্ণবপন্থীর বিরোধ, বৈষ্ণব ও শাক্তে দ্বন্দ্ব, এমন কি বৈষ্ণবদের দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদে ভেদ, হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে বিভেদ —এ সবই ঊনিশ শতকের আন্দোলনের তুলনায় দুর্বল— এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। এর পূর্বে কোনদিন রক্ষণশীল, প্রগতিবাদী, সংস্কারবাদী এবং খৃষ্টান এই চতুর্মুখী আন্দোলনে আমাদের সমাজ আন্দোলিত হয় নাই।

'আবার দিনকতক ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর, এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল।' [১] —ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র যে নারী আন্দোলের কথা বলেছেন তা ঊনিশ শতকীয় বাংলার সমাজে

১। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড : সাহিত্য সংসদ। পৃ ২৪৯

সম্পূর্ণ দেখা না গেলেও বিশ শতকে এই আন্দোলনের রূপ আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Civil Marriage Act একদিকে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে সহায়তা ক'রে সামাজিক দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রামমোহন গদ্যে যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তার অনুসরণে সমাজ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ক'রে নিন্দা এবং প্রশংসা লাভ করেছেন। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আন্দোলন হ'তে দূরে থেকে সেই বিষয়ে কবিতা রচনা করলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সমাজ আন্দোলনে উচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারী। গদ্যে রামমোহন রায়ের শানিত যুক্তিবাণ নিক্ষিপ্ত। ভবানীচরণের গদ্যে যুক্তি থাকলেও ব্যঙ্গ-কৌতুকের হাল্‌কা রসে তা রসায়িত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম দিকের শাস্ত্রীয় গম্ভীরভাব শেষ পর্যন্ত লঘুভাবে পরিণত। কালীপ্রসন্ন সিংহও ঐ পথ অনুসরণ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তো রঙ্গ রসিকতা নিয়েই কবিতা। সাহিত্যের অন্যান্য দিক আলোচনা করা হ'ল। এখন সাহিত্যের নাট্যশাখা আলোচনা করতে হয়।

নাটকের কথা বলতে হ'লে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে অন্যান্য শাখা এক জনের আর নাটক বহুজনের। কেউ উপন্যাস, কাব্য কবিতা পাঠ করতে পারেন। নাটকও পাঠ্য; তবে নাটকের অভিনয়ে এক জনই অভিনেতা এবং দর্শক হ'তে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য বিষয় এক জনই পাঠক এবং শ্রোতা হ'তে পারেন। নাটক পাঠ্য হ'লেও অভিনয় নিরপেক্ষ নয়। থিয়েটার লোকশিক্ষার অঙ্গ। 'ওতে লোক শিক্ষা হবে।'[২] সুতরাং সমাজ আন্দোলনে নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে এর আবির্ভাব ঘটলেও সমাজ আন্দোলনে কাব্য, নক্সা, উপন্যাস প্রভৃতির তুলনায় নাটক বেশ তৎপরতা দেখিয়েছিল। বিষয়বস্তুর দিকে এর বৈচিত্র্য অভিনব। কৌলীন্য, বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, কন্যাপণ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান,

২। শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পৃ ৪৯৭

বেশ্যাগমন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা—সমাজের প্রায় সমস্ত বিষয়ই নাটকে স্থান পেয়ে সামাজিক আন্দোলন তীব্র করেছিল। আবার বিচিত্র বিষয়ের নাটকগুলির অভিনয় যে এই আন্দোলনকে তীব্রতর করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

স্বীকার করতে হয় যে সাহিত্য যদি উদ্দেশ্যমূলক হয় তবে তা কালজয়ী হ'তে পারে না। তবে উদ্দেশ্যমূলক হ'য়েও কোন কোন সাহিত্য কালজয়ী হয়—সাহিত্যিকের অমর প্রতিভার গুণে। সমাজ-সম্পৃক্ত নাটকের অনেকগুলি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, প্রভৃতির নাটক এখনও সমাদৃত। তার কারণ ঐ সব নাট্যকার যুগের হুজুগে মাতলেও তাঁদের রচনা শাশ্বতকালের। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাটকে সংস্কৃত রীতি অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। আমার আলোচ্য কালের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র এক উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। শ্রদ্ধেয় ডঃ অজিত কুমার ঘোষের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে দীনবন্ধুর নাট্যকৃতিত্ব স্মরণ করি। 'দীনবন্ধুর নাটকে, বিশেষত তাঁহার প্রহসনে মধুসূদনের সুস্পষ্ট প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু কাব্যধর্মী মাইকেলের নাটকে যে সৃষ্টি প্রভাতী অরুণছটায় আভাসময় হইয়া উঠিয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকে তাহাই সুদূর-প্রসারী প্রদীপ্ত আলোকে পরিণতি লাভ করিয়াছে।'[৩] অনেকের নাটক রচনার প্রতিভা ছিল না—যুগের তাগিদে নাটক রচনা ক'রে তাঁরা যুগকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। যুগকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাত অনেক নাটকের নাম আজ পাওয়া যায় কিন্তু তাদের চোখে দেখা যায় না।

তবুও বলতে হয় এই সব অখ্যাতনামা ও অজ্ঞাতনামা নাট্যকার যদি নাটক রচনা না করতেন তবে ঐ সব বিষয়ে সমাজ আন্দোলিত হ'ত না এবং সমাজ আন্দোলনে নাটকের গুরুত্বও কমে যেত। যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস থেকে (১৮৫২) সমাজ বিষয়ে নাট্যকারদের

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। পৃ ৯১

দৃষ্টি পড়লেও কীর্তিবিলাস সমাজ সংস্কারে তেমন কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নাই। কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব, নবনাটক, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রহসনগুলি, মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন দুটি এবং দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলি সমাজ সংস্কারে উল্লেখযোগ্য।

মাইকেলের একেই কি বলে সভ্যতা? বিশেষ যুগের লক্ষণাক্রান্ত হ'লেও তাঁর বুড় সালিক এখনও সমাজে দেখা যায়। দীনবন্ধু নীলদর্পণ নাটকে নীলকর ও নীলচাষীর বিরোধ দেখিয়েছেন কিন্তু একে কি দরিদ্র চাষীর প্রতি ধনী জমিদারের অত্যাচার বলা যায় না? সধবার একাদশী, লীলাবতী প্রভৃতি নাটকের অভিনয় যে সমাজে মদ্যপান বিষয়ে ধিক্কার তুলেছিল তা আমরা জানি। 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকা লইয়া গিরীশবাবু বলিলেন—'রাত্তিরে বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গলায় সর্দ্দি বসে যাবে, আসল মদ নইলে চলবে কেন।' অতঃপর আমাদের নিমচাঁদকে আর মদ্যপানের ভান করিতে হইত না। অনেক দিন পরে স্বনামধন্য ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী একজন অভিনেতাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি কখনও থিয়েটর দেখি না। তোমাদের পাব্‌লিক থিয়েটর কিন্তু সমাজের একটা উপকার করেছে। আমাদের পাড়ায় রাস্তায় মাতালদের বেলেল্লাগিরি একেবারে কমে গেছে।'[৪] দীনবন্ধুর নাটকের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছেন, 'বিবাহের দিন 'লীলাবতী' আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম,—তাই ত, পত্নীটি আমার কি রকম হবেন! সারদাসুন্দরীর মত হলেই ভাল হয়; আমার ত ঝোঁক লীলাবতীর চেয়ে সারদাসুন্দরীর দিকে। নিশ্চয়ই সারদা-সুন্দরীর মত হবে। যদি না হয়! লীলাবতীও মন্দ নয়, কিন্তু......। বিবাহ হইয়া গেল। দেখিলাম আমার পত্নীটি সারদাসুন্দরীও নন্, লীলাবতীও নন্, ......একটি চেলির পুঁটুলি।'[৫]

বাংলা সামাজিক নাটক রচনায় অনেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি থাকলেও নাটকীয়

৪। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিন বিহারী গুপ্ত পৃ ২৭৮
৫। ঐ দ্বিতীয় পর্য্যায়—অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা। পৃ ২০৪

দ্বন্দ্ব, চরিত্রচিত্রণ এবং বিষাদান্তক পরিণতি অনেক নাটকেই দেখা যায়। আবার মূল বিষয় তথা কাহিনী এদেশীয়। কেউ কেউ নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি পরিহার ক'রে একেবারে পাশ্চাত্ত্য কায়দায় নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। অনেকে নাটকের সঙ্গে প্রাচীন যাত্রার পার্থক্য না বুঝে ভাঁড়ামি, ইতরামি ও অশ্লীলতার আশ্রয় নিয়েছেন। এই দোষ যে শুধু অল্পশিক্ষিত লেখকদের তা নয়। হেরাসিম লেবেডফ, যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশের লোকের হাস্যরসে আসক্তির কথা জানিয়েছেন এবং লোকরঞ্জন করাই যখন নাট্যকারের উদ্দেশ্য তখন ভাঁড়ামি এবং অশ্লীলতার অবতারণা করতে তাঁদের আপত্তি নাই। অনেকে আবার সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে নাটক রচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন সেজন্য বলেছেন, 'এই নিতান্ত তুচ্ছ ও অধিকাংশ জঘন্য রচনাগুলিকে কালের সম্মার্জনী করে দূর করিয়া দিয়াছে।' [৬] একথা সত্য যে বাংলা নাটকে কৌলীন্য, বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, কন্যাপণ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান ও বেশ্যাগমন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে পক্ষ ও প্রতিপক্ষগণের আন্দোলন চলেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষতঃ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চ'লে ক্রমশঃ মন্দীভূত হ'তে লাগল। সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাদের উদার মানস-প্রকৃতিই এর কারণ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের স্থাপন বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক দিগ্‌দর্শন। এর পূর্বে অপেশাদার তথা শৌখীন নাট্যমঞ্চে সামাজিক নাটক ও প্রহসনের অভিনয় সমাজে তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নাই। কয়েকটি শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে এবং তাঁদের নিমন্ত্রিত দর্শকদের উপস্থিতিতে এদের বিচার করতে হয়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সামাজিক নাটক ও প্রহসনের অভিনয় এবং মঞ্চের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নূতন নূতন নাটক রচনা এবং তাঁর অনুপ্রেরণায়, উৎসাহে ও জনপ্রিয়তায় উৎসাহী লেখকবৃন্দের নাট্যরচনা নাটকের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছে। তবে বিধবাবিবাহ, কৌলীন্য ও তজ্জনিত দোষ প্রভৃতি বিষয়ে

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড—শ্রীসুকুমার সেন। পৃ ৮৯

আর তেমন নাটক রচনা হয় নাই। কিন্তু মদ্যপান এবং বাল্যবিবাহ বিষয়ে নাটক রচনা তখনও বেশ উল্লেখযোগ্য। এই হিসাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল এবং রামচন্দ্র দত্তের বাল্যবিবাহ নাটকের নাম করতে হয়। বাল্যবিবাহ বিষয়ে তখনও কেমন অবস্থা চলছিল তার বিবরণ এই—'যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক—আগে ছেলের বিয়ে। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা।'[৭]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন বিধবাবিবাহ প্রচলনে এবং বহুবিবাহ নিরোধে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সে রকম কেশবচন্দ্র সেন 'একজন সমাজ সংস্কারক, তিনি জাতিভেদ পৌত্তলিকতা বাল্যবিবাহ উঠাইয়াছেন, সঙ্কর ও বিধবাবিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা দিয়াছেন।'[৮] কেশববাবু ও তাঁর সহধর্মা বলম্বীদের অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে এবং বাল্যবিবাহ নিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ করতে হয়। তবে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে 'এক্ষণে কত গণ্ডায় গণ্ডায় অসবর্ণ বিবাহ হইয়া যাইতেছে. কে কোন্ জাতির লোক তাহা আর কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও চাহে না; কন্যা স্ত্রী এবং বর পুরুষ জাতি কি না এই মাত্র কেবল অনুসন্ধান করে।'[৯] আলোচ্য কালের সীমানায় নাটকে এই আন্দোলন বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত না হ'লেও কিঞ্চিৎ জলযোগ এবং নাগাশ্রমের অভিনয় প্রহসনে কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়।

তৎকালে যুগের যূপকাষ্ঠে অনেকের নাটক যে বলিস্বরূপ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। যুগের হুজুগে 'যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন;……।'[১০] শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন রচনাগুলির 'সাহিত্যিক মূল্য কিছু নাই' বললেও 'এগুলির মূল্য যদি কিছু থাকে তো প্রধানত সাহিত্যকুতুকীর এবং ঐতিহাসিকের

---

৭। বঙ্গদর্শন—অষ্টম খণ্ড—ভাদ্র ১২৮৮। পৃ ২৩৪

৮। কেশবচরিত—শ্রীচিরঞ্জীব শর্মা। পৃ ২২৮

৯। ঐ। পৃ ৪০

১০। সংস্কৃত সন্দর্ভ—১৯২৩ সংবৎ। পৃ ১৫৯

কাছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে "বাস্তবতা" প্রবেশ করিয়াছিল এই ধরণের রচনার মধ্য দিয়াই।'[১১] —এটিও স্বীকার করেছেন। শিল্পসচেতনতাহীন, অশ্লীল এবং আদিরসাত্মক নাটকগুলির বাস্তবিকতা স্বীকার ক'রেও পরিত্যাজ্য। সেই হিসাবে রমণী নাটক, প্রেম নাটক, বিধবা বিরহ নাটক, হিন্দু মহিলা নাটক, পুনর্বিবাহ নাটক, কলিকুতূহল নাটক প্রভৃতি সাহিত্য আসরে স্থান পেতে পারে নাই। পক্ষান্তরে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন কুল সর্বস্ব, নব নাটক, উভয়-সঙ্কট, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, চক্ষুদান প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের একেই কি বলে সভ্যতা? ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন দুটি শিল্পসম্মত হওয়ায় বাস্তবের নগ্নচিত্র হ'য়েও কালজয়ী। দীনবন্ধু মিত্রের সম্বন্ধে বলা যায় 'পাপীর সান্নিধ্যে পাপী, দুঃখীর ভাবানুষঙ্গে দুঃখী, মাতালের কল্পনায় মাতাল হওয়ার জন্য যে মানস-স্বাস্থ্য ও নমনীয় সৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন, এই নাট্যকারের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, নাট্যকার সুলভ অপক্ষপাত মনোভাব থেকে একটা সংযম-ধর্মও তিনি পেয়েছিলেন।'[১২] সেজন্য ঊনিশ শতকের সমাজ আন্দোলনে তাঁর নীলদর্পণ, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, সধবার একাদশী, জামাই বারিক প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন শিল্পসম্মত বাস্তবরূপ প্রকাশ করায় বর্তমান কালেও এদের সমাদর কম নয়।

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড শ্রীসুকুমার সেন পৃ ৮৯

১২। সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—দ্বিতীয় পর্ব—
জীবেন্দ্র সিংহ রায়। পৃ ২৭০

# পরিশিষ্ট ১ ক

The Government Gazette

..........................................

No. 846 Vol XV Calcutta Monday Evening
December 7, 1829.

Gobt. Adbertisements.

A. D. 1829. Regulation XVII

A Regulation for declaring the Practice of Suttee, or of burning or burying alive the Widows of Hindoos, illegal, and punishable by the Criminal Courts—passed by the Governor General in Council on the 4th December, 1829, corresponding with the 20th Aughun 1236 Bengal era; the 23d Aughun 1237 Fusly; the 21st Aughun 1237 Willaity; the 8th Aughun 1886 Sumbut; and the 6th Jumade us-Sanee 1245 Higeree.

Preamble. The practice of Suttee, or of burning or burying alive the Widows of Hindoos, is revolting to the feelings of human nature, it is no where enjoyed by the religion of the Hindoos as an imperative duty on the contrary a life of purity and retirement on the part of the Widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed: in some extensive districts it does not exist: in those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have

been shocking to the Hindoos themselves, and in their eyes unlawful and wicked. The measures hetherto adopted to discourage and prevent such acts failed of success, and the Governor General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question can not be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor General in Council, without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages, so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity, has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout the Territories immediately subject to the Presidency of Fort William.

II. The Practice of Suttee. or of burning or buryng alive the Widows of Hindoos, is hereby declared illegal, and punishable by Criminal Courts.

# পরিশিষ্ট ১খ

**ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।**

সতীর কার্য্য এতাবতা সতীহওন অর্থাৎ জীবদ্দশায় দাহকরণ কি পুতিয়া রাখণ কর্ম্মই বিধিবিরুদ্ধ এবং ঐ প্রযুক্ত ঐ কর্ম্মকারিরা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় ইহা জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়ার গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের তারিখ ৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৬ সালের ২০ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৭ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৭ সালের ২১ অগ্রহায়ণ মওযাফেকে সম্বৎ ১৮৮৬ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৫ সালের ৬ জমাদীয় ঃ সানীতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

সতীর কার্য্য অর্থাৎ হিন্দুরদের জীবিত বিধবারদের দাহ করণ কি পুতিয়া রাখণ কর্ম্ম মনুষ্যজাতির অতি গর্হণীয় হিন্দুশাস্ত্রেতে বিধিরূপে কোনস্থলে তাহার আজ্ঞা নাই কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে থাকার মুখ্য ও বিশেষ আজ্ঞা আছে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বত্র ঐ কর্ম্ম অধিক লোকে করে না ক এক বড় জিলাতে ঐ কর্ম্ম নাই এবং যে ২ স্থানে সেই কর্ম্ম চলিত আছে সকল লোকের জ্ঞাতসারে সেই ২ স্থানে পুনঃ ২ ঐ ক্রিয়া এমন নির্দয়রূপে করা গিয়াছে যে তাহাতে হিন্দুরা ও খিদ্যমান হইয়াছে এবং তাহারদের বিচারেতে ঐ কর্ম্ম বিধি বিরুদ্ধ ও অতিশয় অপরাধের স্বরূপ বোধ হইয়াছে ঐ কর্ম্ম নিবারণ করিবার নিমিত্তে যে ২ উপায় এ পর্য্যন্ত করা গিয়াছে তাহাতে ঐ কর্ম্ম নিবারিত হয় নাই এবং শ্রীযুত নওয়ার গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে দৃঢ় বোধ করেন যে ঐ কর্ম্ম সর্ব্বতো-ভাবে নিষেধ না করিলে তাহার শেষ হইবেক না এই বিবেচনাপ্রযুক্ত শ্রীযুত নওয়ার গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হিন্দুস্থানের মধ্যে ব্রিটনীয় কর্তৃত্বের মূলবিধির মধ্যে যে বিধি প্রধান ও অতি গুরুতর অর্থাৎ সকল প্রকার লোকের ইচ্ছামত ঈশ্বরের অর্চ্চনার প্রকার ধর্ম্ম এবং কৃপার বিরুদ্ধে না হইলে ঐ দেবার্চ্চনা কোন রূপে নিবারণ না

করা অত্যুপযুক্ত বোধ হইল অতএব এই মূলবিধি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিয়া নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে উপযুক্ত বোধ করিলেন এবং ঐ হুকুম এই আইন ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এ আইন জারী হওনের তারিখ অবধি ফোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজ-ধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল ও জারী হইবেক ইতি—

২ ধারা ঃ—এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে সতীর কার্য্য অর্থাৎ হিন্দুরদের বিধবারদের জীবদ্দশায় দাহ অথবা পুতিয়া রাখণ কর্ম্মই বিধিবিরুদ্ধ এবং ঐ ২ কর্ম্মকারি লোকেরা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

A TRUE TRANSLATION.

W. CAREY

**Bengalee Translator of Regulations.**

# পরিশিষ্ট ১ গ

The Government Gazette. Vol XVII

Calcutta, Tuesday, August 12, 1856

**Acts**

The 26th July. 1856.

Legislative Council

The following Act, passed by the Legislative council, received the assent of the Right Honorable the Governor General on the 25 th July, 1856, and is hereby promulgated for general information :—

Act No. XV of 1856.

An Act to remove all legal obstacles to the marriage of Hindoo Widows.

Preamble. Whereas it is known that by the law as administered in the civil courts established in the territories in the possession and under the Government of the East India Company, Hindoo widows, with certain exceptions, are held to be, by reason of their having been once married, incapable of contracting a second valid marriage, and the offspring of such widows by any second marriage are held to be illegitimate and incapable of inheriting property: and whereas many Hindoos believe that this imputed legal incapacity, although it is in accordance with established custom, is not in accordance with a true interpretation of precepts of their religion, and desire that the civil law administered by the courts of justice shall no longer prevent those Hindoos who may be so minded from adopting

a different custom, in accordance with the dictates of their conscience :- and whereas it is just to relieve all such Hindoos from this legal incapacity of which they complain; and the removal of all legal obstacles to the marriage of Hindoo Widows will tend to the promotion of good morals and to the public welfare: It is enacted as follows :-
[ Marriage of Hindoo widows legalized ]

I. No marriage contracted between Hindoos shall be invalid, and the issue of no such marriage shall be illegitimate, by reason of the woman having been previonsly married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindoo law to the contrary not withstanding. [ Rights of widow in deceased husband's property to cease on her remarriage. ]

W. Morgan,
Clerk of the Council.

# পরিশিষ্ট ১ঘ

The Government Gazette Vol XXIX
5th May 1868

The following Act of the Governor General of India in council received the assent of His Excellency the Governor General on the 17th April 1868, and is hereby promulgated for general information :

Act No XIV of 1868.

Diseases.

Preamble.,

Whereas it is expedient to provide for the better prevention of certain contagious Diseases; It is herely enacted as follws :—

Preliminary.

[Short title ]

I This Act may be cited as "The Indian Contagious Diseases' Act 1868"

Interpretation clauses.

2 In this Act "Magistrate' means any person excercising the powers of a Magistrate or of a subordinate Magistrate of the first class, and includes a Magistrate of a police in a presidency Town :

[ "contagions Diseases" ]

"contagions Diseases" means any veneral disease.

[ "Brothel Keeper" ]

"Brothel keeper" means the occupier of any house, room or place to or in which women resort or are

for the purpose of Prostitution and every person managing or assisting in the management of any such house, room, or place.

[ Extent of Act ]

3. The places to which this Act applies shall be such places as the local Government shall from time to time, with the previous sanction of the Governor General of India in Council,specify by notification in the official Gazette. The limits of such places shall, for the purposes of this Act, be such as are defined in the said notification, and may from time to time, with such sanction as aforesaid be altered by a like notification, [Punishment of unregistered prostitutes and brothel keepers. ]

Whitley Stokes,
Asst. Secy. to the Govt. of India,
Home Dept. ( Legislative. )

# নির্দেশিকা